শিক্ষের কাঁথাটি চিরদিন পুণ্যদাসী নিজেই সেলাই করে। নিজের কাঁথাটি, মাগনদাসের থলি। কিন্তু কয়েকদিন জ্বরের পর দেওয়ালে পিঠ দিয়ে সে স্ুঁচে স্ুতো পরাতে গিয়ে দেখল চোখের সামনে স্ুঁচের ছিদ্র, স্ুতো, কাঁথার মুড়ি সব লেপে-পুঁছে একাকার। কিছুই দেখা যায় না। মনে পড়ল মাঝখানে মাগনদাস একবার তার ওপর রেগে বাউল হতে গিয়েছিল।

বলেছিল—'ও বেবসায় পয়সা আছে।'

পুণ্যদাসী, যেমন অবস্থায় পড়ুক না কেন, তাদের কামডহরির ভিটে আর গালতুর বাস্তুর কথা কখনো ভোলে না। ছেড়ে আসবার সময়ে গড় করে বলেছিল—'মা, যেখানে যাই, তোমায় ভুলব না, মনে অইবে। আমার পিত্তি পুরুষেরে রন্ন দে'ছ, পতিপালন করেছ, সিটি ভোলবার লয় গো!'

তাই, মাগনদাসের মুখে বাউল হওয়াকে 'বেবসা' বলায় সে চটে গিয়েছিল।

বলেছিল—'আমার ওপর ঘেন্না হয়েছে, তোমার যেখানে খুশি যাবে। তা বলে বাউল সন্নেসীর বেবসা করব উ কি কথা?'

'বেবসা ছাড়া কি? পয়সা ওজগার হলেই সেটি বেবসা হল, লয়?'

না রে মহাপাপী! আমরা বোষ্টমকে ভিক্ষে দিতাম তা সে-ও বেবসা করত

সিটি আর ইটি এক লয়। তো' মাগীরা সব ঘুইলে ফেলিস। এখন সব বেবসা র! মাটে মাটে বাউলরা বাবুদের সামনে গান গায়, নেত্য করে, পয়সা নেয়, দেখিসনি?'

যা-হোক, কামডহরি ছাড়বার পনেরো ষোল বছরের মধ্যে অন্তত সাত-আটবার মাগনদাস এমন ঘর ছেড়ে গিয়েছে আর এসেছে।

সেবার বাউলের সঙ্গ ধরতে গিয়ে-ও থাকা হয়নি। তবে বেশ কয়েকটি কথা শিখে এসেছিল।

'ভগবানের অঙ্ নেই, জানলি বউ? গুরু ধত্তে ধত্তে ভগবান পাওয়া যায়। র সব কিছুতে ভগবান অঙ্ দে'ছে কিনা? ফুলে, ফলে, সংসারের সর্বত্ত, তাই

নিজের তরে উনি আর অঙ্ রাখেনি। সব ফুইরে ফেলে নিজে উনি একাকার।'

কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই বউবাজারের সোনাপট্টিতে কয়লা বাছার কাজটি পেয়ে সে শেখা কথা-টথা ভুলে গেল। তখন কিছুদিন সে নতুন ব্যবসার কথাই বলত 'কয়লা বাছতে বাছতে সোনার গুঁড়ো পাওয়া যায়। খানিকটা পেয়ে গেলেই, বুঝলি বউ, হালতুর জমি আমি নিয্যস খালাস করে আনব।'

বেশ জোরে জোরেই বলত।

তখনো ওদের বউ বউয়ের মতই থাকত। হাসপাতালের দাই হয়নি, থান পালটে পেড়ে কাপড ধরেনি। নাতনীও ছোট ছিল। তাই, মাগনদাসের কথাতে, বাড়ির কর্তার যোগ্য জোর ছিল। তখনো ওরা সবাই বিশ্বাস করত হালতুর জমি থেকে মাগনদাসের জ্ঞাতি বোন-ভগ্নীপতিকে তোলা যাবে। একদিন তারা ফিরে যাবেই সেখানে। তাদের ছেলে মরে যাবার সময়ে দিব্যি দিয়ে গিয়েছিল।

তাই, মাগনদাস একটির পর একটি বৃত্তি ধরত, যখন যে কাজে থাকত, তারই কথা বলত। বাউল হতে গিয়ে ভগবানের কথা বলত। আবার কয়লা বাছার সময়ে সোনার গুঁড়োর কথা। সোনাপটির স্যাকরারা ঝাঁপ বন্ধ করবার আগেই অবশ্য মাগনদাস আবার ধরামর কাজে লেগে যায়। তাই সে কথাটিও সে বেশী বলেনি।

শুধু, পুণ্যদাসীর মাঝে মাঝে, দিনের এক এক সময়ে, কথাগুলো মনে পড়ে। যেমন মনে পড়ে আগেকার নানারকম শব্দ। কাঁসা পেতলের বাসনের ঠুন ঠান, হাতের রুপোর চুড়ির কিন্ কিন্ শব্দ, ধান সেদ্ধ করে উঠোনে ঢালবার পর ধানে হাঁড়ি মাজবার শব্দ। তেমনিই মনে পড়ে মাগনদাসের মুখের এক-একটা কথা।

'ভগবানের অঙ্ নেই জানলি, লেপে-পুঁছে একাকার।'

এখন, জ্বর ছাড়বার পর, রথের ক'দিন থাকতে পুণ্যদাসী দেখল তার কাঁথাটি, মাগনদাসের ভিক্ষের ঝুলি, সেলাই করবে এমন অবস্থা আর নেই। সব লেপে-পুঁছে একাকার। 'চোখের জোরে করে খেতাম, দিষ্টিটা কেড়ে নিলে ঠাকুর?'

বলতে গিয়েও পুণ্যদাসী সভয়ে মুখ সামলে নিল। মুখে হাত চাপা দিল। রথে, উল্টোরথে, বিপত্তারিণী ব্রতস্নানে, এখনো সে ভাল উপার্জন করে। করে বলেই বউ তাকে সহ্য করে। রথের সময় যত কাছে আসে, পুণ্যদাসীদের সংসারে বেশ একটা প্রত্যাশার জোয়ার আসে। জ্বর আসলে যেমন, উৎসাহেও তেমন, শরীর যেন তপ্ত হয়। এ সময়, দোকানীরা সবাই প্রত্যহ একটি করে ছোট পয়সা দেয়। এ রোজগারটি বাঁধা! তার ওপর কপাল ভরসা।

'ঠাম্মা মুখ চাপা দিলি কেন?'

নাতনী তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল।

'এমনি।'

পুণ্যদাসী মনে মনে বলল, 'চক্ষু অন্তটি খোয়া গেছে জানলে তোমরা মা-মেয়েতে আমায় খোয়ার করবে। বলে কি মরব? বুড়োর চোখ গেছে, তা তাকে আমি নে বইসে দিই, উইটে আনি। আমায় কে দেখবে?'

'কাঁথা সিঁয়োবি না?'

'এখন থাক!'

পুণ্যদাসীর গলা শুকলো। একসময়ে অঙ্গে অঙ্গে স্বাস্থ্য ছিল। কামডহরির সবাই বলত 'উয়োদের বউটা মৈষের মত খাটে গো!' গতরের জন্যেই সবাই আদর করত।

তারপর সেই অঙ্গে অঙ্গেই রোগ হল। নাতনী ছড়া কেটে বলত, 'কি? গোবর ফুটিয়ে দেব? পায়ে লাগাবি? কেন, বাত হয়েছে বুঝি? মা গো, এক অঙ্গে এত ওগ, তোর মত আর দেখিনি।'

'ওগটি লক্ষ্মী,' পুণ্যদাসী গম্ভীর হয়ে বলত, 'মানুষ কি মুক দেখে পয়সা দেয় ছা? পায়ে বাত, হাতে ঘা, কোমরটি পড়ে গেছে, সব দেখে তবে পয়সা দেয়।'

'অঙ্গে অঙ্গে ওগের বান ডেকেছে,' নাতনী পিচ ফেলে বলত, হাত-আর্শীতে দেখে দেখে খোঁপা থাবড়াত।

কিন্তু এখন চোখের সামনে স্থঁচে, স্থতোয়, কাঁথায়, ঝোলায় একাকার দেখে পুণ্যদাসীর বুকের নিচে ধপধপিয়ে ঢেঁকির পাড় পড়তে লাগল, বিশ্বভুবন অন্ধকার হল, কাঁপতে কাঁপতে সে ঘরের কোণে এসে বসল। 'তবে কি অথের চাকায় মরতে হবে?' ভাবতেই তার মনে চিত্র ভেসে ওঠে, এখনও উঠল। চোখে দেখেনি শুধু কানে শুনেছে, আকাশে মাথা, ভূ-তলে চাকা, ভয়ঙ্কর এক লক্ষ্যে ছুটে আসছে জগন্নাথের রথ, লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে 'জয় জগন্নাথ, জয় জগৎনাথো, জয় জগন্নাথ, জয় জগতোনাথো, জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথো' ধ্বনি। মানুষের ঠেলাঠেলিতে নিশ্বাসের বাতাস বন্ধ, কিন্তু জগন্নাথের রথ তবু এগিয়ে আসে আর আসে। সহসা, মানভূমে, বিহারে গোয়ালাদের 'কাউয়াড়োর' পরবে ক্ষিপ্ত গাই-এর বাঁকা শিঙের সামনে চার পা বাঁধা শুয়োরকে যেমন তেমনি করেই কারা যেন অন্ধ, খঞ্জ, কুষ্ঠীকে রথের চাকার সামনে গড়িয়ে দিতে থাকল।

জগন্নাথের রথের সামনে কারো নিস্তার নেই, 'এভাবে মরলে মানুষ গতি পায় গা! রথযাত্রার পুণ্য পেয়ে দিব্যদেহে স্বর্গে যায়।' তাদের মনিববাড়ির কুল-গুরুর মগমে কণ্ঠ এখন পুণ্যদাসীর কানের কাছে যেন বেজে উঠল। ভোলে না সে, সে

কথা মোটে ভোলে না। এখন পুণ্যদাসী মাথা এদিক থেকে ওদিকে দু-একবার নাড়ল। ভোলে না, বলে, সে বড় অসহায়। 'দো'ই ঠাকুর, দো'ই ঠাকুর।' সে অস্ফুটে বলল। তারপর মুখ তুলে আকাশ দেখতে চেষ্টা করল। জানলায় মুখ চেপে ধরে বাইরের দিকে তাকাতেই সে ভয়ে স্তম্ভিত হয়, অস্ফুট আর্তনাদ করে ঘেমে উঠল।

তার চোখের সামনে মাত্র দু'গজ দূরে টিনের নিশান, বড় বড় ধ্বজার নাচে দশ-অবতার, সারি সারি দেবদেবী মুনিঋষির মূর্তি। তারই ফাঁকে দারুভূত জগন্নাথের ভয়ঙ্কর চেহারা, জগন্নাথের রথ।

প্রতি বছর তাদের বস্তির পেছনে, কাঠগোলার উঠানে পালচৌধুরীদের রথ সাজান হয়, রঙ পালিশ হয়, এ কথাটা কেন তার মনে ছিল না কে জানে। এখন মনে পড়ল, তবু বুকের ধুকধুকুনি থামতে চায় কি ? 'এই সময়ে রথটি দেখলাম, এর মধ্যে নিচ্চয় দৈব আছে,' সে দু-একবার মনে মনে বলল। দৈব নেই, অলৌকিক নেই, একথা পুণ্যদাসীর মত আর কে জানে ? অন্ধকেও চোখ পেতে দেখে না। মৃতকেও জীবন পেতে দেখে না। তবু, দৈবে, অলৌকিকে তার ভয়ানক প্রয়োজন। নইলে তার দেহ যেমন, মনও তেমনি উদ্বাস্তু হয়ে থাকে। পিতৃপুরুষের ভিটে ছেড়ে এসে তবু দেহটা বেঁচেছে, কিন্তু দেব-দৈব অলৌকিক না থাকলে মনটা বাঁচত কি ? এখন ছোট ছোট বিষয়ের মধ্যে পুণ্যদাসী অলৌকিকত্বের প্রকাশ দেখে। দেখে ভয় পায়। কিন্তু এ ভয়েও সুখ আছে। এখন, রথ যেখানে প্রতি বছর থাকে, সেখানেই রথটিকে দেখে, চোখ হারাবার ভয়ে জড়ভরত পুণ্যদাসীর মনে হল এ দৈব। দেবতাই তাকে জানাচ্ছে—'পুণ্য, তুই রথের নিচে মরবি।'

'বলি রথ কখনো দেখনি ? আশ্চর্য মানুষ যা হক ! কখন থেকে চেঁচাচ্ছি দোর দিয়ে যাও। এই জন্য আমি কাজে লাগতে চাইনি। না, টাইমে যখন যেতে পারব না তখন যেয়ে লাভ নেই। তারা পয়সা দিয়ে লোক রেখেছে, বে-টাইমে গেলে শুনবে কেন ?'

তাড়াতাড়ি এসে পুণ্যদাসী দোর ধরে দাঁড়াল। নরম গলায় বললে, 'যা না বাবু! দোর দিচ্ছি ! তুই যা !'

নাতনী থর থর করে চলে গেল। হাসপাতালে দাই-এর কাজ মানে রুগীর সেবা। পুণ্যদাসী তো তাই জানে। সেখানে যাবার জন্যে অত বড় খোঁপা, প্ল্যাস্টিকের ব্যাগ কোন কাজে লাগে কে জানবে। বউকে দু'একবার বলে দেখেছে—'বয়সের মেয়ে। নাতজামাই আজ না নেয়, কাজ হলেই নে' যাবে। কাজ কত্তে দি দাও, কিন্তু অমন ফেশান ভাল নয়।'

'তোমাদের দিনকাল আর নেই বাবু। একখানা কাপড় পরে অমনি ছুটলে। ভদ্দর-লোকদের কাজ, তা প'ঙ্কের হয়ে না গেলে তারা হাতের সেবা নেবে কেন ?' বউ বিরস বদনে জবাব দিয়েছে, 'নইলে আমিই বা পেড়ে কাপড় অন্তীন ছাইমাটি পরে মরি কেন ?'

পুণ্যদাসী আর কিছু বলেনি. বেশী কিছু বলে লাভ কি. কে শুনছে ! অথচ, বউকে কাজটি সে-ই যোগাড় করে দিয়েছিল : তার ওড়িয়া বাড়িওয়ালী হাসপাতালে দাই-এর কাজ করে করে এই কোঠাগুলো তোলে। পুণ্যদাসীকে সে বড্ড ভালবেসে ফেলেছিল।

'তুই আমার বোন।' সে বার বার বলত। তাকেই হাতে-পায়ে ধরে পুণ্যদাসী। 'মেয়েছেলে রুগীকে দেখবে, সেবা করবে, এ-কাজে কোন দোষ নেই মা, তুমি এ-কাজটি বউকে করে দাও !'

অবশ্য স্বেচ্ছায় বলেনি। বউটা তার মাথা খাচ্ছিল। দিন-রাত বলত; 'উনি আজ এ-বেবসা, কাল ও-বেবসা করবে, তুমি আমি ঝি খাটবো, এই করলেই আর রন্ন জুটেছে। তুমি আমায় দাই কাজটি করে দাও দিখিনি !'

'রুগীর সেবা ! পুণ্য কাজ !' মাগনদাস ভারী গলায় বলেছিল। যদিও রোগীর সেবা করবার জন্যে বউ-এর তিলেক মাথাব্যথাও ছিল না। সে মজেছিল নানা রকম সঙ্গে। বাড়িওয়ালীর ঘরে টেবিল-ঘড়ির টিকটিক শব্দ, স্টোভের গোঁ গোঁ ফোঁসফোঁসানি, লোকাল রেডিওর সময় জানাবার বাজনা। তার মনে হয়েছিল কাজটি পেলেই ফুসমন্তরে তারও সব হবে।

রোগী সন্তানের মত। বাড়িওয়ালী তাকে শিখিয়ে দেয়, 'রোগীর ময়লা ঘাঁটতে, বমি ঘাঁটতে ঘেন্না করবি না। ঘেন্না করেছিস জানতে পারলেই ওরা তোকে ছাড়িয়ে দেবে।' তারপর, এ কাজ থেকেই বউ মেয়েটাকে মানুষ করল, বিয়ে দিল, আবার জামাই কারখানার কাজ আর কোয়ার্টার পাবার সময়টুকুতে মেয়েকেও কাজে ঢুকিয়ে দিল। এখন ওদের ঘরেও ঘড়ি বাজে, স্টোভ জ্বলে। মা-মেয়ে যখন যার রাত-ডিউটি থাকে, রুটি তরকারী নিয়ে যায়। দিন-ডিউটি থাকলে ভাত নিয়ে যায়। রান্নার ছ্যাক ছোঁক, ঘড়ির টিক্‌টিক্‌, ওদের ঘরেও এখন নানা রকম শব্দের আমদানী হয়েছে।

পুণ্যদাসী নাতনীকে বিদায় দিয়ে, বউ-এর জন্যে অপেক্ষা করতে করতে ভাবল চোখটির কথা বললে বউ দয়া করে দেখিয়ে আসবে না কি হাসপাতাল থেকে ! না খোয়ার করবে ! যদি আশ্রয়ছাড়া করে ? সেটি ভাবলেই তার ভয় হয়।

তবু তো বউ নাতনী তাদের ভাত দেয় না। 'এই ওজগারে চারজন খেতে গেলে

আর অন্য কিছু হয় না।' পৃথক করে দেবার গৌরচন্দ্রিকা গেয়েছিল বউ।

'অন্য কিছু হয় না!'

কথাটা আরেকবার বলে পুণ্যদাসী হাঁ হয়ে গিয়েছিল।

'দুটো পয়সা না জমালে চাক্‌রে-জামাই আনব কি করে?'

'চাক্‌রে-জামাই আনবি!'

পুণ্যদাসী আবার বোকার মত আউড়েছিল।

'নিশ্চয় আনব।' মুরগীর মত বুক ফুলিয়ে, আঁচল ঝাপটে, গলা তুলে বউ বলেছিল। সক্ষম রোজগেরে মানুষ যেমন নিজের জোর জানে বলে বর্বর ভাবে দুর্বলকে আঘাত করে, তেমনি নিষ্ঠুরভাবেই সে আবার বলেছিল, 'হ্যাঁ, চাক্‌রে-জামাই! হেলো চাষার হাতে পড়ে আমার যে হাল হয়েছে তা কি ওরও হক, তাই তুমি চাও?'

'বউ!' পুণ্যদাসী কাতর হয়ে বলেছিল 'যে-করে আমাদের জমি গেল, বাস্তু গেল, তা তো জানিস। গরমেণ্ট নিলে, নালিশ খাটলো না! টাকা দিলে যৎসামান্য, কিছুই তোর অজানা নয়। সে-ভাগ্য তো আমাদের একার নয়, সকলেরই হয়েছিল।'

কিন্তু তখনই তার মনে পড়েছিল বউ এ-কথা শুনবে বলে কথাটা তোলেনি। হাঁড়ি আলাদা করে দেবার কথা থেকে এত কথা ওঠে।

'তা দেখ, সেইজন্যে বলি, আমার এখন টাকার দরকার। দুজনের ওজগারে চারজন মনিষ্যি খেতে গেলে আর হাতে কিচু থাকে না। চালটা অন্তত যদি যার যার তার তার হত…'

বউ হিসেব করে দেখেছিল চালের খরচটাই মোটা। বিশেষ করে তার শ্বশুর-শাশুড়ীর।

কিন্তু, বলতে বলতে তার বোধ হয় সঙ্কোচও হচ্ছিল একটু একটু, আর সেই সঙ্কোচ ঢাকবার জন্যেই সে রুক্ষ গলায় বলেছিল, 'জানি এটা আমার কর্তব্য, কিন্তু এখন আর পারা যায় না।' অন্যদিকে চেয়ে লণ্ঠনের চিমনী ঘষতে ঘষতে বলেছিল 'রাঁধাবাড়া একসঙ্গেই হবে, যেমন হত।'

আসলে, কথাটা বলতে হল বলে তার নিজেকেই ছোট মনে হচ্ছিল। লজ্জা করে, কোথায় যেন বাধে। হাসপাতালের অন্য দাই মেয়েরা তাকে অবশ্য অনেকদিন থেকেই বুঝিয়ে আসছে স্বার্থপর না হতে পারলে তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। তবু তা বললেই কি আর বুড়ো শ্বশুর-শাশুড়ীকে আলাদা করে দেওয়া যায়?

পুণ্যদাসী তখন বউ-এর দিকে চেয়ে মনে মনে ভেবেছিল এখনকার শাস্ত্র

আলাদা। রোজগারের অন্নে শ্বশুর-শাশুড়ীকে প্রতিপালন করে সে হয়ত খুব বড় কাজই করছে, এখনকার শাস্ত্র। কুড়ি বছর আগে হলে ধান ভেনে, গোবর-ঘুঁটে দিয়ে শ্বশুর-শাশুড়ীকে অন্ন দেওয়াটা ঘরে ঘরেই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু, বউ-এর নামটি সেই আছে, স্বভাবটি খারাপ হয়নি। কিন্তু চালে, চলনে, সে কি আর সেই মানুষ আছে?

'শুনছ, আন্না একসঙ্গে হবে!' বউ তাকে চুপ করে থাকতে দেখে বলেছিল।

'চাল যার যার তার তার, হাঁড়ি একসঙ্গে।'

'শুধু চালে কি আন্না হয় বাবু! তেল, মশলা, আনাজপাতি, কয়লা, ঘুটে, সে ঝামালিটি কম নয়। তাই, যা ভাল মনে হয়, তাই বললাম বাবু!'

বলতে বলতে হঠাৎ বউ-এর গলাটা ধরে এসেছিল। শাশুড়ীর ফ্যালফ্যাল করে আহত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকা দেখে শাশুড়ার ছেলের কথা মনে পড়েছিল। অনেক— অনেকদিন আগে, একদিন তাকে বলেছিল, 'বউ, আমার মা, জানলি, আমায় অনেক কষ্টে বেঁচিয়েছে। টাইফাট জ্বরে পেরাণটা আমার গিয়েছিল আর কি!'

সেই শাশুড়ীকে আজ সে আলাদা হয়ে যেতে বলল। না বলে উপায় কি! এখন তাকে দিন গোছাতে হবে। সময় থাকতে গুছিয়ে না নিলে পরে সে কোথায় দাঁড়াবে?

তারপর ক্রমে, বুড়োবুড়ির সংসার বলতে গেলে আলাদাই হয়ে গিয়েছে। ওদের রাঁধা-বাড়ার শেষে পুণ্যদাসী ভাত চড়ায়। একবেলা তপ্ত খায়, একবেলা পান্ত। ঘর দু'খানার ভাড়া আজও বউই দেয়। তবে ঐ পর্যন্তই। একটু অসুখ-বিসুখের ভাব দেখলেই সে খনখন ঝন্‌ঝন্ করে বলে, 'সুস্থ থেকো বাবু, সুস্থ থেকো। পড়ে অইলে দেখব সে টাইম আমার মোটে হবে না। তা'লে আর চাকরি থাকবে না। দাই কি এখন একটা দুটো? ঝাঁকে ঝাঁকে আসতেছে আর ঘুরতেছে। বলে কত তা'বড় তা'বড় ঘরের ঝিউড়ী মেয়ে, বউ, সবাই আসতেছে। ওয়াডেরও আর সে-দিন নেই গা! নিত্যি নতুন মেট্রন, নিত্যি নতুন সিসটার, আমাদের ডিউটি দিতে আর চায় না।'

আজ রথযাত্রার ক'দিন আগে, চোখের দৃষ্টিটি হারাতে বসে, বউ-এর অপেক্ষা করতে করতে পুণ্যদাসী ভাবল এখন বউ কথায় কথায় বলে 'জামাই ঘর পেলে তো আমিও যেতে পারি মা! ঘরটি ছাড়তে চাই না উনাদের জন্যে।'

ভাত দিতে হয় না, তবু এত কথা শোনায়! চোখটি গেছে জানলে তখুনি কি বউ জামাই-এর সংসারে গিয়ে উঠবে না? পুণ্যদাসী এখনো ভিক্ষের পাট সেরে, হাত-পা ধুয়ে উনোন কাড়ে, বাসন মাজে, জল ধরে। বউ-এর শরীর খারাপ হলে

কাপড় ছেড়ে রান্নাও করে। সে সাহায্যটুকু না পেলে কি বউ তাদের থাকতে দেবে ?

'অথের নিচে যেতে হবে, জগন্নাথের অথ !' পুণ্যদাসী বিড়বিড় করে বলল। বউ আসতে দরজা খুলে দিল।

অন্য দিন, রাত-ডিউটি সেরে বউ বাজার করে আনে। পুণ্যদাসী জিগ্যেস করে. 'কি আনলি ?' অথবা বউই বলে, 'মাছ চিংড়ি ক-টা বেছে দাও তো !'

আজ বউ বড় চুপচাপ। নিজের ভাবনায় গম্ভীর। পুণ্যদাসীর দিকে সে ভাল করে তাকাল না, 'লাবি গেচে ?' জিগ্যেস করেই সে ঢুকে গেল।

এখন পুণ্যদাসী ধীরে ধীরে মাগনদাসের কাছে গেল। মাগনদাস যেমন উৎসাহে একটির পর একটি 'বেবসা' করতে যেত, এখন তেমনি উৎসাহেই ভিক্ষে করতে যায়। সে বলে 'কাজ লক্ষ্মী, কাজকে যে ভালবাসে না, তার জেবনে সুখ হয় না।' যেমন উৎসাহে সে একদিন হাল-বলদ নিয়ে বেরোত, তেমনি উৎসাহেই সে বাউল হতে গিয়েছিল, বেলেঘাটায় ঘরামির কাজ, বউবাজারে কয়লা বাছা, কোলের বাজারে মাছপট্টিতে বরফ ভাঙা, এমন কি দোকানের সামনের ফুটপাথ ঝাঁট দেওয়ার কাজ, সব তাতেই সে সমান আনন্দ পেয়েছে।

এখন ভিক্ষে করতে যাবার সময়েও তার চোখে-মুখে আনন্দ ফুটে ওঠে। খাটো ধুতি, পায়ে কাপড়ের জুতো, হাতে কাঁথার ঝোলা, সূর্যের দিকে মুখ তুলে বসে বসে অধৈর্য হয়ে উঠেছিল। এখন পুণ্যদাসী আসতে বলে উঠলো, 'দেরী হয়ে গেল, আজ আর কেষ্টনগর লোকাল' প্যাব না। সব লাইনেই বেস্তর ঠেলাঠেলি, আমার জায়াগাটুকু কোন সুমুন্দি না বাগিয়ে বসে থাকে। জগন্নাথ !'

এখন পুণ্যদাসী ভাল করে স্বামীর মুখখানা দেখল। হঠাৎ মনে পড়ল, সাবিত্রী-ব্রতের কথায় শুনেছিল 'যে এয়োতি নিত্য স্বামীর মুখ দেখে, সে বড় পুণ্যবতী।' পুণ্যদাসী, সেই কবে থেকে মাগনদাসের মুখ দেখে আসছে, হয়ত পুণ্যও হয়েছে, এখন সে ভাগ্যটি থেকে ভগবান তাকে বঞ্চিত করতে বসলেন, সে নিঃশ্বাস ফেলল।

'তাড়াতাড়ি চচ !' মাগনদাস একটু বিরক্ত হয়ে বলল। তার ভিক্ষে চাওয়ার মধ্যেও একটি গেরস্তের ভাব আছে। গেরস্ত মানুষ যেমন বাঁধা দোকানে জিনিস কেনে, চলায় ফেরায় কয়েকটি বাঁধা ধরন-ধারণ অনুসরণ করে, মাগনদাসও তেমনি একটি জায়গায় বসে। লোকাল গাড়ির কয়েকজন প্যাসেঞ্জার তার বাঁধা। সে ঠেলাঠেলি করে না, দুঃখকষ্টের ভয়ঙ্কর সব কথা বলে করুণা আকর্ষণ করে না, বেশ স্মিতমুখে বসে থাকে। তবু, এতদিনে অনেকেরই বিশ্বাস, এমন কি পুলিস কনস্টে-

বলেরও, মাগনদাস লোকটা পয়মন্তর, ওর মুখ দেখলে দিন ভালই যায়। শেয়ালদা স্টেশনের সামনে মাগনদাসকে দাঁড করিয়ে দিয়ে পুণ্যদাসী অভ্যেসমত বলল, 'জল পড়লে ওপরে উঠো।'

তারপর হঠাৎ কি মনে পড়তে বলল, 'ঝোলা ছিঁড়ে এন না তো! নিত্যি শিয়োতে পারি না।'

'ধপ করে কে সেদিন এট্টা তাল দি'ছল ফেলে। তাতেই ছিঁড়েছে মনে হয়।'

'তাল দিয়েছিল! যারা তাল দেয়, তারা তেল দেয় না কেন? মিনি তেলে তালবড়া হয়?'

পুণ্য মন্থরগতিতে বাঁ দিকের ফুটপাথ ধরে চলতে লাগল। তার মুখের কথাটি সুন্দর, হাতে পেতলের সাজি, তাতে চারটি ফুল বেলপাতা, এতটুকু ঘটিতে গঙ্গাজল। সে বলতে বলতে চলল—'যারা এত কষ্ট করে দোকান করে বসেছে তাদের ভাল হক ঠাকুর। যে যে আশা করে আস্তায় বেরিয়েছে, তাদের আশাটি পূর্ণ কর! সংসারে সকলের ভাল কর ঠাকুর!'

এই কথা কয়টির জন্যে, দোকানীরা ওকে ভাল চোখে দেখে। প্রায় সকলেই একটি করে পয়সা দেয়। রথের সময়ে রোজগারটি আরো বাড়ে।

'এবার কি মনে করেছ ঠাকুর? তোমার অথ সবাই দেখবে, শুধু আমার চোখই তুমি কেড়ে নিলে?' পথ চলতে চলতে, পয়সা নিতে নিতে সে বলল।

আশ্চর্য, ভগবানের মনে কি আছে কে জানে, কেন না হঠাৎ আজ রাতে বিছানায় শুয়ে মাগনদাস সেই জগন্নাথের রথের কথাই তুলল।

'অনেকদিন বাদে হলধারী এসেছিল, জানলি বউ?'

'কে?'

'হলধারী ভুঁইমালী, মনে নেই, সেই যার বাপ মাহেশে রথের নিচে মরেছিল?'

'কেন মরেছিল যেন?'

'কেন আর, ওগের জ্বালায়। শূলের ব্যথায় পাগল পাগল হয়েছিল। তা ছাড়া তারকেশ্বরে হত্যে দিয়েও কিছু হল না। শেষ-মেশ দোকান করব বলে মাহেশে এসে রথের নিচে সঁপে দিলে।'

'মা গো! একটু ভয় হল না!'

'আর ভয়! অথের নিচে যে মরে সে অথের দিনের সবটুকু পুণ্য পায়।'

'তোমায় বলেছে!'

'তখন দেবতার মাহাত্ম্য ছিল যে!'

'হ্যাঁ গো, তবে যে সবাই বলে অথের নিচে ঝাঁপ দিলে পুলিসে ধরে নে যায়?'

'ধরে নিলে তো বয়েই গেল ! অন্যাই তো কিছু করছে না ?'

'তবে ধরে কেন ?'

সে-কথায় জবাব না দিয়ে মাগনদাস বলল, 'এ পুণ্য থেকে বাবা, বঞ্চিত করবার জো-টি নেই। সেইজন্যেই তো আগে আগে ফি-বছর জগন্নাথধামে অথের নিচে মানুষ মরত।'

'মানুষ মরত !'

'কাতারে কাতারে !' বউ-এর কাছে সবজান্ত সেজে মিছে জাঁক জাহির করে বড় বড় কথা বলবার অভ্যাস মাগনদাসের আজও আছে। 'কানা-খোঁড়া, রুগী-ভোগী সবাই যেত।'

ভাবতেই পুণ্যদাসীর বুক চমকাল। রথের চাকার নিচে পড়লেও মরবে, না পড়লেও পথিকদের লক্ষ লক্ষ পায়ের চাপে পিষে যাবে।

কে জানে ভগবানের মনে এবার কি আছে ! পুণ্যদাসী পাশ ফিরে শুয়ে আকাশের দিকে তাকাল। ঘুমের মধ্যে তাকে যেমন বোবায় ধরে, জেগে থাকলে তেমনিই বুকে চিন্তা চেপে বসে। অন্ন-চিন্তা বস্ত্র-চিন্তা, তায় আবার চক্ষু-চিন্তা দিলে ভগবান, সে মনে মনে বলল। তারপর, জানলা দিয়ে চেয়ে মনে হল আকাশটা যদি দেখতে পায়, তাহলে জানবে চোখটা তার নেহাত খারাপ হয়নি, ও তার মনের বিভ্রম।

তাকিয়ে আবার সে চমকে উঠল। তার চার কোণা ছোট আকাশখানা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে রথের চুড়ো, জগন্নাথের রথ।

মেলার জন্যে দোকানীরা যেমন ঘর তুলবে বলে আগেভাগে ভিড় করে, ভিখিরীরাও তেমনি। তারকেশ্বরের গুলোকে দেখে পুণ্যদাসী বললে, 'ই কি অকম ভক্ত গো ! সারা বছর বাবার চরণে পড়ে থাকে, অথের সময়ে কলকেতায় ?'

'না এলে মাসী তোমাদের সঙ্গে দেখা হয় কই ?' গুলো হাসল। এরা সবাই জাত-ভিখিরী, গেরস্ত ছিল, ভিখিরী হয়েছে। নোংরা, কুঠে, মেয়েদের সঙ্গে অথবা আলটপকা গজিয়ে ওঠা 'মা মরেছে', 'স্বামী ফেলে পালিয়েছে', 'ছেলে যক্ষায় ভুগছে'—এদের সঙ্গে ওদের কথাবার্তা চলে না। গেরস্ত বউ-ঝি হিজড়েদের দেখলে যেমন, পুণ্যদাসীরাও ওদের নির্লজ্জতা দেখে তেমনই লজ্জা পায়। পুণ্যদাসীদের সংসার আলাদা, অনাথ আতুরের সংসার, কথাটি পুণ্যদাসী বড় স্নিগ্ধ করে বলে, যেন তাদের এ-সংসারটিও কারও আশ্রয়ে আছে, ভগবানের আশ্রয়ে।

দক্ষিণেশ্বরের ভামিনী, নৈহাটি স্টেশনের মোনাবুড়ো আর চেতলার ভব,

সকলের সঙ্গেই দেখা হল। মোনাবুড়ো বললে—'দিদি যে আর চোখেই দেখ না, এখেনে বসে আছি।'

'এই তো বাবা! কেমন আছ?'

'আর কেমন রেখেছে!' তারপর চারদিকে মুখ ঘুরিয়ে বাতাস শুঁকে মোনাবুড়ো বললে, 'এবার রথে জাঁক খুব।'

'তোমার দেশের মতন কি আর, বাবা?'

মোনাবুড়ো এক সময়ে জাতে ওড়িয়া ছিল। কথাটি এখন তারও মনে থাকে না। সে হেসে বলল, 'যখন যেখানে থাকি, সেখানেই দেশ গো! এখন শেয়ালদা!'

যেতে যেতে পুণ্যদাসী বললে, 'চড়কডাঙার 'জয় হোক' ছেলে কোথায়? এবার গলা শুনতে পাইনি?'

ভব বললে, 'সে আর নেই ক!'

'দুর্গা শ্রীহরি!' অভ্যেসমত বলে পুণ্যদাসী এগিয়ে গেল। তীর্থে যেমন দেখো, এখানেও তারা তেমনি সুখে-দুখে একসঙ্গে, কিন্তু তাব'লে মরলে পরে দুঃখ নেই। পুণ্যদাসীরা জানে, যে গেল সে বেঁচে গেল।

এখন মনে মনে 'দুর্গা' বলতে বলতে সে নীরলরতন হাসপাতালে ঢুকল। এখানে তার বউ কাজ করলে আর সে সাহস করে আসতে পারত না। ভাগ্যে বউ ইডেনের দাই, 'হ্যাঁ গো, চোখের ডিপার্ট কোতা?' পুণ্যদাসী একজনকে জিগ্যেস করল।

চোখ দেখাবার জায়গায় পেল্লায় ভিড়, ছোট্ট-খাট রথের মেলা বললেই হয়। 'ও মা, এ যে সেই ভিখিরীটা গো! একজন ফর্সামত ঝি আরেকজনকে বলল। দ্বিতীয়-জন জবাব দিল না। একজন বৃদ্ধ চোখে মোটা কাচ এঁটে বসে মাথা নাড়ছিলেন। তিনি বললেন, 'আহা, ভিখারী তো আমরাও। তীর্থের কাকের মত বইয়া আছি দেখ না?'

হাসপাতালে সবাই সমান, পুণ্য সেটি জানে। টিকিট হাতে করে বসল।

অনেক পরে, পেট-কাপড়ে টিকিট আর ঔষধের শিশি বেঁধে সে বাড়ি ফিরল। এখন তার মন প্রফুল্ল, শরীরে উৎসাহ। আশা আছে, ক্ষীণ হলেও আশা আছে। বাড়ি ফিরতে ফিরতে সে মনে মনে মানত করতে লাগল 'হে বাবা জগন্নাথ, তোমার দয়ায় আমার বছর বছর ওজগার, চক্ষুটি তুমি এখো গো! এক টাকার চিনি-কলা দেব। চক্ষুটি তুমি এখো ঠাকুর, তোমায় নয়ন ভ'রে দেখব।'

বাড়ি ঢুকতেই রেডিওর গান তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। বউ ছুটে এসে বলল, 'তবে এলে? তোমার নাত-জামাই এসেছে। আমি ভাবছিলাম খেয়েদেয়ে তোমার

ওপর ঘর ছেড়ে দে ছুটে হাসপাতালে যাব। পেশেনকে বলব ডিউটিটুকু আমি সেরে দিই, লাবি আসুক !'

'অ !' পুণ্যদাসী থতমত খেল, 'আমি কি করব ? এখ্নো আন্না বাকি, তোর শ্বশুরকে আনতে আছে !'

'আন্না আমি করিছি তোমাদের !' বউ নীচু গলায় বলল। তার নিজের তাড়া না থাকলে এমন নিঃস্বার্থ ব্যবহার আজকাল সে কমই করে।

'আন্না করিছি। তোমাদেরটা তুলে দিইছি। শ্বশুরকে আনতে যাবে কি এখন, সে ত সন্দেবেলা ! তখন জামাই আর লাবি ঘরে অইবে এখন ! ও কি কর ?'

'উনোন দেখছি। আব চাটটি ভাত না বসালে আতের পান্তা, সকালের পান্তা ?'

'সব করে রেখিছি বাবু !' বউ গা-ঝাড়া দিল। তারপর বলল, 'জামায়ের সামনে যেতে হলে কাপড় ছেড়ে যেও বাবু। ও প'ক্ষের মানুষ !'

বউকে একটু বেশী অস্থির মনে হল, উৎসাহে চঞ্চল। পুণ্যদাসী নিজের আনন্দে ডুবে ছিল, তাই সেদিকে মন গেল না।

বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ চান করেই যাব। নাত-জামাই পাশ করেছে ?'

'করেছে।'

'কাজ পাকা হল ?'

'হয়েছে।'

'তবে মিষ্টি খাওয়াতে হবে।', পুণ্যদাসী ফোকলা মুখে হাসল। তার মুখের কালো, ছোট হাঁ দেখেই বউ-এর পা থেকে মাথায় ঘেন্না শিউরে গেল। ছেড়ে যেতে হবে, ফেলে যেতে হবে এই সব পিছটান, কাঁথার ভ্যাপসা গন্ধ, ফোঁপরা বটগাছের আশ্রয়। কেন না ভুবন বড় শৌখীন ছেলে। নিজের বাপ-মা সবাইকে ছেড়ে বউ আর শাশুড়ীকে নিয়ে কোয়ার্টারে যাচ্ছে, কেন না তার বাপ-মা বড় গরীব, ওদের ধরে থাকলে উন্নতি হয় না।

'আমার বাপ-মা তো তবু পদে আছে, এরা সব জাত ভিখিরী, আরে ছ্যা ছ্যা, রাম কহ !'

মা-মেয়ের অন্তরঙ্গ কথা হাসপাতালেই হয়। একজনের ডিউটি শেষ হয় আর একজন ঢোকবার সময়ে।

লাবি তাই মা-কে বলল, 'কি করবে সেটি ভেবে দেখ।' মা'র ভেবে দেখতে একটুও সময় লাগল না।

'তবে', সে লাবিকে বলল, 'যা করব তা অথের সময়ে। ওদের জানতে দেব না

'জানতে দেবে না ?'

'না। তিন মাসের ভাড়া বরং গিন্নীকে দিয়ে যাব। তিন মাসের মধ্যে কি আর ওনারা দেখে নিতে পারবে না কিছু? ভগবান জানে এমন কাজ করতে আমার বুকের মধ্যে কি হচ্ছে। কিন্তু আমারই বা উপায় কি?'

'অনেক করেছ বাবু!' লাবি মুখঝামটা দিয়ে পেশেন্টের চুল বাঁধতে গেল।

রথযাত্রার দিন পুণ্যদাসী বড় আগ্রহ করে সকাল সকাল রওনা হল। মাগনদাসকে বলে গেল, 'আমার এট্টা মানসিক আছে। তুমি বাবু দোকান থেকে যা হয় খেও। আমার আসতে সেই যাকে বলে সন্ঝে।'

প্রবল বর্ষণে পুণ্যদাসী চুপ করে ঘরের কোণে বসে ছিল। নিশ্চুপে এসেছে সে, কাউকেও জানতে দেয়নি। চোখের দৃষ্টি তার ফিরবে না, চোখের শিরা শুকিয়ে যাচ্ছে একথা জানবার পর কয়েক ঘণ্টা কেটে গিয়েছে।

বাড়িতে এসেছিল বলে ওদের সব কথা ও জানতে পারল। জেনেও, বউ-এর নিষ্ঠুরতা তার মনকে নতুন করে আর স্পর্শ করল না। ভগবানের নিষ্ঠুরতায় তার চোখ দুটি যাচ্ছে। বউ-এর নিষ্ঠুরতায় তাদের আশ্রয়টুকু যাবে।

'এমন কত কানা, খোঁড়া পথে পথে…' নাতজামাই-এর কথা কানে এল, 'তবু তো আপনি তিন মাসের ঘর ভাড়া…'

'দিতে হবে না।' এ ঘর থেকে পুণ্যদাসী বলল।

'তুমি!' বউ এসে দরজা ধরে দাঁড়াল, তার মুখটা অপ্রতিভ, বিরক্ত।

'মা আর অন্যাইটা কি করছে বল।' লাবি খনখন করে বলল।

'এই যে তুমি আমাদের নুইকে হাসপাতালে যাচ্ছ আর আসছ, শেষে কি রোগভোগ নে সবাই মিলে মরতে হবে?'

'আমার রোগ হয়নি।'

'তবে কি হাসপাতালে বেড়াতে গিইছিলে?'

'চোখ দেখাতে গিইছিলাম। চোখটি সারবার লয়, আজ শুনে এসতেছি। বাপো রে!' পুণ্যদাসীর বুকে হাঁফ ধরছে, দম নিতে তার কষ্ট হল।

'তা'লে?'

'অন্ধ হব। তোর শ্বশুরের মত হব!' পুণ্যদাসী মাথা নেড়ে সে সম্ভাবনাকে একটু দূরে ঠেলল। তারপর উঠে দাঁড়াল।

'কোথা যাও?' বউ-এর গলা একটু ক্ষীণ, 'এই বিষ্টিতে, পাগল না কি?'

পুণ্যদাসী জলে পা দিল। না, এখনো হাঁটুজল হয়নি।

'বলি, যাও কোথা ?'

'অথের চাকার নিচে মরব। বিশ্ব ভোবন থেমে থাক, অথ তো চলবে।'

'হা দেখ, অথ কোথা পেলে তুমি ?'

কোন কথা শুনল না পুণ্যদাসী। আকাশ থেকে জল পড়ছে, শহর জলে থই থই। মানুষ-জন, গাড়ি-ঘোড়া কিছু নেই। জল ঠেলে গিয়ে সে কাঠগোলার উঠোনে ঢুকল। পালচৌধুরীদের কেউ কোথাও নেই, রথের চুড়ো তেরপলে ঢাকা। কাঠ-গোলায় মজুররা দরজা বন্ধ করে বসে আছে।

'দোর খোল, বাপা সকল, দোর খোল !' পুণ্যদাসী ঘা দিতে লাগল।

'কৌন ?' লোহার রাগী ঘণ্টার মত ঢং করে কে বললে ভেতর থেকে।

'আমি গো, পুণ্যদাসী, অথ চলবে না ?'

'নেহী।'

'সি কি গো, অথ চলবে না ?'

কোন জবাব নেই।

এখন পুণ্যদাসী ভীষণ ভয় পেল। নিদারুণ ভয়। সামনে তাকিয়ে দেখল থই থই জল, তার চোখের মত ঘোলা। এই তো সামনেই তার ঘর, এতদিনের আশ্রয়। কিন্তু তার দৃষ্টি চলে যাচ্ছে, রাস্তা থেকে বিষ্টির জল শুকোবার মতই তাড়াতাড়ি চলে যাবে তার দৃষ্টি। বউ চলে যাবে, তার এতদিনের আশ্রয়ও চলে যাচ্ছে, তবে কি সে এখনি মাগনদাসের কাছে যাবে ? বিষ্টির রকম দেখ, যেন 'প্রলয় পয়োধি জলের মত' বন্যে নামাবে। কিন্তু সামনে ঐ কি ? তার একেবারে সামনে ? পুণ্যদাসী হাত বাড়ালে। হোক এতটুক ছেলেদের খেলাঘর থেকে ভেসে আসা। তবু রথ, জগন্নাথের রথ।

'হা দৈব !' পুণ্যদাসী এখন বুঝতে পারল জগন্নাথের রথ তাকে অনেক আগেই চাপা দিয়েছে। মাহেশে হলধারীর বাপ মরেছিল। তারও আগে জগন্নাথে না কি কাতারে কাতারে—কিন্তু তাকেই প্রথম চাপা দিয়েছিল, রথের প্রথম বলি হবার অলৌকিকত্বে তার ঘোলা চোখ বিস্ফারিত হল।

সেই যখন সে হেলোচাষীর ঘরে যায়, সেই যখন মাগনদাসরা এক কথায় জমি, লাঙল, বাস্তু সব হারাল, তখন থেকেই সে রথের নিচে। তারপর এই এতদিনের জীবন, ছেলেটি মরল, বাড়ি বাড়ি কাজ, পথে পথে ভিক্ষে, সরতে সরতে ঘরের এক কোণায় এল, সেখানেও তাকে রথের চাকা তাড়া করে এল। এই যে দৃষ্টিটি গেল, এই যে বউ তাদের ফেলে চলে যাচ্ছে, এ আর কিছু নয়, জগন্নাথের রথ।

'ও মাসী, উট্টে এস !'

কখন সে বড় রাস্তায় এসেছে, পথ দিয়ে চলেছে, পেছনে দক্ষিণেশ্বরের ভামিনীর গলা।

'মাসী অথ বেইরেছে! জলে হড়হড়িয়ে চলছে, দেখছ না? উট্টে এস!'

হ্যাঁ, রথ তবে বেরিয়েছে। চাকার গড়গড়, গমগম শব্দ। পুণ্যদাসী, কোমর-জলে দাঁড়ানো এত এত লোকের চিৎকার শুনতে পেল না, হাতে ছোট রথটা চেপে ধরে মাঝ-পথেই দাঁড়াল। উট্টে এস। ভামিনী কি জানবে জগন্নাথের রথের চাকায় পুণ্যদাসী কবে থেকে বাঁধা?

'উট্টে এস গো!'

'হা দেখ ভামিনী?' পুণ্যদাসী বলতে চেষ্টা করল, 'একে আমি চেরদিন অথের চাকায় বাঁধা, তায় জগন্নাথের অথ চলে আকাশ-পাতাল জুড়ে, কোথায় উঠি বল?'

কিন্তু 'হা দেখ' কথাটি মুখে থাকতে থাকতেই জলের ধাক্কায় হাতে ছোট রথটি ধরে পুণ্যদাসী মুখ থুবড়ে পড়তে পড়তে দোকানের খুঁটি ধরে সামলাল।

'জয় জগন্নাথ' ধ্বনি, জলের ঢেউ, আর রথের চাকা সবই তার ওপরে উঠে আসতে চায়। সেই ধাক্কায় পুণ্যদাসী খুঁটিসুদ্ধ জলে মুখ থুবড়ে পড়ল।

'আমি তো অথের চাকায় আগে থেকেই বাঁধা গো!' তার কাতর মিনতি কারোর কানে গেল না, শুধু রথের চাকা থর থর করে কেঁপে একটু থেমে আবার চলতে লাগল।

এক সময়ে আমোদীর গালে টোল পড়ত, সে চলতে-ফিরতে মাজা দোলাতো ও একখানা ঝকঝকে পেতলের থালায় জল রেখে মুখ দেখে গুনগুনি করে গান গাইত—

'বেউলোর মা বরণ করে
বামে হেলায় মাজা গো।'

সে যেন কত লক্ষ, কত অযুত নিযুত যুগ আগেকার কথা। তখনো দেশে পঞ্চাশের মন্বন্তর থামেনি। তখনো আমোদীর বাপের বাড়ির জ্ঞাতগুষ্টি কলকাতা শহরের রাস্তায় মুখ থুবড়ে পড়ে মরেনি। তখনো দেশগাঁয়ে বিজলীবাতি আসেনি, সিনেমা হয়নি। চালের মণ দুই, আড়াই, তিন টাকা। সমাদ্দারদের যে ছেলে এখন ভোট পেয়ে নেতা হয়েছে, সে তখন ন্যাংটো ছেলে। মাওড়া ছেলে, সমাদ্দারদের বুড়ীদাসী তাকে এনে আমোদীর কোলে দেয়।

আমোদী তাকে দুধ খাওয়ায়। নিজের ছেলের সঙ্গে দুধ খাওয়ায়। আমোদীদের উঠোনে তখন এই এতবড় একটা পিটুলি গাছ। গাছের ছায়ায় অঙ্গ জুড়োয়। গাছের নিচে এতখানি জায়গা লেপে-পুঁছে পরিষ্কার। সেই জায়গাটুকু বাঁশের বেড়ায় ঘেরা থাকে। বাড়িতে ছেলেপিলে পাঁচজনের মিলিয়ে অনেকটি। যে ছেলেটি যখন ছোট থাকে, সবে হাত পা বেরিয়েছে, তাকে সেখানে রাখা হয়।

যে বউটির কোলে কচিকাচা থাকে, এখনো নাড়া পোক্ত হয়নি, শক্ত কাজে যেতে পারে না, সেই পাশে বসে থাকে। নিজেও জিরোয়, ছেলেটিকেও পাহারা দেয়। ছেলের মা বলে যায় 'খোঁয়াড়ে ছাগল থুয়ে গেলাম গো!' এই কথা বলে কাজে যায়। তখন আমোদীদের বাড়ি দিনেরাতে কাজ ফুরোয় না। ধান ভান, ধান সিজোও, খাল থেকে মাছ ধর, মাঠ থেকে যারা আসছে তাদের মাছঝাল, কিউলি.ডাল দিয়ে চুড়ো করে ভাত বেড়ে দাও।

কচিকাচা খাওয়াও, কাঁথা সেলাই কর, উঠোনের কোণে লঙ্কা, বেগুন, কুমড়ো গাছ কর। বাড়িতে এতগুলো বউ-মেয়ে থাকতে কি তরকারী কিনে খাবে না কি?

বাড়ির বুড়ীরা কাঠকুটো কুড়োও, গোবর চাপড়ি দাও, নারকেল জ্বাল দিয়ে তেল তৈরী কর।

এই যখন সংসারের অবস্থা, তখন আমোদীর কোলে কচি ছেলে। আমোদী পিটুলী গাছতলায় বসে থাকত, ছেলেকে দড়ির দোলায় দোল দিত আর গুনগুন করে গাইত—

তার দুঃখে দশদিশি কান্দে গো
দশদিশি কান্দে।

গানটি এক ঢাকা জেলার বেদেনীর কাছে শেখা। বেদেনী আমোদীকে দেখে সই পাতিয়েছিল ও এই পিটুলী গাছতলায় বসে বসে কত দুঃখই সে করত। বেদেনী এ গ্রামের সকলের চেনা। কাঁধে ঝুলি নিয়ে সে আসত, এক এক বাড়ির উঠোনে বসে আগে ডাকত 'বাড়িতে বাইত্যানী আসছে, মায়েরা কনে গো?'

তারপরই সে গলা ছেড়ে গান গাইত—

'ভালবাসা সর্বনাশা আগে না রে জানি
মায়ের চক্ষে হইলাম আমি কুলের কলঙ্কিনী
যার লাগিয়া কলঙ্কিনী তারে কি ভোলা যায়?
কলঙ্কিনী হৈলাম ভবে তাতে নাই ক' দুঃখ
বন্ধুর বুকে বুক মিলাইয়া শীতল করব বুক
হা রে দেওয়ানা খইমানার দুঃখ পালরন না যায়'॥

তার গানে একরকম হাহাকার থাকত, বুকফাটা হাহাকার, যা শুনলে আমোদীর গায়ে কাঁটা দিত।

বেদেনী ছোট ছেলেমেয়েদের ওষুধ দিত, বউ-মেয়েদের শেকড় কবচ, বুড়ো-বুড়ীদের দাঁতের ব্যথার ওষুধ, পেটের রোগের মাদুলী।

তাকে দেখে আমোদীর শাশুড়ী বলত, 'এ বেদেনীর সংসারে এ্যাত আঠা আছে একে ঘরের বার কে করলে গা?'

বেদেনী আমোদীর কাছে এসে বসত। পিটুলী গাছতলায় বসে নিশ্বাস ফেলে বলত, 'সবই আছিল আমার ঠাইরেন, সবই ছিল জলজলা। ঘরে সতীন আইতে আমি দেশান্তরী অইলাম। আমার বুকের উপর বইয়া তারা হাসবো, খেলবো, আমি নি তাই বইয়া বইয়া দেখুম? তাই আমারে দেশান্তরী ছাহেন।'

আমোদী তার কাছে কত গান যে শুনে শুনে শিখেছিল। কত দেহতত্ত্ব গান, বুলবুলি গান, মুর্শিদা গান। বেদেনী গান গাইত, মাঝে মাঝে গান থামিয়ে বলত, 'ছাহের মাঝে মন জ্বলে ঠাইরেন, মাটির তলায় না সান্ধাইলে এই জ্বলা যাইব না।'

আমোদী ওর কথা শুনতে শুনতে সমাদ্দারদের ছেলেকে দুধ দিত। বেদেনী বলত, 'মাওড়া পোলারে দুধ ছান, ভালই করেন ঠাইরেন। এই পোলা নি আপনারে

দুধ-মা ডাকব, কত আগ্গাম কইরা সামগ্রী লইয়া দিব ?'

আজ ভাবলে মনে হয় সে যেন লক্ষ লক্ষ যুগ আগেকার কথা। বুঝি সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগের কথা। কবে তেমন দিন ছিল, তেমন দেশ ছিল ? এই রাজপুরে, কামডহরিতে, গড়িয়াতে ? মনে তো হয় না। সে তো পঞ্চাশের মন্বন্তরের দু'বছর আগেকার কথা। তবু কেন মনে হয় অনেক, অনেক দিন আগে ?

সমাদ্দারদের ছেলে এখন দেশের নেতা, এদিকের অনেকগুলি গ্রামের মাথা। আমোদীদের এই জগদ্দল-মশাটপুর গ্রামে সে ক্বচিৎ কদাচ আসে। তবু এখন তার তেলের কল, খড়কাটা কল, আটা ভাঙা কল হয়েছে। তাদের বাড়িতে বিজলী বাতি জ্বলে। সে মায়ের নামে সিনেমা হাউস দিয়েছে বড় রাস্তায়। এখন কি ভাবা যায় একসময় আমোদীর বুকের দুধে ও মানুষ হয়েছিল ?

তবে এইটি ভাবলে আমোদীর বুক ফেটে যায়। সে মাঝে মাঝে বলে, 'অ পেল্লাদ, আমাদের পানকেষ্ট মা-কে জন্মে ছ্যাকেনি, তার নামে ইস্কুল দিলে, ছিনেমা বাড়ি দিলে, দুধ-মা-কে কিছু দিতে নেই ?'

প্রহ্লাদ তেমন মাতৃভক্ত ছেলে নয়। মা বল, বউ বল, বোন বল, দাঁত খিঁচিয়ে কথা বলা, 'মাগী-ছাগী' করা তার অভ্যাস।

সে দাঁত খিঁচিয়ে বলে, 'দিতে নেই! বিয়েনবেলা পানকেষ্টর বিত্তান্ত! ক্যান, বাসি উটি, পান্তা, কিছু পেটে পড়েনি বুঝি ? পেট কোঁ কোঁ করতেছে আর পেলাপ বকতেছ ?'

'তা কেন,' আমোদী দুঃখিত হয়ে বলে বাছার আমার দুধ-মা বলে টান তো আছে। তাই বলি, 'আমারে একবার যেতে দে তোরা। আমারে ধর্, যদি কিছু এট্টা দেয়, তো নেড়ে চেড়ে তুই খেতে পারবি, পেসাদী খেতে পারবে, তাই বলি!'

'নেড়ে চেড়ে খাবে!'

প্রহ্লাদের গলা ছাপিয়ে প্রসাদী, আমোদীর বিধবা মেয়ে টিটকিরি দেয়, 'যা না দাদা! মায়ের পানকেষ্ট মা-রে আজ-আণী করে দেবে। উনি যশোমতী, উনি তাঁর কেষ্ট ছেলে কিনা!'

প্রহ্লাদ বলে, 'বিয়েনবেলা বকনি তো ? তোমার কেষ্টছেলে এখন কংসরাজার অধিক হয়েছে, জানলে ? ভোটটি নেবার সময় এসে সকলের কাছে হেদিয়ে মরে। হক-না-হক তোমায় এসে মা মা করে, আমাদের গায়ে হাত দে কথা কয়। আর অন্য সময়ে ? পেসাদীর ছেলেটারে ওর আটা কলে কাজ করে দিতে বলিনি ? ধরিনি হাতে পায়ে ? ত্যাখন আকাশ পানে চোখ তুলে বলেছিল তুমি পাগল হয়েছ পেল্লাদ ? কাজ ? এই কাজ করবার জন্যে বলে নেকাপড়া শিকা ছেলেরা

লাইন দে সাধতেছে ?'

প্রহ্লাদ রেগে প্রয়োজনের চেয়ে অনেক জোর দিয়ে দিয়ে কাঠ চেলা করে ও, বলে, 'এ্যাখন ভোটের সময় নয় তো ! তাই পেল্লাদরে বোকা বুঝিয়ে দিলে। আমি শালা এমন কানা বলদ যে মুখ বুজে চলে এনু। কাজটা দিল কাকে ? না গুরুপদ সরখেলের ভাইকে। কেন দিল ? না গুরুপদ সরখেল যে ওনার নাড়ীর খবর রাখে, এক গোয়ালের গোরু।'

দুমদাম করে কাঠের গুঁড়িটা চেলা করে কুড়োলটা মাটিতে ফেলে রেখে প্রহ্লাদ গায়ের ঘাম মুছতে মুছতে দাওয়ায় গিয়ে বসে ও বেশ গলা ছেড়ে বলে, 'কি দিবি দে পেসাদী, আমার বেলা হয়ে যাচ্ছে।'

কথাটা প্রসাদীর উদ্দেশ্যে নয়, প্রসাদীর ভাজের উদ্দেশ্যে বলা।

প্রসাদী বিরক্ত হয়ে বলে, 'বউদি দাও না গো দাদাকে। নিত্যি নিত্যি বলতে হয় কেন জানিনি বাবু। এ্যাখন আমি বাসি পাট সারব না হেঁসেলে ঢুকব ? ওদিকে ঘোষবুড়ীর গলায় মোদু আছে মা ! মোদু ঢেলে ক্যামন মিষ্টি করে বলবে বিয়েনের বাসিপাট যদি সেরে নেব পেসাদী, হবে আর নোক রেখে কাজ কি মা ?'

প্রহ্লাদ প্রসাদীর সঙ্গেই যা একটু ভাল করে কথা বলে। বোধ হয় প্রসাদী এ সংসারের দ্বিতীয় রোজগেরে ব্যক্তি বলেই। এখন সে বলে, 'দাঁড়া না। ভেড়ীতে আমাদের যে ভাগটা ছিল সেটা যদি এবার হাঁসিল কত্তে পারি তা'লে তোকে আর ঘোষবুড়ীর কাজ কত্তে হবে না।'

প্রসাদী অন্য সময়ে হলে নিশ্চয় বলে বসত, 'আমায় কত্তে হবে না ! নিজের ঘরে না হাঁসের পাল পুষে রেখেছ ! তাদের কি গতি হবে ?'

এখন সে কথা মনে এলেও মুখে বলল না। মাঝে মাঝে দাদার জন্যেও কষ্ট হয়, বউদির জন্যে, মায়ের জন্যেও। কি জ্বল-জ্বলে সংসার ছিল তাদের কিন্তু খুড়ীমা যে বলে পঞ্চাশের মন্বন্তরের পেছন পেছন দেশে সর্বনাশ ঢুকল ? বলে, 'দেকিসনি পেসাদী, ক্রেমে ক্রেমে আমরা ভাগ হনু, আমাদের জমিজিরেত জবরদখল হল। যাদের হাজার বিঘে আছে তাদেরও গেল, আমরা পোকামাকড়, দু'বিঘে জমিতে এতগুলো পেরাণীর পেতিপালন, তা আমাদেরও গেল। তোর বাপ, খুড়োরা ঝপাঝপ মোল, এখন কে বলবে মা, আমি আর তোর মা মিলে এক এক দিনে আধমণ মুড়িও ভাজতাম ? বাড়িতে বত্রিশটি মানুষ ছিলাম, দিনে পাঁচ পালি চাল রাঁধতাম ?'

প্রসাদীও সেইসব সুখের দিনের তলানিটুকু দেখেছে। দাদাকে সুসময়ে দেখেছে, অসময়েও দেখছ। তাই সে সহানুভূতির সঙ্গে বলে, 'সে যা হয় কোর। আর

আমার গুঁড়োটার দিকে চেয়ে, ধবধবার ওদের মুখে ঝামা ঘষে দিয়ে ঐ মাতো তুলের দরুণে জমিটা উদ্ধার কর তো দাদা!'

'করব রে করব,' প্রহ্লাদ হেসে বলে, 'সে পেল্লাদকে কেষ্ট কয়বার পরীক্ষে করিছিল? আমাদের পানকেষ্ট তো আমাকে পরীক্ষের মধ্যেই রেখেছে? এই দেখ না, এই ভেড়ীটুকু আমাদের পিত্তিকেলে সামগ্রী। তা দেখ, নিংড়ের ওরা যে জবর-দখল করে নিলে, তার পিতিকার কর! না তখন মুখ খিঁচিয়ে বললে, ওদের সঙ্গে তোমাদের পঞ্চাশ বছরের শত্রুতা, আমি কি করব বল?'

আমোদী অবাক হয়ে বলে, 'ইদিক না কি পানকেষ্টরা ধানের জন্যে, মাছের জন্যে, এ্যাত্ত-এ্যাত্ত টাকা খরচ কত্তেছে, তা ভেড়ী থাকলে তবে তো মাছ হবে? এটা সে বোঝে না?'

'তবেই ছাখ মা, তোমার কেষ্টর পরীক্ষা কত্তরকম তাই দেখ! আমাদের ধেনো জমি নেই। চাষ-আবাদ নেই। পিত্তিপুরুষের জিনিসটুকু নেড়ে চেড়ে খাব তার পথ নেই। ছোটখুড়ো তো সেইজন্যে বলে, পেল্লাদ, নিজের গাঁয়ে বাস, টেশনে কুলীগিরি করিস, সে তো ভিক্ষেরই সামিল! উদিকে ছাখগা যা, যাদের তেলামাথা তাদের অবস্তা চচ্চড়িয়ে উঠছে। তা আমি বলি চল্ না ক্যান, শওরে যেয়ে ভিখিরী হই?'

আমোদী বলে, 'তা কি হয় বাবা?'

প্রহ্লাদ বলে, 'আমি বলি কাকা, এ্যাদ্দিন দেখেছি, এবার ভোটের সময় পানকেষ্ট কি করে দেখি?'

প্রহ্লাদ বেরিয়ে যায়, এ অঞ্চল থেকে পান, মাছ, বেগুন, শহরে যায়, মোট বইবার কাজ করে।

প্রসাদী ঘোষবাড়ির কন্না সারতে যায়। আমোদী যায় ভেড়ীর ধারে। জলের ধারে এখনো শুশনীশাক, কলমীশাক, থানকুনির পাতা পাওয়া যায়। আমোদীদের বয়সী যারা তারা সেই শাকপাতা তুলে রাসমণির কাছে বেচে আসে। রাসমণি রোজ গড়িয়ার বাজারে যায়, শাক, ডুমুর থোড় বেচে। আমোদী এখনো শহর বাজারকে ভয় পায়, এখনো তার মধ্যে কোথায় যেন একদিনের গেরস্ত চাষী-বউয়ের লজ্জা লেগে আছে।

শাক তুলতে তুলতে তার কত সময়ে বেদেনীর সেই গানটি মনে পড়ে—

'তার দুঃখে দশদিশি কান্দে!'

এখন আর আমোদীর গলায় সুর নেই। স্বামী, সন্তান, দেওর, শাশুড়ী, সকলের মৃত্যুতে বুক ফেটে কেঁদে কেঁদে সে গলার সুরটি হারিয়েছে।

তবু মনে হয়, সেই গান কেবলই মনে হয়। এমন মনে হয় অরন্ধনের বাসি

ভাত-ব্যঞ্জনের স্বাদ, রথের মেলার চাঁপা ফুলের গন্ধ, অম্বুবাচীতে মনসাতলায় দুধ-কলা দেবার সরার লাল উজ্জ্বল রং। বেদেনীর গান সেইসব দিনের সঙ্গে জড়ানো, সেইজন্যেই কি মনে হয়? কোথায় চলে গেল, কেমন করে চলে গেল সে সব দিন?

'যে দিনটি যায় দিদি, সেই দিনটিই ভাল,' আমোদী বাসিনীকে বলে। বাসিনী তার ছোট-জা। কিন্তু তবু আমোদী তাকে দিদি বলে।

'যা বলেছিস দিদি!' বাসিনী জবাব দেয়।

'আজ মুড়ি খাবিনি?' আমোদী ভয়ে ভয়ে জিগ্যেস করে। মাঝেমাঝে বাসিনী মুড়ি আনে, সে আর বাসিনী খায়। মাঝেমাঝে আমোদী রুটি আনে, দুজনে খায়। তবে আজ ক'দিন গম নেই, আমোদী রুটি আনতে পারে না।

'মুড়ি নেই দিদি।'

বাসিনী নিশ্বাস ফেলে বলে, 'এই এ্যাত্ত এ্যাত্ত মুড়ি ভেজে নে এনু, তা সরখেল গিন্নী তিনগণ্ডা পয়সা ঠেইকে দে' বললে মুড়িভাজুনীকে আর মুড়ি দিতে পারব না মা। কলকেতায় মুড়ি এখন চার টাকায় বিকোয়। তিনগণ্ডা পয়সায় কি হয় বল? একখানা তরকারী রাঁধবার ড্যাটা কুমড়ো অবধি হয় না। তা মাগী বুজলে?'

'মুড়ি চার টাকা!' আমোদীর শুধু মনে হয় সরখেলদের তাহলে কত টাকা লাভ হবে এবার।

'হ্যাঁ গো! তাই তো শাউড়ী বলছিল, যেয়ে পেল্লাদের মাকে বল্‌গা পানকেষ্ট গাঁয়ে এসতেছে, তাকে বলে হোক, পায়ে ধরে হোক, আমাদের ভেড়ীটা হাসিল করে দিক। কি এক সব্বনাশা কথা তোমার দেওর শুনে এয়েছে। ভেড়ী না কি আর অইবে না।'

'হ্যাঁ, ভেড়ী অইবে না! হেঁটে চলে যাবে নাকি?'

'না গো, নিয্যস কথা। ভেড়ী কেটে জল বইয়ে দেবে।'

'সে কি?'

'বিষ্টি হয়নি। কেনাপে জল নেইকো, ধানজমি তাতে ফাটতেছে, সেই জন্যে।'

'সব ভেসে যাবে না?'

'ভেসে যাবে! ভেড়ীর জল দেখতেছ না কমতে কমতে কোথায় গেছে? এবারকার শ্রাবণ মাসে আকাশ য্যানো চত্তিরের মত হা হা কত্তেছে। জল নেই কোথাও, ভেড়ী কাটলে কি বা হবে?'

'তাতে ধান কতটুনি হবে বল্ দিকি?'

'আমরা ভেমোচাধা আমাদের বুদ্ধি ওরা নেবে কেন? ওরা বলে কত

নেকাপড়া জানা লোক! তাছাড়া, যা বুঝতেছি নিবড়ের লোকেরা এই কীর্তি করবে।'

'ক্যান গো? ওদের তো হক নেই?'

'হক নেই! ওদের পেছনে ট্যাকার জোর আছে গো! আমাদের আছে কে বল? না আছে ট্যাকা, না আছে লোকবল! তোমার ঘরে পেল্লাদ, আমার ঘরে পেল্লাদের খুড়ো! সে মানুষ তো এক কথা জপতেছে। চ' শওরে চ', শওরে যাই। যানো শওরে আর কেউ যায়নি, যানো তারা পথে পথে ঘুরতেছে না!',

'আমি পানকেষ্টর কাছে যাব,' আমোদী বলল।

'আগে বা যাওনি ক্যান?'

'দুঃখ হত দিদি, দুধ-ছেলে হয়ে একবার দেখে না, দুঃখ হত।'

'এখন দেখবে?'

'কি জানি। তবে আমার মন বলে দিদি, মানুষে যাত কথা বলে পানকেষ্ট অত মন্দ নয়। ধাজার বাড়-বাড়ন্ত দেখে সবাই অভিশাপ করে।'

'তার এখন গরম খুব!'

'পেল্লাদও তাই বলে। কিন্তু আমার মন বলছে আমি গেলে সে কথা শুনবে।'

বাসিনী হঠাৎ হাসল। এক সময়ে আমোদীর সরু কোমরের গুমোর ছিল, বাসিনীর গুমোর ছিল মিষ্টি হাসির। সরখেল বাড়ির বুড়োকর্তার বাসিনী নামে মেয়ে মরেছিল, তাই বাসিনীকে মেয়ে করেছিলেন। পুজোয় কাপড় দিতেন, নারকেল দিতেন। এই এতটুকু করে আফিং খেতেন, আর বাসিনীদের বাড়ি এসে বলতেন, 'হাস্ দেখি মা, হাস্ তো? হাসিটুকু দেখে বুড়োবাপ বাড়ি যাবে।'

বাসিনীর এখনকার হাসি' সে হাসির কঙ্কাল মাত্র। সে বলল, 'তুমি যাবে দিদি? তা যাও। কেষ্ট রাজা হলে নন্দরাণী তো যাননি, তা তুমি যাও। দেখ তোমার কেষ্ট ছেলে কি বলে।'

আমোদী গেল।

সমাদ্দারদের ইস্কুল বাড়িতে তখন এক মহতী জনসভা। কম করে একশো লোক বসে আছে। এই একশো লোক ডাকতেই প্রাণকৃষ্ণ সমাদ্দারের কালঘাম ছুটে গিয়েছে।

এখন সে তাই বলছিল, বি. ডি. ও-কে।

'গ্রামের লোক আর তেমন নেই, জানলেন? ওদের সরলতা-টরলতা সব এখন ভুয়ো হয়ে গিয়েছে। দেখুন না, বিশ্বাস অবধি করতে চায় না এতে ওদের ভাল হবে, ঐটুকু একটা ভেড়ী, তাই নিয়ে দু'গ্রামে লাঠালাঠির সম্পর্ক জীয়ে থাকবে

তাই ভাল ? না ধান চাষের দিকে…'

বি. ডি. ও কিছু বললেন না। কাজের জন্যে মিলতে হয়, নইলে এই সব মানুষ দেখলে এখনো তাঁর গা ঘিনঘিন করে। বোধ হয় চাকরিতে নতুন বলেই। এখনো গ্রামের নেতা, নানাজাতের দলের নেতা, অমুক নেতা, তমুক নেতা, তাঁর গা-সওয়া হয়নি।

এমনি সময়ে আমোদী এল। সোজা সকলের সামনে দিয়ে প্রাণকৃষ্ণ সমাদ্দারের কাছে উঠে এল। বলল, 'অ বাবা পানকেষ্ট!'

'কে ?'

'আমি তোমার দুধ-মা বাবা!' কিন্তু প্রাণকৃষ্ণ সমাদ্দার এখন ভীষণ মোটা, একটুতেই হাঁপায়। তার দুধ খেয়ে প্রহ্লাদের চেহারা ঐ রকম পুঁয়ে পাওয়া, আর প্রাণকেষ্টর চেহারা এরকম, ভাবতে গিয়ে আমোদীর বুদ্ধি হরে গেল।

আর, এমন আশ্চর্য, যে সে ঠিক সেই কথাটিই বলল।

তখন বি. ডি ও শুধু ভাবছিলেন প্রাণকেষ্ট কেন এইসব ঘটনা, এই গরীব চাষীর ঘরের দুধ-মা, ইত্যাদি, জনসংযোগের জন্যে ভাঙায় না!

প্রাণকেষ্ট যেন হঠাৎ অন্তর্যামী হয়ে ওর প্রশ্ন বুঝতে পারল ও রেগে উঠল। আমোদীর সঙ্গে তার সম্পর্ককে বিজ্ঞাপন দেবার ইচ্ছে তার আগেও হয়েছে। কিন্তু প্রহ্লাদরা অতি ঘুঘু পার্টি, বজ্জাতের ধাবি। কোন দলেও ভেড়েনি, রাজনীতির খপ্পরেও পড়েনি, তবু কি কি পায়নি, কি কি চাই, সে বিষয়ে অতিশয় হল্লা করা স্বভাব। এইসব ভেমোচাষা বুদ্ধিতে ধুরন্ধর, এদের প্রাণকৃষ্ণ মোটে দেখতে পারে না।

কিন্তু আমোদী একেবারে সামনে, কিছু একটা তো বলতে হয় ?

তার আগেই আমোদী মুখ খুলল।

'তোমার কেমন কান্তি বাবা, কত নাম! আমার পেল্লাদের অবস্থা যে দিন হতে দিনে মন্দ হচ্ছে বাপ আমার! তা দুধ-মার জন্যেই তো মহাপেরাণীটা জীয়ে আছে বাপ, আমার জন্যে তো কিছুই করলে না ? ঐ ভেড়ীটা দাও না বাপ উদ্ধার করে ? তোমার দুধ-মা হয়ে ত্যানা পরে গোবর কুড়োই…মানুষ কত ঠাট্টা করে, আমি বলি আমার পানকেষ্টর গৈরবে আমার গৈরব।'

বি ডি ও-র চোখে প্রচ্ছন্ন কৌতুক। প্রাণকেষ্ট অত্যন্ত হতভম্ব এবং অপ্রস্তুত। আমোদী ভাবল প্রাণকেষ্ট তার কথা বোঝেনি। সে বলল, 'ও ভেড়ী যে আমাদের পিত্তিকেলে সামগ্রী বাবা। নিবড়েব ওদের ট্যাকার গরম আছে বাম্নিা বলে, তাই বলে তুমি অন্যাই কত্তে পার ? আমি যে তোর যশোমতী মা, অ বাপ পানকেষ্ট ?'

কিন্তু তার প্রাণকেষ্ট বিরাট একটি হাঁ করল ও এমন একটি গর্জন করল যে আমোদীর মাথা ঘুরে গেল। প্রাণকেষ্ট তাকে অনেক কিছু বলতে লাগল। রাগের মাথায় দেশের ভাষাতেই কথাগুলো বলল, কিন্তু আমোদী তার কিছুই বুঝতে পারল না। তাদের ভেড়ী তাদের দিলে সবাই বলবে প্রাণকৃষ্ণ স্বজনকে তুষছে? দেশসুদ্ধ লোক জানে চাষের জন্যে জল দরকার আর আমোদী সে কথা জানে না? প্রাণকৃষ্ণ আমোদীর দুধ খেয়েছে বটে কিন্তু তা বলে সে কুপুত্র হতে পারবে না। সে কি প্রহ্লাদ না কি, যে স্বার্থপরের মত শুধু নিজের কথা ভাববে? আমোদীর শুধু মনে হল, বাপরে, তার বুকের দুধে এত শক্তিও ছিল?

একা তো সে আসেনি, সঙ্গে প্রসাদী এসেছিল। এখন লজ্জায়, ভয়ে, অপমানে কাঁপতে কাঁপতে আমোদী নেমে এল।

প্রসাদী বলল, বেশ গলা তুলেই বলল, 'আর চেঁচিওনি বাবু, মা-কে আমার নে' যাচ্ছি। বাপ-রে তোমার গলা! মায়ের দুধে শক্তি ছিল বটে। যে শক্তিটুকু ছিল সব তোমারেই কি দিইছিল? তাই ভাবি।'

প্রসাদীর কথা শুনে প্রাণকৃষ্ণ কি বলল, তা আর শোনবার জন্যে দাঁড়াল না ওরা। কেননা এখন মঞ্চেও বেশ হই-চই, কে যেন ঝপ করে মাইকের মুখে রেকর্ড খুলে দিল একটা।

মা আর মেয়ে বাড়ি ফিরতে লাগল। দুজনের মুখেই কথা নেই, প্রসাদীর বরং বুকটা কেমন করছে। মা-কে অমন অসহায় দেখে তার ভাল লাগেনি। মা কেন গিয়েছিল তা-ও সে বোঝে না।

আমোদী একেবারে চুপ। একটি কথাও নেই। শুধু বাড়ির কাছাকাছি এসে সে বলল, 'তোর খুড়ীর খুব জ্ঞান আছে, জানলি পেসাদী? শাক তুলতে যেয়ে আমায় নিয্যস কথা বলেছিল।'

'কি বলেছিল?'

'যেতে মানা করেছিল। আমি কেন মরতে গেনু বল্ দি'নি? যশোমতী তো মথুরায় যায়নি? আমি কেনে বা শাস্তর ভুলে যেতে গেনু? যশোমতী যায়নি মানে বুঝলি না? যেতে নেই, যেতে নেই, গেলে এই দশাই হয়। সেই জন্যেই যায়নি।'

এতক্ষণে চোখের জলে আমোদীর বুকের কাপড় ভেসে গেল।

১৩৭৩

ভাদ্রমাসে রান্নাপূজার দিন এসেছে, এ সময়ে গৃহস্থমাত্রেই মনসাগাছ খোঁজে। রূপসী বাগদিনীর ছেলে চিনিবাস মনসাগাছ খুঁজতে গেল। মনসাগাছ নিয়ে পূর্বস্থলীর গৃহস্থরা উঠোনে পোঁতে। মনসা বাস্তু। মনসা ক্ষেতে ধান, গাইয়ের পালানে দুধ, পুকুরে মাছ, গৃহস্থ বউয়ের কোলে ছেলে দেন। কিন্তু ঘরে ঘরে মনসাগাছ থাকে না। রান্নাপূজার পরদিন অরন্ধন।

'মা, রান্নাপূজা করবি না?' চিনিবাস জিগ্যেস করেছিল।

'না বাপ, এবার আমাদের রান্নাপূজা নেই।'

'কেন মা?'

'ই সনে তোর কাটোয়ার জ্যেঠা মরেছে না?'

'তোকে বললে কে?'

'আমি জানি।'

চিনিবাস অবাক হয়ে ভাবল, এ কেমন কথা হল? গতবছর তো রান্নাপূজার দিন মা পিদীম জ্বেলে বসে কত কি রেঁধেছিল। শোল মাছের টক, নারকেল দিয়ে কচুশাকের ঘণ্ট, তিতোপুঁটি ভাজা, সরলপুঁটির ঝাল, ময়ামাছ আর বেগুনের ঝোল, চালবাটা দিয়ে ঢেঁকিশাক, পিটুলী দিয়ে পাট পাতার বড়া আর তালবড়া। পরদিন দু'বেলা ধরে চিনিবাস তাই খেয়েছিল।

এ-বছর বড় কষ্ট, এদিকে গঙ্গায় বান ওদিকে খোড়ে নদী টুবুটুবু। চিনিবাস শুনেছে অঞ্জনা নদীতে তিনখানা বাঁশ ওপর ওপর রাখলে ডুবে যায় এমনই ভাসা-ভাসি। সবাই বলাবলি করছে বান আসবে। বান কেমন জিনিস তা চিনিবাস দেখেনি। চিনিবাসের মা যখন ছোট ছিল তখন না কি কাটোয়ার গঙ্গাতে বান এসেছিল।

চিনিবাসের মা নারকেলপাতা চেঁছে কাঠি বের করছিল। অন্তত দশটি নতুন ঝাঁটা বেঁধে দিতে হবে, নইলে আচার্যবাড়ির কাজ চলবে না।

'মা বান কেমন করে আসে গো?' চিনিবাসের কথা শুনে রূপসী বড় বিরক্ত হল। বলল, 'দেখিস এখন।'

রূপসীর মা গাবগাছের আঠা দিয়ে বাঁশের মাছধরা পলো পালিশ করছিল, সে বলল, 'দেখবি রে দেখবি, বান হবে, মড়ি হবে, মানুষ নিয়ে শেয়াল-শকুন

ছিঁড়ে খাবে।'

'উ কি কথা মা?' রূপসী মৃদু ধমক দিলে।

'নেয্য কথা লো নেয্য কথা! পিঁপড়ে পতঙ্গ ভেসে যাবে, হাতী-ঘোড়া জীয়ে থাকবে, এ হল শাস্তরের কথা।'

'তবে যে সবাই বলতেছে ই বানে কেউ মরবে না?' চিনিবাস আবার জিগ্যেস করল।

'ও গোরাপ্রেমের বানের কথা? উ আমি জানি না বাবু! আমি তো শুনলাম শান্তিপুর-কাটোয়ার জনমনিষ্যের আর আন কথা মুখে নাই। শুনে আমি হেসে বাঁচি না। হাটে যেতে দেখি সবাই এক কথা বলে। আমি যাকে শুধাই কথাটি কি গো? সেই বলে, আ লো বাগ্দীবউ, কি যে কথা সে তো আমরা বুঝি না। শুধু শুনি গৌরাঙ সন্ন্যাসী নাকি উঁচুকে নিচু আর নিচুকে উঁচু করবে বলে লেচে বেড়াচ্চে। শুনে তো আমি শুধাই, হাঁ গো, তবে কি আমরা ঠাকুরদের পুকুরে জল সরব, উনাদের মত পালঙে শোব, খইমুড়ি যা মন হয় তাই খাব?? তা যদি না হয় তবে আমি গোরাপ্রেমের বানে ভাসব কেন? আমায় সবে খুব মুখ নাড়লে, আমি বকনা বাছুরটা খুঁজে নিয়ে চলে এলাম। ই আবার কোন বান বাবা?'

'মা!' রূপসী গলা তুলল।

'আ লো দেখিস! অঙ্গ যে রসে গেল।'

'তুই তো মা গৌরাঙ্গ দেখিসনি?'

'দেখতে যাব কেন লো? গৌরাঙ কি আমায় রাজা করবে?'

'তবে যা মাছ ধরগা যা!'

'আ লো, রূপের গোমর করিস না। মাছ ধরা আজ মন্দ কাজ হল। এই মাছ ধরে ধরে তোকে এত বড়টা করেছিলাম।'

চিনিবাস দেখল বাতাস বেগতিক। সে মনসাগাছ নেবে কি না জানবার জন্যে বাতাসের আগে আচার্যবাড়ি গেল।

পূর্বস্থলীর আচার্য পরিবার বড় ধার্মিক সচ্ছল গৃহস্থ। এই ১৪৩৫ শকাব্দে কম গৃহস্থেরই ক্ষমতা আছে যে, নিত্য কাঙালী ভোজন করায়। কিন্তু বড় আচার্যের উঠোনে বেলা দুপুর পর্যন্ত এখনো একশতটি পাতা পড়ে। নবদ্বীপের গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসীর সংবাদ এখন বাতাসের আগে ধায়। এখন তিনি গৌড় থেকে শান্তিপুরে গিয়ে মাতৃদর্শন করে আবার নীলাচলে চলেছেন। বড় আচার্যের ইচ্ছা যে এ পথ দিয়ে নিমাই গেলে তাঁর বাড়িতে দুটি দিন রাখবেন।

'আ গো কেন?' তাঁর আচার্যানী জানতে চেয়েছিলেন। বড় আচার্য তো

সিরস্তদার, পোতদার, ধনীমানী মানুষ দেখলে তবে সম্মান করেন। যুবক সন্ন্যাসীকে এ সম্মান কেন?

'কেন! কেন কি গো? আমি দশজনকে ভাত দিই কেন?'

'পুণ্য কর।'

'পুণ্য কর! একে বলে স্ত্রী-বুদ্ধি। দশজনকে ভাত দেও, কাপড় দেও মানুষ তোমায় মাথায় করে রাখবে।'

'গৌরাঙ্গকে সম্মান করো কেন?'

'ও গো, গৌরাঙ এখন নতুন নতুন গো! মানুষ এখন গৌরাঙের নামে সত্বর মজে। যে জন গৌরাঙ ভজে তার এখন সমাজে সম্মান। শান্তিপুরের তাঁতি বেটারা অব্দি গৌরাঙ যখন নগরে গেল, তখন কাঙালীরে কাপড় বিলিয়ে নাম করল। আমি যদি করি আমার ভাল হবে।'

'আ গো আপনি তো অধিক ব্যয় করতে ডরাও। তা গৌরাঙ সন্ন্যাসী আসবে, তার চেলাচামুণ্ডা এতগুলি! ব্যয় হবে কত আমি সে কথাটি ভেবে মরি।'

'আরে স্ত্রী-বুদ্ধি! গৌরাঙ এখন কৃষ্ণনামে মেতে রয়েছে। সে মানুষ একবার আসবে, একবার নয় ব্যয় করব। তুমি বোঝ না। এতে আমার নামডাক দশদিকে যাবে।'

'তিনি না কি মানুষ ডেকে ডেকে আচণ্ডালে কোল দেয়? এ কথাটি জেনে আমি অবাক যাই গো!'

'কোল দিলে কি? কোল তো উনির সঙ্গে যাবে। উনি গেলে তবে চাঁড়াল বাগদী আবার যেমন ছিল তেমন রইবে। তোমার এত কথায় কাজ কি? যাও না, রান্নাপূজার কাজে যাও না?'

বড় আচার্যানী নিশ্বাস ফেলে বেরিয়ে এলেন। আচার্য গো বলেই খালাস। বসে বসে শত শত লোকের রান্না করেন, এখন কি তাঁর সেদিন আছে? সকলের রান্না সেরে ভাত খেতে খেতে সন্ধ্যে হয়। উনোনে রাতের ভাত-ডাল বসিয়ে দিয়ে তবে তিনি খেতে বসেন।

'কে রে?'

উঠোনের এক কোণে চিনিবাস এসে দাঁড়িয়েছে।

'আমি চিনিবাস গো!'

'কে?'

'উপসী বাগদিনীর বেটা। আপনাদের কি মনসাগাছ এনে দেব মা, শুধোলে!'

বড় আচার্যানীর সর্ব-অঙ্গ জ্বলে গেল। কি অলক্ষণ কি অপয়া তাই দেখ! এখন

ঠাকুরের ভোগ দিতে যাবেন এখনি বাগদীদের ছেলেটা মুখ দেখাল?

'এই এত বড় গাছ গো!'

চিনিবাস হাত দুটি তুলে দেখাল। রান্নাঘরের দোর দিয়ে গরম ভাতের গন্ধ আসছে। বামুন-মা ডালের হাঁড়িতে কতখানি করেই না ঘি ঢালে। দুধ দিয়ে সাদা ধপধপে লাউয়ের শুক্তো রাঁধে আর মুলো-বড়ি-নারকেলের ঘণ্ট। সব ঘি-চপচপে, সুগন্ধার সুবাসে ম-ম। কতদিন চিনিবাস গরম ভাত খায়নি। কতদিন বামুন-বাড়িতেও খায়নি।

'সে পরে বলব'খন, এখন বাড়ি যা।'

'বামুন-মা, রান্নাপুজো কবে গো?'

'সোমবার।'

'কচুশাক এনে দেব?'

'না বাপু তুই যা!'

এই ছেলে বামুন-মা বললে আচার্যানীর অঙ্গ জ্বলে। রূপসী বাগদিনীর মত গরীব এ পূর্বস্থলীতে কেউ নেই। খেতে পায় না, মাথার চুল জট বাঁধা, তবু রূপ মরে না ওর। ছেলেটাও চাঁদপানা। আচার্যানী ছেলে-ছেলে করে এত বার ব্রত পুজো করে কালোজিরের মত কয়েকটি মেয়ে পেলেন বলেই না ছোট আচার্যানীকে আনলেন কর্তা!

'যেন চোখ দিয়ে গিলে খায়।'

আচার্যানী চোখ সরু করে দেখলেন চিনিবাস কোথায় দাঁড়িয়ে। উঠোনের কোণে ঐ আতাগাছটি হল লক্ষ্মণের গণ্ডী। বাগদী বল, জেলে বল, গেরস্ত সংসারে সকলেরই দরকার, তা, সবাই ঐ আতাগাছের ওপারে এসে কথা কয়ে কয়ে চলে যায়। চিনিবাস বুড়ো-আঙুলে ভর করে উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে কি যেন দেখতে চেষ্টা করছে।

ছোট আচার্যানী ছেলে কোলে করে দাওয়ায় এসে দাঁড়িয়ে আবার টুপ করে ঘরে ঢুকে গেলেন। ছেলেটি বড় ভোগে। চিনিবাসের নজর লাগলে হয়তো আবার ভুগবে।

'ওরে এক পাই মুড়ি দেন গো!' ছোট আচার্যানী ঘর থেকে ডেকে বললেন। মুড়ি নিয়ে খুশি হয়ে চলে যা বাবা, আমার ছেলেটার দিকে তাকাস না। চিনিবাসের চোখ দুটো যেন সর্বদা খাই-খাই। এত খিদে ওর কোত্থেকে আসে কে জানে!

'নে, মুড়ি নিয়ে চলে যা।'

চিনিবাসের যে কি ভূত চাপল মাথায় কে জানে! ও হঠাৎ বড় আচার্যানীকে জিগ্যেস করে বসল, 'হ্যাঁ গো বামুন-মা, সোনার গৌরাঙ্গ এলে আমরা না কি সকলের সঙ্গে এক দাওয়ায় বসে পেসাদ পাব?'

'কি বললি?'

বড় আচার্যানী এখন গলা তুলে চেঁচাতে শুরু করলেন। চেঁচামেচির মধ্যে অনেকখানিই হল স্বামীর বিরুদ্ধে আক্ষেপ।

'আ গো, তিনি চাঁড়াল-বাগদী নিয়ে নাচতেছে, নাচুক গা! মনিষ্যি না দেবতা না তিনি কি বস্তু তা কি আমরা জানি? তিনি বান আনতেছে, বানের সঙ্গে ভেসে চলে যাবে গো! আমাদের এই গাঁয়ে জন্ম কাটাতে হবে। আমরা কেন নাচতে যাই?'

রূপসী বাগদীর বিরুদ্ধেও অনেক বিষোদ্গার ছিল। মেয়েটা মন্দ। ওর ছেলেটা মন্দ, গ্রামের কলঙ্ক একটা।

ছোট আচার্যানী তাড়াতাড়ি এক ঘটি জল আর একখণ্ড মিশ্রী এনে দাঁড়িয়ে রইলেন। কারণে অকারণে বড় আচার্যানী এইভাবেই চেঁচান। চেঁচাতে চেঁচাতে ওঁর মুখে থুথু উঠে যায়। তখন একখণ্ড মিশ্রী আর একঘটি জল খেলে উনি শান্ত হন।

চিনিবাস তো কোঁচড়ে মুড়ি কটা নিয়ে দৌড় দিল। ছুটতে ছুটতে শেষ অব্দি খালের ধারে পৌঁছে গেল। খালে জল টুবুটুবু। এত জলে মাছ ধরা যায় না। কিন্তু গেঁড়ি-গুগলি বিস্তর। চিনিবাসের দিদিমার বুঝি নারকেল পাতা চাঁছা হয়ে গিয়েছে তাই গুগলি তুলতে এসেছে। বুড়ি বসে থাকতে জানে না।

'গুগলি তুলে কি হবে আয়ী?'

চিনিবাস আশায়-আশায় জিগ্যেস করল। কবিরাজ মশায়ের শ্বশুরের চোখে ছানি পড়ছে। গুগলির ঝোল খেলে চোখ ভাল থাকে বলে কবিরাজ-গিন্নী মাঝে মাঝে বাবার জন্যে গুগলি রাখেন। কখনো চারটি চাল দেন, অথবা একটা কুমড়ো। দিদিমা নাতির কথা শুনে বললে, 'এমনি রে এমনি! কেউ নিলে তো নিলে। নইলে গুগলির শাঁস আর কচুশাক দিয়ে ঘণ্ট রাঁধব। তোকে মুড়ি কে দিলে? আচাজ্জি বউ?'

'হ্যাঁ।' চিনিবাস তাড়াতাড়ি মুড়ি গালে ফেলতে ব্যস্ত।

রূপসীর মা, চিনিবাসের দিদিমা এখন কার উদ্দেশ্যে যেন মুখ বাঁকা করে গাল দিল। বলল, 'তখন তো কত কথা, হ্যানো দেব, ত্যানো দেব, ধান দেব, কাপড় দেব, সব্বস্ব তার নেব, এখন কি সব ভুলে গেল?'

'কে, আয়ী ?'

'তোর শত্তুর, তোর মায়ের শত্তুর ?'

চিনিবাস দিদিমার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে গুগলি তুলল, যতক্ষণ না হাত-পা, জলে ভিজে ভিজে অসাড় হয়। তারপর, বাড়ি ফিরতে ফিরতে চিনিবাস বলল, 'এ বন্যে নয়, সেই বানের কথা বল আয়ী !'

'পেলয় বান !' বুড়ি তখনি মাথা নাড়লে।

'কি রকম ?'

'তোর মা তখন সোমত্ত মেয়ে। রূপে রঙ্গ ভেসে যায়। সকালবেলা থেকেই গুঁড়ো-গুঁড়ো বিষ্টি, যেন বাতাসে তুঁষ উড়তেছে। আর বাতাসের কি ডাক মা !'

'তা বাদে ?'

'বান আসতে আমরা সব যেয়ে বড় আচাজ্জির দালানে উঠলাম। কতজন গাছে চেপে রইল, কতজনা ভেসে গেল। মানুষ পোকামাকড়ের মত মরে দেখে বামুনরা সকলকে দালানে-উঠোনে ঠাঁই দিলে।'

'তা বাদে ?'

গল্পের এই জায়গাটি চিনিবাসের বড় প্রিয়। বারবার ও এই গল্পটা শুনতে পারে শুধু এই কথাগুলো শুনবে বলে। রূপকথার চেয়েও আশ্চর্য সব কথা। বানের সময়ে মানুষরা সব দেবতা হয়ে গিয়েছিল নিশ্চয়, নইলে এমন কাণ্ড করবে কেন ?

'অন্ন বিনা প্রাণী মরে যায় দেখে, বামুনরা ধামা ধামা চিড়ে-মুড়ি-বাতাসা দিয়ে সব প্রাণ বাঁচালে মা ! যারা রাঁধতে জায়গা পেলে তাদের চাল-ডাল দিলে।'

'আমার মা-কে ?'

'আভাকাপড় দিলে বামুনরা। পরনের কাপড় ত্যানা হয়ে যেয়েছিল।'

'তা বাদে ?"

'নতুন গোলঘরে (গোয়ালঘরে) মোদের ঠাঁই দিলে।'

'তা বাদে ?'

মাচা থেকে শুকনো কাঠ, চাল-ডাল-তেল-নুনের সিধে, আনাজপাতি, মাছ। জল নেমে গেলে, যে-যার ঘরে গেল কিন্তু রূপসী আর তার মা-র জন্যে বড় আচার্যের কি ভাবনা, কি ভাবনা ! ওদের মত দুঃখী কে আছে ? কে এমন গাঁয়ের একটেরেয় থাকে ? কতদিন ধরে ওদের আগলে রাখলেন, তারপর নিজের মাহিন্দারের সঙ্গে রূপসীর বিয়ে দিলেন, বিয়ের পর বছর না পুরতে চিনিবাস হল। কিন্তু রূপসীর বরটা জ্বরে ভুগে মরে গেল।

'ও আয়ী, তা বাদে ?'

'তুই হতেও দয়া ছিল, মন ছিল। এখন যামন মুড়ি দিয়ে বিদেয় করে দেয় ত্যামন নিমায়া ছিল না।'

চিনিবাসের দিদিমা মাথা নেড়ে আরো কি বলতে গিয়ে চুপ করে গেল। আর তখনি ওরা ঢাকের বোল শুনতে পেল। ঢোলমোহর দিয়ে বড় আচার্য সকলকে যেতে বলছেন ওঁর বাড়িতে। কীর্তন, ঠাকুর সেবা, প্রসাদ বিতরণ, আর গৌরাঙ্গ দর্শন হবে। সবাই যাবে। দিবাকর চক্রবর্তীর মত বামুন, চিনিবাসের মত বাগদী, সবাই।

বাবা গো! সত্যিই বামুনরা সবাইকে ডাকছে, সবাইকে খেতে দেবে? চিনি-বাসের দিদিমা কিছু বুঝে কিছু না-বুঝে ঘন ঘন মাথা নাড়তে লাগল। এ বান-ও যে সেই গঙ্গার বানের মত মনে হচ্ছে? সবাই এক জায়গায় দাঁড়াবে বসবে, এক-সঙ্গে চিড়েমুড়ি ভাগ করে খাবে?

'চিড়েমুড়ি না রে আয়ী! ভাত হবে, পরমান্ন, ঘি সম্বরা ডাল, আর নারকেল ছাঁচিকুমড়োর বেন্নুন! গয়লাবউ খাসা দই পেতেছে, জানলি?'

'যা মা-কে যেয়ে বল্ গা, কাপড়-চোপড় যেন ক্ষারে সেদ্ধ করে। এট্টু তেল আনতে পারিস? মাথাটা যেন সন্নেসীর জটা গা! এমন মাথা নিয়ে যাব কেমন করে?'

চিনিবাস যেন হাওয়ার আগে উড়ে মা-কে খবর দিতে চলে গেল। রূপসী বার বার হাত যোড় করে কপালে ঠেকালে। এ কি একটা সোজা কথা? ওঃ, তিনি যদি তার চিনিবাসকে মাথায় হাত দেন, আশীর্বাদ করেন। তা হলে তো সবাই জানবে চিনিবাসও মানুষ; রূপসীও মানুষ। আরেকজন আছেন এ গাঁয়ে, অহঙ্কারে মাথা উঁচু করে বেড়ান। রূপসীর খুব ইচ্ছে করে গৌরাঙ্গকে জিগ্যেস করে, কাউকে দিয়ে জিগ্যেস করায়, একটি অহঙ্কারী পুরুষের এক সন্তান বাগদী বলে চিরদিন গরীব হয়ে থাকবে, ঘরের ছেলেটির শত ভাগের এক ভাগও পাবে না, এ কেমন বিচার?

রূপসীর মনে হতে লাগল যেন গৌরাঙ্গ এসে গেছেন, যেন চিনিবাসকে বুকে টেনে নিয়েছেন। যেন যত দুঃখ, যত কষ্ট, সব ঘুচে গেছে রূপসীর।

কিন্তু গৌরাঙ্গ এলেন না।

শান্তিপুর-কাটোয়া হয়েই কুমারহট্টের পথ ধরতে হল। সন্ন্যাস নেবার ক'বছরের মধ্যে মানুষ যেন তাঁকে ঘিরে মৌমাছির মত জমতে থাকে। মানুষের মাথায়-মাথায় থই-থই। সবাই দেখতে চায়, সবাই একবার পা ছুঁতে চায়। কানা বল্লে

আমায় ছুঁয়ে দাও, দিষ্টি হোক। খোঁড়া বলে পা-খানা ফিরে দাও ঠাকুর। কোলমরুনী ছেলে নিয়ে এসে পায়ে রাখতে চায়, ছেলে হয়ে বাঁচে না কেন তাই বলে দাও।

এমনি হাজার মানুষের হাজার বায়না। মানুষ শুধু আসতেই থাকল, আসতেই থাকল। অনেক ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও এ যাত্রায় উনি চিনিবাসের গ্রামের কাছাকাছিও আসতে পারলেন না।

মানুষরা আচার্যবাড়ির সামনে কতক্ষণ বসে রইল। শুধু তো গৌরাঙ্গদর্শন নয়। পেটের জ্বালা বড় জ্বালা। পেট ভরে খাবে বলে মা-ছেলে, বুড়োবুড়ি, কানা-খোঁড়া, অনাথ-আতুর সবাই এসে বসে রইল। আর তেমনি কি গুঁড়ি-গুঁড়ি বিষ্টি! আকাশকে কে যেন মাথার দিব্যি দিয়ে বলেছে 'জল ঢালো বাপু, তুমি মোটেই থেম না।'

ওই বিষ্টিতেই বান হয়, একটানা প্রহরের পর প্রহর ভিজতে ভিজতে কে যেন কাকে বললে। সবাই আশায় আশায় বসে রইল কোন-না-কোন সময়ে পেসাদ নিতে ডাক আসবে।

ঠিক সন্ধ্যের মুখে মুড়ি-বাতাসার ধামা নিয়ে মাহিন্দাররা মানুষের ভিড়ে নেমে এল। চিনিবাসরা কেউ উঠোনে ওঠেনি বটে, কিন্তু মাহিন্দাররা মিষ্টি গলায় বললে, 'তিনি যদি আসত, তবে তোমরা উঠোনে উঠতে বাপ সকল, আমরা ডেকে এনে বসাতাম। তা, তিনি তো আসেনি, এখন আর উঠোনে উঠে জলকাদা করে কি হবে বল?'

'তা…মুড়ি বাতাসা দিচ্ছ কেন গো? পেসাদ পাব বলেছিলে না?'

'তিনি যদি আসত, তবে পেসাদ নিশ্চয় রান্না হত। ইদিকে কীত্তন হত, হতে হতে পেসাদ রান্না হত। তোমরা সবাই পেসাদ পেতে। যোগাড় ছিল, সরঞ্জাম ছিল, সবই ছিল গো! তা তিনি যখন এল না, তখন আর পেসাদ কেমন করে হয় বল?'

'কিন্তুক, আমরা খাব বলে আশা করে এসিছি গো!'

'এই দেখ! এয়েছিলে তো সন্ন্যেসী দেখতে, খেতে এয়েছিলে?'

'হ্যা গো।'

'নাও, তোমাদের সঙ্গে আমি বকতে পারিনি বাবু। ঠাকুর দর্শনের চেয়ে খাওয়াটা বড় হল? ঐ জন্যে তোমাদের দুস্কু ঘোচে না, জানলে বাছা? নাও, মুড়ি-বাতাসা নাও দিকি।'

কি রাঙা রাঙা মুড়ি, বড় বড় বাতাসা, কিন্তু চিনিবাসের চোখ ফেটে জল

আসতে চাইল। ও তো জানে, সকাল থেকে থোড়, মোচা, লাউ, শাক, দুধ, দই কত কি ভারে ভারে এসেছে। ভগবান জানেন কার জন্যে। এখন হঠাৎ চিনিবাসের ওর মা রূপসীর উপর রাগ হল।

'কেন এবার রান্নাপূজা করলি না রাক্কুসী? কেন, আমার পেট ভরে ভাত খেতে সাধ যায় না?'

মা-কে মেরে ধরে শেষ করে মুড়ি-বাতাসা ফেলে দিয়ে চিনিবাস পালিয়ে গেল।

অনেক, অনেকক্ষণ সময় গেল। সন্ধ্যের সময় চারিদিকে জোনাকি ফুটছে, ঘন অন্ধকার নেমে আসছে, চিনিবাসের দিদিমা চিনিবাসকে খুঁজে পেল মাঠের ধারে। জলে-ডোবা তালগাছটার ডগায় ও চুপ করে বসেছিল। কেঁদেকেটে অবসন্ন, ঘুম পাচ্ছে, ভূতের ভয়ও করছে।

'আয়ী আমার হাত ধর।'

দুজনে জল ছপছপ করতে করতে বাড়ির দিকে যেতে লাগল। যেতে যেতে চিনিবাস বলল, 'গৌরাঙের বানের চে' সে বান ভাল রে আয়ী! তেমন বান আর আসে না? সেই যে, যেমন বানে চিড়ে-মুড়ি-চাল দেয় এত? দুঃখু ঘুচে যায়?'

লোকটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কুড়মুড় করে কাচের গেলাস খাচ্ছিল। চারদিকে যত লোক, সকলেই নানারঙের গেলাস থেকে নানারকম জিনিস খাচ্ছিল, কিন্তু লোকটা শুধু কাচের গেলাসই খাচ্ছিল।

'এই যে, তুমি কাচের গেলাস খাচ্ছ কেন?' শাদা ভালুকের মত মোটা আর আহ্লাদে চেহারার সুশোভন রায় জিগ্যেস করলেন।

'কেন খাচ্ছ বল তো? আমার এই বান্ধবীটি জানতে চাইছেন।' মাদুরার দেবমন্দিরের বিখ্যাত বেনারসীপরা মেমসায়েবটির গালে টোকা দিলেন সুশোভন রায়। পার্টিতে এলেই সুশোভন রায় টোকা দেন মেয়েদের গালে।

'ইয়েস, হোয়াই?' বেগুনী শাড়ির জরির আঁচল জ্বলে উঠল। মেমসায়েবের কানের হীরে দুলো আসল। কাচ খেতে খেতে লোকটা বুঝতে পারল। আহা, আজ না হয় সে কাচ খাচ্ছে, কিন্তু হীরে তো সে এক সময়ে দেখেছে। ঠাকুর্দার আংটি-টাতেই একটা কমলহীরে ছিল।

'আজ্ঞে, আমাকে কাচ খাবার জন্যেই এখানে আনা হয়েছে। মানে ভাড়া করা হয়েছে।'

'এই, মিথ্যে কথা বলে না!' সুশোভন রায় আঙুল তুলে শাসালেন।

'সত্যি কথা স্যার।'

'আবার?'

'বিশ্বাস না করেন অনাদিবাবুকে জিগ্যেস করুন।'

অনাদি চিন্তামণি দেশাইয়ের সেক্রেটারী হিসেবে ঢুকেছিল, কিন্তু বর্তমানে তার একমাত্র কাজ হচ্ছে চিন্তামণি দেশাইকে আনন্দে রাখা। এখন আর আনন্দ হয় না চিন্তামণি দেশাইয়ের, আর ডাক্তাররা বলেছেন মন প্রফুল্ল রাখা ওষুধের চেয়েও দরকারী। অনাদির চেহারা কার্তিকের মত, পরনে ধোপদোস্ত ধুতি-পাঞ্জাবি।

'হ্যাঁ স্যার,' অনাদি বললে, 'আমার মনিবের পার্টিতে একেকটা, যাকে বলে এনটারটেইনমেন্ট, তা চাই-ই চাই। একটা লোককে গত বছর এনেছিলাম, সে জ্যান্ত গোখরো সাপ ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেত।'

'সাপ খেত?'

'হ্যাঁ স্যার। এখানে দাঁড়িয়ে একটা জ্যান্ত তাজা গোখরো সাপ ছিঁড়ে খেয়ে

ফেলেছিল। স্যার খুব খুশী হয়েছিলেন। এ বাড়িতে স্যার, আমি একবার ছোরা ছোঁড়ার খেলা এনেছি, একবার তো একটা সার্কাসের মেয়ে বাঘের খাঁচায় ঢুকে নেচেছিল।'

'এবার কি আর কিছু পেলে না? এই মর্কটের মত লোকটাকে ধরে এনেছ?'

'উনি বড় বংশের ছেলে স্যার। আগেও নার নিজেরই একটা জিমনাশিয়ামের আখড়া ছিল। উনি সেখানে কাচের গেলাস চিবিয়ে খেতেন। ওনার পিতামহের নামে কলকাতায় একটা রাস্তা অব্দি আছে।'

রাস্তা নয়, সরু গলি। ঠাকুর্দার তৈরী বাড়িটাও আছে। যদিও সেখানে এখন থাকে না লোকটি।

'কিন্তু কাচ খেলে ও মরে যাবে না?'

মেমসাহেবটি যেন একটু ভয় পেয়ে জিগ্যেস করল।

কথা বলতে বলতে সবাই আবার বুফে টেবিলের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। সাদা চাদর ঢাকা টেবিলে বড় বড় রূপোর বাসনে উঁচু করে রাখা বাদামী মাছভাজা, মুরগীর পোলাও, সাদা সসে-ডোবানো কাঁকড়ার শাঁস। বরফের কুচি মেশানো কালো আঙুর, আইসক্রীম, জমাট লালচে ক্ষীরে টুকটুকে লাল ল্যাংড়া আমের টুকরো। তা ছাড়া বিরাট একটি রূপোর ময়ূরপঙ্খী নৌকোয় ফ্রুট-ককটেইল। সোনালী সিরাপে লালচেরী, আমের কুচি, হলুদ রঙের আনারস, সিঁদুর-লাল পীচ, এপ্রিকট, স্ট্রবেরী এমন কি আঞ্জীরও দেখা গেল। এত খাবার এক সঙ্গে লোকটা অনেকদিন দেখেনি।

'মরবে কেন, এটাই তো ওর পেশা।'

'কিন্তু কেন? বিপদ হতে কতক্ষণ?'

লোকটা বুঝতে পারল, মেমসাহেবটি, ভাল জিনিস খেলে যা হয়, এখন বিশ্ব-সংসারকে মমতা করতে শুরু করেছে। আহা, আজ না হয় ভাগাড়ের গরুর অবস্থা, কিন্তু দিন যখন ছিল তখন তো লোকটা ভালমন্দ জিনিস খেয়েছে। অবিশ্যি নেশা করে সম্পত্তি উড়িয়ে দেয়নি, ভাগ্যে শনি থাকলে যা হয়, অমন সোনায় বাঁধানো মেশিনারী-লোহা-লক্কড়ের ব্যবসা জলে চলে যায়।

এখন আর মদ খায় না লোকটা। মদের গেলাস খায়। বউ হাতে-পায়ে ধরে দিব্যি দিয়েছে, তাই মদ খায় না। কিন্তু গেলাস খাবার নেমন্তন্নও তো অবুরে-সবুরে আসে আজকাল।

'খাবার ব্যাপারটা যাকে বলে চেনে বাঁধা, বুঝলেন ম্যাডাম?'

লোকটার ইংরেজি উচ্চারণ সুশোভন রায়ের চেয়ে অনেক ভাল। মেমসায়েব

হাতে এতবড় একটা আপেল তুলে নিয়েছিল। সেদিকে চেয়ে চেয়ে লোকটা বললে, 'আপনারা যদি ভালমন্দ খেতে পান তাহলেই আমি গেলাস খেতে পাব। আমি যদি গেলাস খেতে পাই তাহলে আমার বউ ছেলেমেয়ে দুটো খেতে পাবে।'

'দিনের পরে রাত্তির, রাতের পর আরেকটা দিন।' সুশোভন রায় হঠাৎ অনাদির কানের কাছে গিয়ে বললেন। যেন একটা দরকারী খবর দিলেন। তারপরই অনাদির পেটে খোঁচা দিয়ে বললেন, 'চল না গো! বাগানে গিয়ে একটু চোর-চোর খেলি! আমি লুকোই, তুমি ধর, খেলবে?' ধপাস করে উনি মেঝেতেই বসে পড়লেন।

'আঃ!' মেমসায়েব ওঁকে একটা ধমক দিল। তারপর হীরেমুক্তোআপেল সবসুদ্ধ লোকটার কাছে ঘন হয়ে এসে বললে, 'তুমি মরে যাবে জান?'

লোকটা মুখ ফিরিয়ে নিল। তারপর অনাদিকে জিগ্যেস করলে, 'আমি এবার যাব?'

'যান।'

কাচের গেলাস খাবার পর লোকটা একটু বিশ্রাম করে। আগে করত না, আজকাল করে। বউ পকেটে কালীঘাটের নির্মাল্য গুঁজে দিতে দিতে ফিসফিস করে বলে, 'একটু জিরিয়ে নিও।'

'নেব।' মাখন-মিছরীর তালটা পকেটে পুরে নিতে নিতে লোকটা জবাব দেয়। মাখন-মিছরী একটু খেয়ে নিতে বলত মল্লিক, বলত ওতে না কি গলার ভেতরটা মোলায়েম থাকে। থাকে কি না থাকে কে জানে, তবে বাইরে ডাক পড়লে লোকটা একডেলা শাদা মাখন আর একটু মিছরী খায়।

এখন মাখন-মিছরী গালে ফেলে জল খেয়ে লোকটা ঝিম মেরে বসে রইল পাশের ঘরে। হলঘরের টেবিলটা এখান থেকেও দেখা যাচ্ছে। খাবার যেন আর ফুরোতেই চায় না, আসছে তো আসছেই। এবার সন্দেশ নিয়ে এল বেয়ারা। চিন্তামণি দেশাই এক সময় গোগ্রাসে সন্দেশ খেতেন।

যারা চিনি খায়, তাদের চিন্তামণি আজও যোগান দিতে চেষ্টা করেন, চিনির হোলসেল কারবার আছে তাঁর। কিন্তু চিনি খাওয়া একদম বারণ এখন। নিজে খেতে পারেন না বলেই অপরকে খাইয়ে বোধহয় এত আনন্দ পান।

শাদা সন্দেশ, লাল আপেল, বাদামী মাছভাজা, লোকটা এ ঘর থেকে বসে বসে দেখতে লাগল। এই পার্টি ভাঙবে, তারপর অনাদি ওকে টাকা দেবে। টাকা নিয়ে বাড়ি ফিরতে ফিরতে অনেক রাত।

মেমসায়েবটি এদিক-ওদিক চেয়ে লোকটাকে দেখতে পেল না। 'রিয়্যালি!'

বলে আপেলটাকে মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মাদুরা-মন্দির শাড়ির জ্বলন্ত আঁচল লুটিয়ে মেমসায়েব ওর স্বামীর পাশে গিয়ে দাঁড়াল। স্বামীর হাতের নড়া ঝাঁকিয়ে বলল, 'জানো, এ-জন্যেই আমি ভারতে আসতে চাইনি? কি হত বাপু ক্যানাডায় থাকলে? জানো, লোকটা পয়সা রোজগারের জন্যে কাচ চিবোয়।'

প্রায় কেঁদে ফেললে মেয়েটি। লোকটা দূর থেকে দেখতে পেল ওকে। আসলে মেয়েটি ছেলেমানুষ। বোধ হয় কোন বড়লোকের বউ।

চিন্তামণি দেশাই ঠিক একটা কাছিমের মত ডিভানে ডুবে বসে ছিলেন। নিচের ঠোঁটটা ঝোলা, দুটো ঘোলাটে চোখে বিরক্তি। এ কি রকম পার্টি বাবা? মোটে তো আনন্দ হল না।

অনাদি ওঁর পাশে খুব ঘুর ঘুর করছিল।

'এই অনাদি!' চিন্তামণি দেশাই ওকে ডাকলেন, 'কি করেছ কি? পার্টি জমছে না কেন? হোস্টেস আননি?'

'এনেছি স্যার, চারজন এসেছেন।'

'সবাই ভাল ঘরের মেয়ে তো?'

'নিশ্চয়,' অনাদি জিভ কেটে বললে, 'হোস্টেসরা তো খাওয়া-দাওয়া দেখবেন, অতিথিদের সঙ্গে ওঁরাও চলে যাবেন। ভাল ঘরের মেয়ে তো বটেই! দুটো পয়সার জন্যে আসেন-টাসেন...'

'তবে কি খাবার ভাল নয়?'

'সবাই তো খুব এনজয় করছে স্যার, ঐ দেখুন না! সুশোভন রায় বোধ হয় নাচবেন এখন।'

'ঐ লোকটাকে কেন যে আনলে! কাচ খাবার মধ্যে আর মজা কি আছে বল? এর চেয়ে যদি সেই মেয়েটাকে আনতে! কাঁধে আর মাথায় মোমবাতি বসিয়ে না কি ও বেলিডান্স করে?'

'নেই স্যার। বম্বে গেছে।' অনাদি একটু চেঁচিয়েই বললে, কেননা বহুক্ষণ হতভম্বের মত মেঝেতে বসে থাকবার পর সুশোভন রায় হঠাৎ লাফিয়ে উঠে পানু বোসের সঙ্গে টুইস্ট করতে লাগলেন। সবাই বেজায় খুশী। যারা যারা নাচতে জানে সবাই নাচতে শুরু করলে।

'নাচবে না কি?' মেমসায়েবের স্বামী জিগ্যেস করলে।

'জানো, তোমরা ভীষণ নিষ্ঠুর?' মেমসায়েব ঠোঁট ফুলিয়ে বললে, তারপর নাচতে শুরু করলে। স্বামী ওর কানে কানে বললে, 'সবাই তোমায় দেখে হিংসেয় নীল হয়ে যাচ্ছে, জানো? এ ঘরে যতজন এসেছে সবার চেয়ে তুমি দেখতে ভাল।

তোমার মত গয়নাও ওদের কারো নেই।'

চিন্তামণি দেশাই শুধু দেয়ালের দিকে চেয়ে কাকে যেন ধমক দিয়ে বললেন, 'আমার আনন্দ হচ্ছে না।' তারপরই অনাদিকে ডাকতে লাগলেন। দুটো বেটা-ছেলেকে ঘিরে সবাই নাচছে তাই দেখে তাঁর আনন্দ হবে? আনন্দ যদি আমাকে রাখতে না পারিস, তাহলে আমি মরে যাব আর তোরা ভেসে যাবি।

'দিন দিন গাধা হয়ে যাচ্ছ!' অনাদিকে সামনে দেখতে পেয়ে বললেন চিন্তামণি দেশাই।

'হ্যাঁ স্যার।' অনাদি ওঁর হাত ধরল। এখন উনি স্নান করবেন, একটু দুধ-খই খাবেন তারপর ওষুধ খেয়ে ঘুমোতে যাবেন।

'রাতে হলঘরটা বন্ধ করে দিও, রূপোর বাসনগুলো দেখো।'

'হ্যাঁ স্যার।'

অনাদি অভ্যেসবশতই বললে। চিন্তামণি দেশাইয়ের বহু বাজে খেয়ালের মধ্যে অন্যতম হল রাতে এই পর্বতপ্রমাণ খাবার এই ঘরেই রাখতে হয়। ঘরটি, পরিভাষা অনুযায়ী, বাতানুকূল, বেজায় ঠাণ্ডা। সমস্ত রাত আলো জলে, খাবার, মদের গেলাস, চেয়ার-টেবিল, সিগারেটের প্যাকেট, পানের দোনা গড়াগড়ি যায়। অনাদির ধারণা উনি রাতে উঠে এসে চুরি করে সন্দেশ-টন্দেশ খান।

ছোট আলোটা অনাদি জ্বালিয়েই রেখেছিল। ঘরে এয়ার-কণ্ডিশনার চলবার মৃদু ভারী শব্দ। লোকটা কোত্থেকে একটা কুশনের ওয়াড় খুলে নিয়ে তাতে ফল, সন্দেশ, কাটলেট, যা পাচ্ছিল তাই পুরছিল। চিন্তামণি দেশাইকে দেখে ওর হাত মাঝপথে থেমে গেল। চিন্তামণির চোখ-মুখ উত্তেজনায় জলজল করছে। নিচের ঠোঁটটা উনি বার দুয়েক চেটে নিলেন।

'তুমি কাচ খাচ্ছিলে না?'

লোকটা জবাব দিলে না। অনেকটা ফাঁদেপড়া খরগোশের মত এদিক থেকে ওদিক চাইলে আর চোখ নামিয়ে নিলে। বোধ হয় বুঝল যে এটি মরণফাঁদ।

'পালাবার চেষ্টা কোর না। ঘরের চারদিকে ঘণ্টা আছে। বেরুবার দরজাগুলো তালা আঁটা। আমার ছটা ডালকুত্তা আছে জানো? তাছাড়া দরোয়ান দুটো।'

চিন্তামণি কচ্ছপের মত দেখতে হলে কি হয়, দিব্যি চটপটে। তাছাড়া, চোর ধরবার উত্তেজনায় ভেতর থেকে যেন ফূর্তিও পাচ্ছেন। বেশ লাগছে তো? অনাদি তো কতরকম চেষ্টাই করে ওঁর জন্যে কিন্তু কিছুতেই এত ফূর্তি তো হয় না? একটা লোককে এনেছিল সে জিবে-গলায়-ঘাড়ে সাপের ছোবল নিত। আর সেই মেয়েটা? বাঘের খাঁচায় ঢুকে কি নাচই নেচেছিল। সিনেমা-থিয়েটার তো দেখতে যান না।

চিন্তামণি। ওসব হল বাজে আমোদ-প্রমোদ, মনটা হালকা করে দেয়। বিদেশে বেড়াতে যেতেও ভাল লাগে না ওঁর। বাংলা ছাড়া কিছুই ভাল বলতে পারেন না, একশো বছর ধরে ওঁরা কলকাতায় আছেন, বিনা স্বদেশী ভাষা পুরে কি আশা? এখন যদি বা বিদেশে যেতে একটু ইচ্ছে করে, শরীরের জন্যে সেটি হবার জো-টি নেই। চিন্তামণি দেশাইয়ের পয়সায় অনেকে আমোদ করে ঠিকই, কিন্তু উনি নিজে অত্যন্ত সাত্ত্বিক মানুষ। নিরিমিষ আহারটি—রাতে খই-দুধ—মদপান বা ধূমপান কোনটাই চলে না। এরকম লোককে আনন্দে রাখা যে কঠিন তা চিন্তামণিও ভালই বোঝেন। কিন্তু আজ লোকটাকে চুরি করতে দেখে ওঁর আনন্দ হল।

'হাতে ওটা কি? কি নিচ্ছিলে?' চিন্তামণি পোঁটলাটা দেখতে পেয়েছেন।

লোকটা পোঁটলাটা নামিয়ে রাখল। পাকানো, ক্ষয়ে যাওয়া, প্রৌঢ় চেহারা। মাথার চুলে পাক ধরেছে। এরকম চেহারার লোক কলকাতায় আর যারা আছে তারা সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ফেরবার পথে বাজার সেরে ফিরে এসেছে আর এতক্ষণে যে-যার মত ঘুমিয়ে পড়েছে। মার্কামারা ভদ্রলোকের চেহারা। একজনকে দেখলে সবাইকে চেনা যায়।

'কি নিচ্ছিলে দেখি?'

চিন্তামণি দেশাইয়ের মুখ হাঁ হয়ে গেল। কাটলেট ভেঙে সন্দেশের সঙ্গে চেপটে গিয়েছে, মাছভাজা আর আইসক্রীমে চটকাচটকি। কি অপচয়, কি নষ্ট, কিন্তু লোকটা কি বদ্ধ পাগল না কি?

'রূপোর জিনিসগুলো ফেলে তুমি খাবার নিচ্ছিলে?' চিন্তামণি দেশাই এরকম পর্বতপ্রমাণ হাঁদা মানুষ খুব কম দেখেছেন। চুরি করবার ঝুঁকিই যদি নিলি, তাহলে এমন জিনিস চুরি কর, যাতে আখেরে সুবিধে হয়। এসব কি আজকের জিনিস? এখন আর সে হ্যামিলটনও নেই, তেমন রূপোর বাসনও তৈরী হয় না।

লোকটা লজ্জায় মাথা নিচু করলে। সবটাই তো অ্যাক্সিডেণ্ট বাপু! অনাদি টাকা দিলে বটে কিন্তু তবু বসতে বলেছিল। বোধহয় নিজে দু' টাকা দালালী চায়। তা, লোকটা আবার ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম থেকে উঠে দেখে কেউ কোথাও নেই, সেইজন্যেই আর লোভ সামলাতে পারেনি। নিদারুণ বোকামি হয়ে গিয়েছে তো! এ বাড়িতে কুকুর থাকবে, লোহার গেট আর পাগলাঘণ্টি, বন্দুকবাজ দরোয়ান সে তো জানা কথা।

'আমাকে চলে যেতে দিন স্যার!' লোকটা মিনতি করে বলল। খুড়োটাকে এক ঠেলা দিলে হয়তো অজ্ঞান হয়ে যাবে কিন্তু লোকটা পালাবে কি করে?

লোকটা ভয় পেয়েছে, পালাতে চাইছে। টের পাবার সঙ্গে সঙ্গে চিন্তামণি

দেশাইয়ের শরীর থেকে ডায়াবেটিসের দুর্বলতা, হার্টের ধড়ফড়ানি সব কোথায় চলে গেল। মনে হল শিরায় শিরায় তরল আগুনের মত তাজা রক্ত। কি আনন্দ, কি আশ্চর্য আনন্দ! লোকটাকে কেমন করে ছেড়ে দেবেন চিন্তামণি দেশাই? ও তো ওঁকে আনন্দ দিয়েছে।

'ছেড়ে দেব, না পুলিসে দেব তাই ভাবছি।'

'পুলিসে!' লোকটা প্রায় কেঁদে ফেলল। 'পুলিসে দেবেন না স্যার, আমার ফ্যামিলি আছে।'

'পকেটে ওগুলো কি?'

লোকটা পকেট থেকে একটা তালগোল পাকানো সন্দেশের ডেলা বের করলে।

'সন্দেশ!'

'হ্যাঁ স্যার। কাচ খেয়ে খেয়ে গলার আর কিছু থাকে না। তাই ভেবেছিলাম হুদিন ধরে সন্দেশটা খাব।'

'ও! তুমি তো কাচ খাও।'

'হ্যাঁ।'

লোকটা আবার ফাঁদেপড়া জন্তুর মত এদিক থেকে ওদিকে, ওদিক থেকে এ-দিকে চোখটা ঘুরিয়ে আনল। ভীষণ ভয় করছে আজ, লজ্জা করছে নিজের বোকামি আর লোভের জন্যে। ছি ছি, এমন কাজ কোন ফ্যামিলিম্যান করে? এর চেয়ে রাস্তায় ফিরি করবে কাল থেকে। নয়তো লজ্জার মাথা খেয়ে ভগ্নীপতির কারখানায় কাজ নেবে। বুড়োটা কি রকম তাকিয়ে আছে দেখ, যেন বুকের ভেতরটা অব্দি দেখতে পাচ্ছে!

'ভয় পাচ্ছ কেন? তোমাকে আমি ধরিয়ে দিচ্ছি না।'

স্বস্তিতে লোকটার হাঁটু কাঁপতে শুরু করল। ধপাস করে চেয়ারে বসে পড়ল সে। চিন্তামণি দেশাই খুব চিন্তাকুল দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালেন। কিছুক্ষণের জন্যে তিনি লোকটার হর্তা-কর্তা-বিধাতা। ইচ্ছে হলে ওকে রাখতে পারেন, ধরিয়ে দিতে পারেন, কিন্তু এ-কথাটা স্বীকার করতেই হবে একা-একা চোর ধরার আনন্দে ওঁর শরীরটা ভাল লাগছে। ডাক্তার তো বলে, যা ভাল লাগে তাই করুন। চিন্তামণি দেশাই সব ভুলে গিয়ে কয়েকটা আঙুর ফেলে দিলেন মুখে। একটিও নাগপুর বা মাদ্রাজের আঙুর নয়। প্রতিটি পাহাড়ের রসে টুবটুবে, গাঢ় বেগুনী রঙের।

চিন্তামণি দেশাইয়ের মনে হল, তাঁর রক্তের চিনি আর আঙুরের রস মিলেমিশে অ্যালকোহল তৈরী হয়ে যাচ্ছে। নইলে শিরায় শিরায়, কানের পেছনে এত কোলা-হল কেন? তিনি তো মদ খাননি?

'ধরিয়ে দেব কেন? তুমি তো খেটে খাও, কাচ খেয়ে মানুষের কাছ থেকে পয়সা নাও। আচ্ছা, কাচ খেতে গলার চামড়া ছিঁড়ে যায় না? এমন কি হতে পারে যে, কাচ চিবুতে গিয়ে তুমি মরে গেলে?'

'চিবোবার নিয়ম আছে। অ্যাক্সিডেন্ট যদি না হয়, তাহলে ভুম করে মরবো কেন?'

'পাতলা কাচের গেলাস ভাল, না মোটা?'

'দাঁত ভাল থাকলে তুই-ই সমান। আমি অবিশ্যি মোটা দিশী গেলাসই পছন্দ করি। পাতলা গেলাসে ভয় বেশী।'

আর, চিন্তামণি দেশাই ভেবেছিলেন মোটা গেলাসে বিপদের সম্ভাবনা বেশী। তাই মোটা গেলাস এনেছিলেন লোকটার জন্য। একটু বিপদ হলে চিন্তামণি দেশাই-এর কেন যেন ভাল লাগে। আসলে কে সাপ ছিঁড়ে খাচ্ছে, কে সাপের ছোবল খাচ্ছে, কে বাঘের খাঁচায় ঢুকে নাচছে সেটাই তো কথা নয়। যার যা পেশা তাই করছ বাপু, যে যেটি জান, সেই বিদ্যেটি বেচে খাচ্ছ, এর মধ্যে আর কথা কি আছে!

কিন্তু যদি হিসেবে একটু গোলমাল হয়ে যায়?

সাপ খেতে খেতে গোখরো সাপের হলদে বিসে টইটম্বুর বিষ-থলিটা খেয়ে ফেলে যদি কেউ খাবি খায়?

কিংবা মেয়েটা যেদিন খাঁচায় নাচবে, সেদিন যদি বাঘটাকে আফিম দিতে ভুলে যায় কেউ? আর বাঘটা যদি নেশার অভাবে বিরক্ত হয়ে মেয়েটাকে থাবা মেরে বসে?

কোনদিন কি সে-রকম হবে না? চিন্তামণি দেশাই তো সে-কথাটাই জানতে চান। এই যে লোকটা কাচ খাবে, উনি তো আশা করেছিলেন কাচ খেতে খেতে লোকটার গলা দিয়ে গলগল করে রক্ত উঠবে। সেইজন্যেই মোটা কাচের গেলাস এনেছিলেন। এখন শুনলেন লোকটার মোটা কাচেই সুবিধে হয়।

'পাতলা কাচের গেলাসে কি বিপদ বেশী?'

'আজ্ঞে।'

চিন্তামণি দেশাইয়ের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। একটু ঝুঁকে বসে, গোপন পরামর্শ করবার ভঙ্গীতে উনি বললেন, 'অনাদি তোমায় কত টাকা দিয়েছিল বল তো?'

'পঁচিশ।'

'আমি কিন্তু ওকে পঞ্চাশ টাকা দিতে বলেছিলাম। অনাদিটা তো কম ছ্যাচোড় নয়? একটা লোক তার বিদ্যে বেচে খাবে, তাকে তুই আমার পয়সা দিবি,

সেখানেও কমিশন মারতে চাস ? না না, আমি তোমায় বাকি পঁচিশটা, না, পঁচিশ কেন, পঞ্চাশ টাকাই দিয়ে দেব।'

বুড়োটাকে যত বজ্জাত মনে হয়েছিল, তত বজ্জাত বোধহয় নয়। মাথাটাথা খারাপ আছে বলে মনে হয়। লোকটা এখন দেখতে পেল মেঝের কার্পেটের রঙটা অদ্ভুত। গাঢ় লালের ওপর কাল্‌চে-লাল জমাট বেঁধে আছে চাপচাপ। লোকটার মত, ময়দানে যারা কাচ চিবিয়ে খায়, সেইরকম কয়েক হাজার লোক যেন মন দিয়ে ঝুঁকে বসে কার্পেটটার ওপর নক্‌শামাফিক রক্তবমি করে গেছে। একেবারে রক্তের দাগ।

কিন্তু ঘড়িতে দুটো বাজতে দশ।

'ঘড়িতে দুটো বাজতে দশ।' চিন্তামণি দেশাই বললেন, 'টেবিলে কতগুলো গেলাস আছে দেখতে পাচ্ছ ?'

'আজ্ঞে।' লোকটা আবার বোকা বনছে।

'অন্তত চল্লিশটা। মদের গেলাস। এই গোলাপীগুলো হচ্ছে জাপানী কাচের গেলাস. সবুজ পাতা আঁকাগুলো বোধহয় প্যারিস থেকে আনানো। তা, আমার কথা হচ্ছে তুমি বাপু গেলাসগুলো খেতে থাকো। আমি বসে বসে দেখি। বেশী নয়. দুটো থেকে আড়াইটে অব্দি, মোটে আধঘণ্টা। তারপরই আমি তোমায় ছেড়ে দেব।'

'না!' লোকটা যেন ককিয়ে উঠল।

'হ্যাঁ।'

'আমি পারব না।'

'তুমি ভয় পাচ্ছ।'

'আমি যেতে চাই।'

'যাবার ক্ষমতা থাকলে তুমি আগেই যেতে।'

'কিন্তু আপনি আমাকে এভাবে ডিটেইন করতে পারেন না। আমি আপনার একটা চামচও চুরি করিনি। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, আটকে পড়েছি। হ্যাঁ, স্বীকার করছি যে, খাবারও নিতে গেছলাম। কিন্তু তাই বলেই কি আপনি আমাকে আটকে রাখতে পারেন ? আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যা-নয়-তাই করাতে পারেন ?'

'না। তোমাকে ল'ফুলি ধরিয়ে দিতে পারি। নিজের চেহারা আয়নায় দেখেছ ? তোমায় যদি ধরিয়ে দিতে চাই, তাহলে এটা নিয়েছ, ওটা নিয়েছ বলে একখানা লিস্টি বের করতে কি আমার খুব একটা কষ্ট হবে ?'

'হা ভগবান!' লোকটা এমন করে চেঁচাল যে কেউ যেন ওকে হঠাৎ ছেঁকা

মেরেছে হাতে অথবা পায়ে। যেন বিছে কামড়েছে, কালো কাঁকড়া বিছে। তারপর গেলাসগুলো তুলে খেতে আরম্ভ করল। একটার পর একটা।

ঘড়ির কাঁটা সরছে। লোকটার মুখ ক্রমেই ঘোলাটে আর ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। যেন ওর মুখের চামড়ার নিচে এখন আর ও বসবাস করে না। অন্য কাউকে ভাড়া দিয়ে দেওয়া হয়েছে ওর নাক মুখ রক্তের-ছিটে-জমা চোখ, কিন্তু ভাড়াটে এখনো আসেনি। সব ফাঁকা, অর্থহীন, বোবা।

চিন্তামণি দেশাইয়ের শরীরের প্রতিটি রক্তবিন্দু এখন যেন উত্তপ্ত সুরা। কি কি মদ যেন আছে যা গরম করে খেতে হয়। চিন্তামণি কি গরম মদ খেয়েছেন? আরো কয়েকটা আঙুর খেলেন উনি।

হঠাৎ লোকটার চোখটায় ভয় চমকে উঠল, মুখের চামড়া কুঁচকে উঠল যন্ত্রণায়, 'জল, একটু জল!' লোকটা খাঁটি, বরফের চেয়েও শাদা দামাস্ক কাপড়ের টেবিল-ঢাকনী খামচে ধরল।

'পড়ে যাবে…ভেঙে যাবে সব…তুমি কি করছ?'

লোকটা কাপড়টা খামচে বলল, 'আমায় একটু জল দিন।'

'নাও না…জল খাও না…' চিন্তামণি দেশাই ভয় পেয়ে গেলেন। লোকটা এ-রকম করছে কেন?

'তুমি এরকম করছ কেন?'

লোকটার চোখ দিয়ে জল পড়ছে। আহা, হয়তো কষ্ট হচ্ছে ওর। চিন্তামণি আবার ছারপোকা মশা পর্যন্ত নিজের হাতে মারেন না, একটা জলজ্যান্ত মানুষ কষ্ট পাবে, তা কেমন করে দেখবেন?

'একটু সন্দেশ খাবে? তুমি ভাল হয়ে ওঠ বাপু। তারপর না-হয় আধমণ সন্দেশ ছাঁদা বেঁধে নিয়ে যেও।'

লোকটা একটা বিশ্রী শব্দ করল। যেন চড়াই পাখীর ছানা বেড়ালের হাতে মারা পড়বার আগে 'কুঁক্' করে ডাকছে। হাতটা কিন্তু টেবিলের শাদা দামাস্ক কাপড়টা আঁকড়েই রইল। জল খেল লোকটা। বোকার মত হাঁ করল। একটু সন্দেশও খেল। আবার খানিকটা জল।

তারপর লোকটা কার্পেটে আছাড় খেয়ে পড়ল। কাপড়টা হাতের মুঠোয় টেবিল থেকে উপড়ে এল। মাছ ভাজা, আঙুর, সোনালী সিরাপে ডোবানো ফল, সন্দেশ, রূপোর প্লেট, নীল, সোনালী, সবুজ, গোলাপী কাচের গেলাস। চিন্তামণি দেশাই বেল টিপতে লাগলেন।

দুজনে একই হাসপাতালে মারা গেলেন। লোকটার পেটের পাকস্থলীতে আর নাড়ীতে কুচো-বরফের মত কাচের টুকরো। ইলিআম আর কোলোনে কাচ। ভীষণরকম হেমারেজ হয়েছিল ভেতরে। ডাক্তাররা বললে, হেমারোজিক গ্যাস্ট্রাইটিস। কাচের সঙ্গে, গলনালীর মুখে একটি গোলাপী সন্দেশ দেখে ওরা অবাক।

চিন্তামণি দেশাই মারা গেলেন হার্ট ফেল করে। অত উত্তেজনা আর ছোটাছুটি ওঁর সহ্য হয়নি।

লোকটার জন্যে সৎকার সমিতির গাড়ি এল। ওর বউ-ছেলে-মেয়ে হাসপাতালের ধুলোয় লুটিয়ে কাঁদল। মর্গ থেকে মড়া খালাস করতে ওদের জিভ বেরিয়ে গিয়েছিল।

চিন্তামণি দেশাইকে মহাধুমধামে পোড়ানো হল। অজস্র ফুল এসেছিল, তাছাড়া বাজনা। কাঙাল-ভিখিরীকে সন্দেশ বিলনো হল শ্মশানে। অনাদি কয়েকজন মেয়ে-ছেলেকে ভাড়া করে এনেছিল। তারা বুক চাপড়ে কাঁদতে কাঁদতে শুকনো চোখে মড়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্মশানের দরজা পর্যন্ত গেল। ওঁর নিজের লোক বলতে কেউ ছিল না।

ভগীরথ যখন খুব ছোট তখনি ওর মা চণ্ডীকে বাঁয়েনে ধরেছিল। বাঁয়েনে ধরবার পরে চণ্ডীকে সবাই গাঁ-ছাড়া করে দিল। বাঁয়েনকে মারতে নেই, বাঁয়েন মরলে গাঁয়ের ছেলে-পিলে বাঁচে না। ডাইনে ধরলে পুড়িয়ে মারে, বাঁয়েনে ধরলে তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়।

তাই চণ্ডীকে সবাই গাঁ-ছাড়া করে রেলের ধারে চালা তুলে দিল।

ভগীরথ বড় হয়েছে অন্য মা-র কাছে, অন্য মা-র আদরে-অনাদরে। নিজের মা কাকে বলে ভগীরথ জানে না। শুধু মাঠের ওপারে ছাতিম গাছের নিচে একটা চালা ঘর দেখেছে, শুনেছে এখানে চণ্ডী বাঁয়েন একলা থাকে।

কখনো মনেও হয়নি চণ্ডী বাঁয়েন কারো মা হতে পারে। দূর থেকে দেখেছে ঘরের মাথায় লাল নেকড়ার ধ্বজা, মাঝে মাঝে দেখেছে উদ্‌ভ্রান্তের মত ধানক্ষেতের আল ধরে চৈত্রের চষা দুপুরে লালকাপড় পরে কে যেন কাঠি দিয়ে টিন বাজাতে বাজাতে মজা পুকুরের দিকে যাচ্ছে, পেছনে একটা কুকুর।

বাঁয়েন যখন যায় তখন টিন বাজিয়ে সাড়া দিতে দিতে যায়। বাঁয়েন যদি কোন ছোট ছেলে বা যুবা পুরুষকে দেখে তখনি চোখের দৃষ্টিতে তাদের শরীর থেকে রক্ত শুষে নিতে পারে।

তাই বাঁয়েনকে একলা থাকতে হয়। বাঁয়েন যাচ্ছে জানলে যুবা বুড়ো সব পথ ছেড়ে সরে যায়।

একদিন, শুধু একদিন ভগীরথ তার বাবা মলিন্দরকে বাঁয়েনের সঙ্গে কথা বলতে দেখেছিল।

—চক্ষু নামা ভগীরথ, ওর বাবা ধমকে বলেছিল।

বাঁয়েন পা টিপে টিপে পুকুর-পাড়ে এসে দাঁড়িয়েছিল।

ভগীরথ এক পলক দেখেছিল পুকুরের জলে লাল কাপড়, তামাটে মুখ, জটাবাঁধা চুল।

দেখেছিল দুই চোখে কি ক্ষুধিত দৃষ্টি, যেন ভগীরথকে চোখ দিয়ে মেরে ফেলবে।

না, ভগীরথের মুখের দিকে চায়নি বাঁয়েন। ভগীরথ যেমন করে কালো জলে বাঁয়েনের লাল ছায়া দেখেছিল, বাঁয়েনও ঠিক তেমনি করেই ভগীরথের ছায়াটাকে

দেখেছিল। ভগীরথ শিঁউরে উঠে চোখ বুজেছিল, বাবার কাপড় চেপে ধরেছিল।

—কেন এসেছিস? ভগীরথের বাবা হিসহিসিয়ে উঠেছিল।

—মোর মাথায় তেল লাই গঙ্গাপুত্ত, ঘরে কেরাসিন নাই। একলা মোকে ডর লাগে গো!

বাঁয়েন কাঁদছিল, চণ্ডী বাঁয়েন। জলের ওপর ওর ছায়া-চোখে জল পড়ছিল।

—কেন, এ শনিবার বারের ডালা দেয় নাই?

শনিবার শনিবার ডোমপাড়ার একজন বারের ডালা নিয়ে যায়, চাল, ডাল, লবণ, তেল নিয়ে গিয়ে ছাতিম গাছের কাছে রেখে ছাতিম গাছকে সাক্ষী রেখে বাঁয়েনের বারের ডালা দিলাম গো বলে ছুটে চলে আসে।

—কুকুর খেয়ে দিলে।

—টাকা লিবি? টাকা লে।

—আমায় কে জিনিস বিচবে?

—দেব, আমি কিনে দেব, তুই এখন যা!

—আমি একলা থাকতে পারি না।

—তবে বাঁয়েন হলি কেন? যা বলছি!

ভগীরথের বাবা পুকুর-পাড় থেকে একদলা কাদা তুলেছিল।

গঙ্গাপুত্ত, এ খোকাটা কি…

একটা বিশ্রী গালি দিয়ে ভগীরথের বাবা কাদার দলাটা ছুঁড়ে মেরেছিল। তখন পালিয়ে গিয়েছিল চণ্ডী বাঁয়েন।

—বাবা, তুমি বাঁয়েনের সঙ্গে কথা বললে?

ভীষণ ভয় পেয়েছিল ভগীরথ। বাঁয়েনের সঙ্গে কথা বললে তার মৃত্যু অবধারিত। ভগীরথের মনে হয়েছিল ওর বাবা মরে যাবে আর বাবা মরে যাওয়ার কথা ভাবলেই ভগীরথের মনে হত মাথায় বুঝি বাজ ভেঙে পড়ল, বাপ মরলে সৎ-মা যে তাকে তাড়িয়ে দেবে তাতে সন্দেহ নেই।

—এখন বাঁয়েন বটে, কিন্তু উ তোর মা।

বাবা আশ্চর্য গম্ভীর গলায় কথাটা বলেছিল। গলার কাছটায় ডেলা আটকিয়ে গিয়েছিল ভগীরথের। মা! বাঁয়েন কারো মা হয়! বাঁয়েন কি মানুষ? বাঁয়েন তো মাটি খুঁজে মরা ছেলে বের করে, আদর করে, দুধ খাওয়ায়, বাঁয়েনের দৃষ্টিতে একটা গোটা গাছ অব্দি চড়চড়িয়ে শুকিয়ে যেতে পারে। ভগীরথ তো একটা জল-জীয়ন্ত ছেলে। সে কেমন করে বাঁয়েনের পেটে জন্মাল? ভগীরথ ভেবে পায়নি।

আগে মানুষ ছিল, তোর মা ছিল।

—তোমার বউ ?

—আমার বউ।

মলিন্দর কি ভেবে যেন নিশ্বাস ফেলেছিল। বলেছিল—তোরে সব বলে যাব ভগীরথ, তোর কোন ভয় লাই।

ভগীরথ অবাক হয়ে ওর বাবার দিকে চেয়ে চেয়ে আল হাঁটছিল। মলিন্দর গঙ্গাপুত্রের গলায় এমন স্বরও কখনো শোনেনি। শুধু ডোম নয় ওরা, শ্মশানের ডোম, শ্মশানে এখন মিউনিসিপ্যালিটি শুধু একজন ডোম থাকতে দেয়। ভগীরথরা বাঁশ-বেতের কাজ করে, সরকারী মুরগী খোঁয়াড়ে কাজ করে, ময়লা ফেলে সারমাটি করে। একা মলিন্দর ছাড়া এ অঞ্চলে কোন ডোম নাম সই করতে জানে না। সেইজন্য মলিন্দর কিছুদিন আগে মহকুমার লাশঘরে কাজ পেয়েছে।

সরকারী কাজ। মলিন্দর গঙ্গাপুত্র লিখে বেয়াল্লিশ টাকা মাইনে নেবার কাজ। ভগীরথ জানে বাবা মাঝে মাঝে বেওয়ারিশ মড়া চুন আর ব্লিচিং পাউডারে পচিয়ে হাড় বের করে। হাড, যদি গোটা মানুষের হাড়, নয়তো খুলি, নিদেনপক্ষে পাঁজরা খাঁচাটা পাওয়া যায়, তাহলে অনেক লাভ।

সরকারবাবু কলকাতার হবু ডাক্তারদের কাছে খুলি-হাড়-কঙ্কাল মোটা লাভে বেঁচে দেয়। বাবাকে দশ-পনের যা দেয় তাতেই বাবা খুশী। এই উপরি টাকা সুদে খাটিয়ে খাটিয়ে বাবা কয়েকটা শুয়োর কিনেছে।

মলিন্দর গায়ে পিরান পরে, পায়ে জুতো পরে মহকুমা যায়, পাড়ায়ও সম্মানী মানুষ।

সেই মলিন্দর চোখ লাল করে অনেকক্ষণ চণ্ডী বাঁয়েনের ঘরের ওপরে গেরুয়া আকাশের কপালে এতটুকু একটা সিঁদুর-ফোঁটার মত লাল নেকড়ার নিশানটুকুর দিকে চেয়েছিল। বিড়বিড় করে বলেছিল—আঁধারের ডর খায়, অন্ধকারে থাকতে লারত তারেই বিধাতা বাঁয়েন করে ছাড়ল ? এখন মলে বাঁয়েন শান্তি পায়, কিন্তু বাঁয়েন নিজে না মরে তো কেউ ওর জান নিতে লারবে, জানু বাপু ?

খুব দুঃখু না পেলে মলিন্দর এত কথা বলে না।

—কে মানুষকে বাঁয়েন করে বাবা ?

—বিধাতা।

মলিন্দর ভাল করে চেয়ে দেখেছিল ভগীরথের আশ-পাশ দিয়ে দুপুরের রোদে কোন ছায়া চলেছে কিনা ? বাঁয়েনরা ঠিক হাট-বাজারের ফুল, গোলাপ, মাখন-বালার মত, নানা ছলাকলা জানে। ধর কোন ছোট ছেলেকে বাঁয়েন নিতে চায়, সে যখন হেঁটে যাবে চারদিক রোদে পুড়লেও তার মুখে ঠিক ছায়া থাকবে। অদৃশ্য

হয়ে বাঁয়েন আঁচলের ছায়া ধরে ছেলেকে আড়াল করে নিয়ে যাবে। ছেলেটা মরে গেলে কেউ যদি দোষ দেয় তাহলে বাঁয়েন মুচকি হেসে বলবে—তা কি জানব বল? খর রোদ দেখে এট্টু ছেঁয়া দিতে গেলাম তা তোমার ঠোকাটা যেন্ ননীর পুতুল। এট্টু তাতে মরে গেল?

ভগীরথের আশপাশে কোন ময়লা, গন্ধওঠা লালচে আঁচলের ছায়া দেখতে না পেয়ে মলিন্দর যেন নিশ্চিন্ত হয়েছিল। বলেছিল—তোর কি ভয় বাপ? তোর কুনো অনিষ্ট উ করবে না।

তবু ভগীরথ ভরসা পায়নি।

শুধু ঐদিকে মন চলে গিয়েছিল ওর। ধান ক্ষেতে যাক, গরু নিয়ে যাক, কেবল মনে হত, রেললাইন ধরে ছুটে চলে যায় ওখানে। গিয়ে দেখে আসে একলা থেকে থেকে বাঁয়েন কি রকম ভয় পায়। দেখে আসে বাঁয়েন মাথায় তেল মেখে চুলের জল কেমন করে চৈত্রী বাতাসে শুকোয়।

যেতে পারত না ভগীরথ, ভয় পেত।

মনে হত যদি আর না ফিরতে পারে কোনদিন? যদি ওখানেই ভগীরথকে একটা গাছ করে, একটা পাথর করে রেখে দেয় বাঁয়েন?

কয়েকদিন ভগীরথ শুধু চেয়ে দেখত।

দেখত ছাতিমগাছ আর চালাঘরের মাঝামাঝি আকাশটা যেন কার কপালের মতন। সেই কপালে এক ফোঁটা সিন্দুর-টিপের মত লাল নেকড়ার নিশানটা কখনো স্থির হয়ে থাকে, কখনো দোলে। মনে হত ছুটে চলে যায় একবার, আর পাছে ছুটে যায় সেই ভয়ে উলটোদিকে ছুটে ভগীরথ বাড়ি চলে আসত।

আশ্চর্য, বাঁয়েনের ছেলে বলে ওকে কেউ হেনস্তা করত না, বরঞ্চ বেশী খাতির করত। বাঁয়েনের ছেলেকে খাতির করলে বাঁয়েন সে কথা জানতে পারে। সে ভাল খাতির দেখায়।

তার কচিকাঁচা ভাল থাকে। যে দূর ছাই করে তার ঘরে শুধু মরতেই থাকে ছেলেপুলে।

ভগীরথের এখানকার মা-ও কিছু বলেনি। সতীনের ছেলের ওপর ওর অনুরাগ আছে, না বিরাগ, দ্বেষ না ভালবাসা, তার কোনটাই ও কোনদিন প্রকাশ করেনি। তার প্রধান কারণ ওর নিজের ছেলে নেই। গৈরবী আর সৈরভী দুটো মাত্র মেয়ে। পুত্রসন্তান না থাকলে স্বামীর ওপর জোর থাকে না। তাছাড়া এখানকার মা-র ওপরের ঠোঁট ফাঁক, মাড়ি বেরকরা। বাড়ি থেকে বেরোতে চায় না বেশী। বলে—কুন মুখ দেখাতে যাব সি বল দেখি? মুখ মোটে বুজে না যি। না হাসলেও মনে হয়

মাগী হাসতেছে। দেখ গঙ্গাপুত্ত, মলে পরে মুখখানা গামছা দিয়ে ঢেকে দিও—জানলু? লইনে মানুষ বলবে দাঁতী ডোমনী চলল।

যশি শুধু কাজ করে, ঘর নিকোয়, ভাত রাঁধে, কাঠ কুড়োয়, গোবর চাপড়ী দেয়, শুয়োর তাড়ায়, মেয়েদের মাথার উকুন বাছে, ভগীরথকে 'বাপ' বলে কথা বলে, খেতে এস বাপ, লাইতে যাও বাপ, যেন ওদের মধ্যে কুটুমের সম্পর্ক, বাঁয়েনের ছেলেকে যত্ন-আত্তি না করলে বাঁয়েন তার মেয়ে দুটোকে বাণ মেরে দিতে পারে। যশি জানে। আরো জানে, একদিন ভগীরথের ভাতের ওপরই তাকে নির্ভর করতে হবে।

মাঝে মাঝে মাড়ি বের করেও সভয়ে গালে হাত দিয়ে বসে থাকে, কে জানে ভর দুপুরে বাঁয়েন ওর মেয়ে দুটোর কথা মনে করে মাটি দিয়ে পুতুল গড়ছে কিনা, বাণ ফুঁড়ছে কিনা। তখন যশিকে যত কুচ্ছিত তার চেয়েও কুচ্ছিত দেখায়। অনেক দুঃখে মলিন্দর ডোমপাড়ার সবচেয়ে কুৎসিত মেয়েটিকে সাঙা করেছে। কয়েকটা গাঁয়ের ডোমপাড়ার সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েটি বাঁয়েন হয়ে যাবার পর মলিন্দর আর রূপসী মেয়ে দেখতে পারে না।

মলিন্দর বউকে নাকি খুব ভালবাসত।

হয়তো সেই ভালবাসার কথা মনে করেই একদিন মলিন্দর ভগীরথকে চণ্ডী বাঁয়েনের কথা বলল। দুজনে রেললাইনের পাশ দিয়ে হাঁটছিল। মলিন্দরের হাতে মাংসের পোঁটলা, এই এক আশ্চর্য দুর্বলতা মলিন্দরের, নিজের হাতে পালা শুয়োর-গুলোকে ও কাটতে পারে না। শুয়োর পোষে, বড় করে, তারপর কাটবার দরকার হলে গোটা শুয়োরটা কাউকে বেচে দেয়। যে কেনে সে মলিন্দরকে একটু মাংস দেয়।

—এট্টু গাছের ছেঁয়ায় বসি?

যেন তের বছরের ছেলের অনুমতি নিল মলিন্দর, বটগাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসল। ভগীরথ জিগ্যেস করল—এখান হতে ডাকাতরা যায়, না কি বাপ?

ভগীরথ এখন বুনিয়াদী ইস্কুলে যায়। এই সরকারী স্কুলের দেয়ালে ওদের মাস্টারমশাই এক সময়ে দেয়াল-পত্রিকা লিখিয়েছিলেন ছেলেদের দিয়ে। নিজে হরফগুলি লিখে এনেছিলেন। ভগীরথ সেগুলি কালি দিয়ে ভরেছিল। সেই লেখাটি পড়ে ভগীরথ জানতে পেরেছিল উনিশ শো পঞ্চান্নর অচ্ছুৎ আইনের পর থেকে ওরা কেউ আর অচ্ছুৎ নয়।

জেনেছিল ভারতীয় সংবিধান বলে একটা জিনিস আছে, তার প্রথমেই একটা মৌলিক অধিকারের কথা স্পষ্ট করে লেখা আছে, তারা নাকি সবাই সমান।

দেয়াল-পত্রিকাটা এখনো টাঙানো আছে। কিন্তু ভগীরথরা জানে সহপাঠিরা বা মাস্টাররা ওর্দের একটু দূরে বসাই পছন্দ করেন। এই ইস্কুলে অন্য জাতের ছেলেরা নেহাত গরীব বা অপারগ না হলে আসে না। আসবে কেন? এখন চারদিকে ইস্কুল।

যা হোক, ভগীরথ এখন একটু অন্য রকম ভাষায় কথা বলে। মলিন্দর ওর কথা শুনতে ভালবাসে ও ভগীরথের পাশে প্রায়ই ওর নিজেকে এক অযোগ্য বাপ বলে মনে হয়।

ভগীরথ ডাকাতদের কথা জিগ্যেস করল। এখন এই সোনাডাঙা, পলাশী, ধুবুলিয়া জায়গায় জায়গায় সন্ধ্যার ট্রেনে ডাকাতি খুব বেড়ে গিয়েছে। ডাকাতি সবাই করে বলতে গেলে। ভদ্রলোক গরীব ছাত্র কলোনির বাসিন্দে পাকা বাড়ির মালিক—নানা রকম পরিচয় তারা বাইরে দেয়, কামরায় ওঠে। তারপর ঠিক সময়ে চেন টেনে ট্রেন থামিয়ে দেয় অন্ধকার মাঠে। অন্ধকার থেকে সেথোরা আসে। তারপর সবাই মিলে যা পারে নিয়ে থুয়ে মেরে ধরে চম্পট দেয়। বিশেষ করে এই বটগাছটা সন্ধ্যের পর বড় ভয়ের হয়ে উঠেছে।

তাই ভগীরথ ডাকাতের কথা জিগ্যেস করল। মলিন্দর কিন্তু সে কথা বিশেষ গায়ে মাখল না। শূন্য মাঠের দিকে চেয়ে চেয়ে আকাশে ও মাঠে কি যেন খুঁজল, তারপর বলল—আমি আগে নিমায়া-নিদায় ছিলু জানলু বাপ! তোর মা ছিল তুষু তুষু ক্যানেকে কানত। বিধেতার বিচার!

যেন ভগবানই একদিন ডোমপাড়ায় এসে পাশা উল্টে দিলেন। চণ্ডী হয়ে গেল বাঁয়েন, নিষ্ঠুর নির্দয় শিশুহন্তা। আর মলিন্দর হয়ে গেল তুষুপ্রাণ। হতেই হবে। একজন যদি অমানুষ হয়, মানুষের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে অলৌকিক জগতের অদৃশ্য দরজা খুলে ঢুকে যায়, তাহলে আরেকজনকে মানুষের মত মানুষ হতেই হবে।

ভগীরথ এই সময়ে বুঝতে পারল, ওর বাবা ওকে কিছু বলতে চায়। ভগীরথ একটু আশ্চর্য হল। সেই একদিন বাবা বাঁয়েনের সঙ্গে কথা বলেছিল আর বলেনি। আজ আবার বাঁয়েনের কথা কেন?

মলিন্দর ভগীরথের হাত চেপে ধরল। বলল—ভয় কি? সবাই জানে আর তুই তোর মায়ের বিত্তান্ত জানবি না?

ওরা গঙ্গাপুত্র। ওরা ডোম, মলিন্দর বাঁশ বইত, কাঠ কাটত আর চণ্ডীর ছিল কাঁচা ভাগাড়ের কাজ।

ওর বংশগত উত্তরাধিকার। এই গ্রামের উত্তরে বিলের ধারে বটগাছতলে কাঁচা ভাগাড়। পাঁচ বছরের নিচে শিশু মরলে এখন পোড়াতে হয়, তখন সবাই

পুঁতে দিত। ঐ ভাগাড়ে চণ্ডীর বাবা খন্তা দিয়ে গত খুঁড়ত, কাটা গাছ দিয়ে গত ঢেকে রাখত, শেয়াল তাড়াত। হই হই হইয়া...ওর প্রমত্ত কণ্ঠের ভয়ঙ্কর ডাক রাতে বিরেতে হরদম শোনা যেত।

শুধু মদ আর গাঁজা খেত চণ্ডীর বাবা। আর শনিবার একটা ডালা হাতে গাঁয়ে বেরুত। বলত—আমি আপোনাদের সেবক গো, আমি গঙ্গাপুত্ত, আমার ডালাটা দিয়ে দেন গো।

সবাই ওকে ভয় পেত। ওর চোখ থেকে ছোট ছেলেমেয়েকে সরিয়ে রাখত। একটাও কথা না বলে ওকে ভিক্ষে দিয়ে চলে যেত।

একদিন একটা ফর্সা মেয়ে, কটা চোখ, লালচে চুল, এসে দাঁড়িয়েছিল। বলেছিল—আমি চণ্ডী, অমুক গঙ্গাপুত্তের বিটি, বাপ মরে গেল। বাপের ডালা এখন মোকে দেন।

—বাপের কাজ তুই করবি ?

—করব।

—তোকে ভয় লাগে না ?

—মোর ভয়ডর নাই।

এই ভয়ডরের কথাটা চণ্ডী বুঝতে পারত না। ছেলে মেয়ে মরলে মা বাপ কাঁদে সে শোকের অর্থ বোঝা যায়। কিন্তু মরাকে কি কেউ বাড়িতে ধরে রাখে, না রাখতে পারে ? তার সৎকার করাটা তো চণ্ডীর কাজ ; অন্যত্র জীবিকা। এতে ভয়ের কি আছে, নিষ্ঠুরতাই বা কি ? যদি থাকে সেও তো বিধাতার নিয়ম ? সে নিয়ম তো গঙ্গাপুত্ররা তৈরী করেনি ? তবে তাদের এত ঘেন্না করে কেন মানুষ, কেন ভয় পায় ?

এই চণ্ডীকে মলিন্দর বিয়ে করেছিল। তখনো মলিন্দর সরকারবাবুর সঙ্গে হাড় বেচার কাজ করত। গো-ভাগাড়ের হাড় থেকে সার হয়, সে হাড়েরও দাম আছে। হাতে পয়সা ছিল মলিন্দরের, বুকে সাহস, রাতে মাঠ দিয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে ও ফিরত—কিসিকো নেই ডরতা, হাম আগুন খাতা ! কিসিকো নেই ডরতা !

সন্ধ্যেবেলা লণ্ঠন হাতে একা চণ্ডীকে বটগাছতলায় ঘুরতে দেখে ও বলেছিল—এই, তু আঁধারে ডরিস না ?

না। হাম আগুন খাতা জানিস ? চণ্ডীর হাসি দেখে মলিন্দর খুব অবাক হয়েছিল। সেই বৈশাখেই ও চণ্ডীকে বিয়ে করে। আরেক বৈশাখে চণ্ডীর কোলে ভগীরথ এসেছিল।

চণ্ডী ভগীরথকে কোলে নিয়ে একদিন কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এসেছিল, বলেছিল

—মোকে ওরা ঢেলা মেরেছিল গঙ্গাপুত্ত। বলল আমার নজর মন্দ।

—কে ঢেলা মারল ?

—লাও! তাকে কি তুমি মারবা ?

—ঢেলা মারল কেন ?

মলিন্দর উঠোনে বেড়া পুঁততে পুঁততে প্রায় নাচতে শুরু করেছিল চট্‌কা রাগে। আমার বউকে ঢেলা মারে কে ? কার এত আস্পর্ধা ? গালাগালি দিতে শুরু করেছিল মলিন্দর।

চণ্ডী ওর দিকে কিছুক্ষণ নির্নিমেষে চেয়ে বসে ছিল। তারপর বলেছিল—মোর মন চায় না গঙ্গাপুত্ত, খন্তা ধরতে, মন চায় না কিন্তুক বিধাতা ই কাজ মোকে দিয়ে করাবে, তা আমি কি করব বুল ?

চণ্ডী আশ্চর্য হয়ে ঘাড় নেড়েছিল, নিজের হাত পা দেখেছিল। ওর বংশে ভাই-কাকা-দাদা থাকলে বংশের কাজ করত, কিন্তু কেউ নেই। ওরা সেই আদিম যুগের শ্মশানের দাস, যখন হরিশ্চন্দ্র চাঁড়াল হয়েছিলেন তখন চণ্ডীদের পূর্বপুরুষ ওকে কাজ শিখিয়েছিল। আবার যখন হরিশ্চন্দ্র রাজা হলেন তখন সসাগরা পৃথিবী ওঁর, দান করতে লাগলেন ভারে ভারে।

—মোদের কি বেবস্থা ?

সেই আদিম গঙ্গাপুত্র রাজসভা ফাটিয়ে জিগ্যেস করেছিল। ওদের কানের ভেতরে রাবণের চিতা শোঁ শোঁ করে, তাই ওরা প্রতিটি কথাই চেঁচিয়ে বলে, ধীরকণ্ঠ শুনতে পায় না।

—কিসের বেবস্থা ?

—বামুন গাই-বলদ পাবে, সন্নেসীর নিত্য ভিক্ষা, মোদের কি বেবস্থা ? মোদের কি দিলে ?

—পৃথিবীর সকল শ্মশান দিলাম।

—কি দিলে ?

—সসাগরা পৃথিবীর সকল শ্মশান তোমাদের দিলাম।

—দিলে ?

—দিলাম, দিলাম, দিলাম।

তখন সেই আদি গঙ্গাপুত্র দুই হাত তুলে ভীষণ নেচেছিল। উল্লাসে বলেছিল—হা, মোরা সকল শ্মশান পেয়েছি গো, সকল শ্মশান পেয়েছি! এ পিথিমীর সকল শ্মশান মোদের।

সেই মানুষটির বংশের একজন হয়ে চণ্ডী কেমন করে জাতকর্মে লাথি মারত ?

মারলে যে সে দেবরোষে পড়ত না তার ঠিক কি ? অথচ, চণ্ডীর ভীষণ ভয় করত ইদানীং, খন্তা দিয়ে গর্ত খুঁড়ে ও মুখ ফিরিয়ে নিত। গর্তে কাঁটা ঝোপ চাপা দিলেও ওর ভয় যেত না। মনে হত যে-কোন সময়ে মুখে আগুন নিয়ে একটা শেয়াল বটগাছের মত বড় বড় থাবা দিয়ে মাটি খুঁড়তে শুরু করবে।

ভগমান—ভগমান—ভগমান··· চণ্ডী গুনগুন করে কাঁদত। একছুটে চলে আসত বাড়ি। ঘরে বাতি জেলে বসে থাকত আর ভগীরথের দিকে চেয়ে ঠাকুরকে ডাকত। এই সময়ে চণ্ডী সব সময়ে কামনা করত গ্রামের প্রতিটি শিশু যেন অখণ্ড পরমায়ু নিয়ে বেঁচে জীয়ে থাকে কেন না আগে তার যে দুর্বলতা ছিল না এখন সেই দুর্বলতা হয়েছে।

ভগীরথের কথা মনে করে ওর প্রতিটি শিশুর জন্য কষ্ট হয়, নিদারুণ কষ্ট হয়। যদি বটতলায় বেশী সময় থাকতে হয়, ওর বুক দুধে টনটন করে। মুখ নিচু করেও গর্ত করে ও বাপকে মনে মনে দোষ দেয়। মেয়েকে কেন সে এই নিষ্ঠুর কাজে ব্রতী করে গেল ?

—আপনারা অন্য মানুষ দেখে লাও, মোর মন উঠে না।

চণ্ডী একথাও বলেছিল একদিন। কিন্তু ওর কথা কেউ কানে নেয়নি। মলিন্দর ওর কথা বিশেষ বুঝত না কেন না, অন্য মানুষ যা দেখে ভয় পায়, ঘৃণা করে, সেই অশুচি শবদেহ, হাড়, চামড়া নিয়েই ওর জীবিকা। চণ্ডীর কথাবার্তা শুনে ও বলত—ধুস্ যত মিছা ডর !

চণ্ডী বেশী কাঁদলে বলত—তো-মানীর বংশে তো কেউ লাই, কে আসবে শুনি ?

এই সময়েই সেই নিদারুণ ঘটনাটা ঘটেছিল। গ্রামে বেড়াতে এসেছিল মলিন্দরের এক জ্ঞাতি বোন। তার মেয়েটা ক'দিনেই চণ্ডীর ন্যাওটা হয়েছিল। গ্রামে সেবার খুব বসন্ত হচ্ছে। চণ্ডীরা কোনদিনই টিকে নেয় না, শীতলাতলায় যায়। ননদের মেয়েটিকে কোলে নিয়েছিল চণ্ডী। ননদকে নিয়ে পুজো দিয়ে এসেছিল শীতলাতলায়। রেললাইনের ধারে বিহারী কুলীরা যখন কাজ করত ওরা একটি শীতলাথান বসিয়ে গেছে। সেখানে পাকাপাকিভাবে বিহারী পুরোহিত থাকেন একজন।

কয়েকদিন পরে সেই শিশুটিই, কি আশ্চর্য, মায়ের দয়ায় মারা গেল। চণ্ডীর বাড়িতে নয়, অন্যত্র, কিন্তু মেয়ের মা-বাবা-পিসী-কাকা সবাই বলতে লাগল চণ্ডীই ওকে নিয়েছে।

—আমি ?

—হ্যাঁ গো তুমি !

—আমি লয় গো আমি লয়।

চণ্ডী ওদের সমাজের মেয়েপুরুষগুলির দিকে চেয়ে সকাতরে বলেছিল।

—হাঁ তুমি!

—কখুনো নয়।

চণ্ডী সাপের মত ফুঁসে উঠেছিল। বলেছিল—আমা হতে কারো মন্দ হবার লয়। জান আমি কার বংশ?

ভীরু কুসংস্কারে অন্ধ মানুষগুলি ভীত চোখ নামিয়ে ফিসফিস করে বলেছিল—টুকৃনিকে মাটি দিবার কালে তোমার বুক হতে দুধ মাটিতে পড়ল কেন?

—হা রে বোকার সমাজ!

চণ্ডী কিছুক্ষণ ঘৃণা ও বিস্ময়ে সকলের দিকে তাকিয়েছিল। তারপর বলেছিল—ঠিক আছে। পিত্তিপুরুষের শাপ মোকে লাগুক, ডর করি না। উ কাজ ছেড়ে দিলাম আজ হতে।

—কাজ ছেড়ে দিবি?

—দিব। যা, যেয়ে বীরপুরুষ সব, পাওরা দেগা। মোর মন ই কাজে বহুদিন লাই, গঙ্গাপুত্ত গোরমেণ্টের ঘরে সরকারী কাজ পাবে, ই কাজে আমি মরতে যাব কেন?

সমাজের সকলকে বোবা করে দিয়ে চণ্ডী ঘরে চলে এসেছিল। মলিন্দরকে বলেছিল—কাজ যিখানে সিথা ঘর মেলে না? সিথা চলে যাব। উরা মোকে কি বলে তা জান?

মলিন্দর চণ্ডীকে ঠাট্টা করে অবস্থাটা সহজ করে নেবার জন্য স্বভাবসিদ্ধভাবে চেঁচিয়ে হেসে বলেছিল—কি বুলে উরা? তু বাঁয়েন হছিস?

বলেই মলিন্দর আর্তনাদ চেপে নিয়েছিল। কি বলল! মলিন্দর একি ভয়ানক কথা উচ্চারণ কর?

চণ্ডী কাঁপতে শুরু করেছিল বাঁশের খুঁটি ধরে। উত্তেজনায়, দুঃখে, রাগে, চতুর্গুণ চেঁচিয়ে ও বলেছিল—ঘরে বন্‌শধর রইতে কেউ উ বাক্য মুখে ল্যায়? আমি বাঁয়েন? আমি ঘরের ছেলে ফেলে, মরা ছেলেকে দুধ দেই, মরা ছেলে লিয়ে সোহাগ করি? আমি বাঁয়েন?

—চুবো!

মলিন্দর ওকে ধমক দিয়ে উঠেছিল, কেন না তখন ভর দুপুর। এ সময়ে মানুষের কুকথা-দুঃসংবাদ বাতাসের মুখে ধায়। এ সময়ে মাথায় তেল, ভাত না থাকলে মনে ভয়ঙ্কর হিংসে-রাগ-আক্রোশ সহজে ধুইয়ে ওঠে। মলিন্দর ওর সমাজের লোকের

স্বভাব চরিত্র জানত।

—আমি বাঁয়েন লই গো আমি বাঁয়েন লই!

চণ্ডীর কান্না চিল ছোঁ মেরে বাতাসকে পৌঁছে দিয়েছিল। বাতাস নিমেষে সে কান্নার খবর ঈশান থেকে অগ্নি আকাশের সবকটা কোণে ছড়িয়ে দিয়েছিল।

ঐ একবার কেঁদেই চুপ করে গিয়েছিল চণ্ডী, আর কোন কথা বলেনি, মলিন্দরকে নাকি বলেছিল—মোরা আঁধারে চলে যাই কুথা?

—কুথা যাবি?

—পালা বা?

—কুথা?

—জানি না।

চণ্ডী মলিন্দরের কাছে এসে ভগীরথকে কোলে নিয়ে বসেছিল, বলেছিল—কাছে গুইড়ে এসো, বুকে মাথা রাখি।

বলেছিল—মোক বড় ডর লাগছে। পিত্তিপুরুষের কাজ করব না বলে এলাম থিকে ডর লাগছে। এতদিন তো ডরি লাই? আজ অ্যামন ডর লাগছে, তুমাকে আর দেখব না, ভগীরথকে আর দেখতে দিবে না, ভগমান?

এই কথাটি বলে মলিন্দর চোখ মুছল। বলল—এখুন মনে ল্যায় বাপ, সিদিন ভগমান উর মুখ দিয়ে কথাটা বুলিয়েছিল, জানলু?

—তারপর?

তারপর চণ্ডী কয়েকদিন আচ্ছন্ন হয়ে বসে থাকছিল। অল্প কাজকর্ম করে আর ভগীরথকে কোলে নিয়ে বসে থাকে, গান গায়। ঘরে খুব ধুনো জ্বালে পিদীম জ্বালে আর মাঝে মাঝে কান পেতে শোনে।

একটানা দুটো মাস খুব ভাল কেটেছিল। আর চণ্ডীকে ডাকতে আসেনি কেউ আর দরকারও হয়নি। খুব শান্তিতে ছিল ওরা সেই কটা দিন। চণ্ডীও খুব শান্ত হয়ে গিয়েছিল, বলেছিল—ই কাঁচাকচিদের অন্য বেবস্থা হতে হয়। ই বেবস্থা খুব মন্দ।

—হবে, বেবস্থা হবে। দিকে দিকে হচ্ছে।

চণ্ডী বলত—ভাল করলাম কী মন্দ করলাম কে বুলে দিবে? দেখ, মোক মন বুলে নিশি য্যাখন শুনলাম ত্যাখন জানি মোক বাপ হাঁকুর দেয়।

—তুই শুনলি?

—মন বুলে যেমন হই-হই-হইয়া ডাক উঠে, বাপ কি শিয়াল তাড়ায় নাকি?

—চুপ যা চণ্ডী!

মলিন্দর ভয় পেত। মাঝে মাঝে কি তারই মনে হত না চণ্ডী বাঁয়েন হয়ে যাচ্ছে, চণ্ডী রাতে চমকে উঠে বটতলায় কাদের কান্না শোনে? হয়তো সমাজ যা বলছে সে কথাই সত্যি। মনে হত এর চেয়ে দেশ-গ্রাম ছেড়ে শহরে যাওয়া অনেক ভাল।

সমাজও চণ্ডীকে ভোলেনি। চণ্ডীর ওপর চোখ রাখছিল। চণ্ডী তা বুঝতে পারত না এই যা! সমাজ যখন চায় তখন লক্ষ্যে চোখ রাখে, যখন চায় না তখন অলক্ষ্যে চোখ রাখে। সমাজের অসাধ্য কাজ নেই।

তাই একদিন ঝড় বাদলের রাতে, মলিন্দর যখন মদ খেয়ে নেশায় টুপটুপে হয়ে ঘুমোচ্ছে, ওর উঠোনটা মানুষে মানুষে ভ' গিয়েছিল। ওকে ডেকে তুলেছিল কেতন, চণ্ডীর কি রকম মেসো। বলেছিল—তোর বউ বাঁয়েন কিনা দেখে যা!

ঘুম ভাঙা-চোখে মলিন্দর বোকার মত ওদের দিকে চেয়ে বসে ছিল কিছুক্ষণ।

—দেখে যা শালা দেখে যা, ঘরে বাঁয়েন পুষ্যে মোদের ছেলেগুলোকে সারা করাছিস্ ত্যাতদিন ধরে!

মলিন্দর দেখতে গিয়েছিল।

দেখছিল—বটতলায় মশাল জ্বলছে, লণ্ঠন। সমাজের বেটাছেলেরা ভিড় করে চাক বেঁধে আছে, কেউ কথা বলছে না।

—চণ্ডী রে!

মলিন্দরের আর্ত চিৎকারটা কে শূন্যেই ছুরি দিয়ে কেটে ফেলেছিল। সবাই স্তব্ধ, সবাই দেখছে এরা কি করে।

চণ্ডী!

চণ্ডী দাঁড়িয়ে ছিল। হাতে একটা দা, পাশে লণ্ঠন, এক পাঁজা কাঁটা গাছের ডাল পাশে উঁচু করা।

—ডাল ঝোপ এনে আমি গর্ত ঢাকছিলাম গো।

—কেন, তু উঠে এলি কেন?

—শিয়ালগুলো চেঁচাতে যেয়ে য্যামন থেমে গেল ত্যামন মোক মন বুলল—উরা গর্তে যেয়ে খাবলাচ্ছে, মরা তুলবে।

—তু বাঁয়েন!

গ্রামের লোকেরা মন্ত্রধ্বনির মত বলল, সভয়ে।

—ক্যাও পাওরা দেয় না থি।

—তু বাঁয়েন!

—মোক বংশকাজ। উরা কি জানবে?

—তু বাঁয়েন!

—আমি বাঁয়েন লই গো, মোক বুকে কচি ছেলা, মোক বুক দুধে ফেটে যায়! বাঁয়েন আমি লই! গঙ্গাপুত্ত তুমি বুল না গো, তুমি তো সব জান?

লণ্ঠনের আলোয়, বৃষ্টিতে লেপটানো বুক আঁচলটা দেখছিল মলিন্দর মন্ত্রমুগ্ধের মত। বুকের ভেতর ফেটে যাচ্ছিল মলিন্দরের। কে বলছিল ও মলিন্দর সাপ দেখলে তু কাছে যাস, আগুনে যেয়ে হাত ঢুকাস, এখন যাস না তু, তুদের কত ভালবাসার বিয়ে, ভালবাসার ঘর। তু গেলে মহা সর্বনাশ হয়ে যাবে।

মলিন্দর কাছে গিয়েছিল, রক্ত চোখ দিয়ে চণ্ডীকে ভাল করে দেখতে দেখতে চেঁচিয়ে উঠেছিল জন্তুর মত—আরি ই-ই-ইহার! তু বাঁয়েন। বটতলায় এসে কারে দুধ দিচ্ছিলে রে? আরি ই-ই-ই-ই-গো।

—গঙ্গাপুত্ত···হায় গো।

চণ্ডীর ভীষণ ও বুকফাটা কান্না মাটির মৃত শিশুদের, চণ্ডীর বাবার অশান্ত আত্মাকে, ওর আদিমপুরুষ সেই আদিম ডোমকে বুঝি ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। মানুষের জগৎ থেকে অমানুষটি অতিলৌকিক লোকে নির্বাসনের সময় মানুষের আত্মা বুঝি অমনি করেই কাঁদে। অমনি আকাশ-মাটি-পাতাল কাঁপিয়ে।

কিন্তু মলিন্দর ছুটে ঘরে এসে ওর শ্বশুরের শনিপুজোর ঢোলটা নিয়ে আবার বটতলা চলে গিয়েছিল। ঢোলে কাঠি দিয়ে গ্রাম কাঁপিয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিল—আমি মলিন্দর গঙ্গাপুত্ত শোহরৎ দেই। আমার বউ বাঁয়েন হয়্যাছে গো বাঁয়েন হয়্যাছে!

—তারপর? ভগীরথ জানতে চাইল।

—তারপর সমাজ উকে বেলতলা লিয়ে গেল বাপ। জানলু, একেল হতে সি য্যামন ডরাও, সি একেবারে একেল হয়ে গেল। উই, উহু শোন বাঁয়েন গান গায়।

অনেক দূর থেকে টিনের কৌটোর শব্দ আর এক আশ্চর্য গানের স্বর ভেসে এল। সে গানে শব্দ নেই। কথা নেই বলে মনে হয়, কিন্তু কথা ধীরে ধীরে শোনা গেল।

ঘুম এস ঘুম এস রে সোনা, ঘুম এস রে যাদু···

গানটা ভগীরথ জানে, গানটা গেয়ে ওর এখনকার মা গৈরবী-সৈরভীকে ঘুম পাড়ায়।

—চল, ঘরকে যাই বাপ!

মলিন্দর অভিভূত ভগীরথকে নিয়ে ঘরে ফিরে চলল। ভগীরথ বুঝতে পারল—বাঁয়েনের গানটা ওর ভেতরে ঢুকে গেল, ওর রক্তে মিলে গেল, একটা দুর্বোধ্য বেদনার মত ওর কানের ভেতর বাজতে থাকল!

তার কয়েকদিন পর ভগীরথ দুপুরবেলা একলা চলে এল মজা বিলের পাশে। অনেক দূর থেকে ও টিনের শব্দ শুনেছে, শুনে ছুটে ছুটে এসেছে।

জলে বাঁয়েনের ছায়া। বাঁয়েন ওকে দেখছে না। চোখ নিচু করে জল ভরছে মাটির কলসীতে।

—তোমার আর কাপড় নাই?

বাঁয়েন চুপ; বাঁয়েন মুখ ফিরিয়ে আছে।

—তুমি ভাল কাপড় পরবে?

—গঙ্গাপুত্তের বেটা ঘরে যাক্।

—আমি, আমি এখন ইস্কুলে পড়ি। আমি ভাল ছেলে।

—মোক সঙ্গে কথা বুলে নারে। আমি বাঁয়েন।

—আমি ছেঁয়াকে বলছি।

—মোক ছেঁয়াতে পাপ আছে ইকথা গঙ্গাপুত্তের বেটা জানে না?

—আমার ভয় নাই।

—ঘরে যাক্, এখন ত্যতম্পর তাত। ইকালে দুধের ছেলা বাইরে ঘুরে না।

—তুমি…তুমি একলা থাকতে ভয় পাও?

—একলা? না·রে মোক কুন ভয় নাই। একলা থাকতে বাঁয়েন ডরে?

—তবে তুমি কাঁদ কেন?

—কে বুলে?

—আমি শুনেছি।

—গঙ্গাপুত্তের বেটা শুনেছে! আমি কাঁদি?

জলে লাল ছায়াটা কাঁপছে। বাঁয়েনের চোখে জল, বাঁয়েন চোখ মুছল, বলল—ঘরে থেয়ে গঙ্গাপুত্তের বেটা য্যান ফিরে কাড়ে, বাঁয়েনের ধারে কুনদিন আসবে না, লয় তো…লয় তো আমি গঙ্গাপুত্তকে বুলে দিব।

ভগীরথ দেখতে পেল আল ধরে বাঁয়েন চলে যাচ্ছে। চুলের গোছা উড়ে উড়ে পড়ছে, কাপড়ের আঁচল লাল। অনেকক্ষণ বসে রইল ভগীরথ, বিলের জল স্থির হওয়া অব্দি বসে রইল। কিন্তু আর কেউ গান গাইল না—ঘুম এস ঘুম এস সোনা, ঘুম এস রে যাদু।

ঘরে গিয়ে বাঁয়েনও অনেকক্ষণ বসে রইল। বসে বসে আকাশ-পাতাল ভাবতে থাকল। ভেবে ভেবে শেষে উঠে অনেকক্ষণ বাদে একটা ভাঙা আরসি টেনে বের করল।

—চ্যাহারার কিছু লাই।

অস্ফুটে বলল বাঁয়েন। চুলগুলো একবার আঁচড়াতে চেষ্টা করল। ভীষণ জোট।

—টোকাটা কাপড়ের কথা বলল কেন? উর তো কিছু মনে থাকার কথা লয়। ফর্সা কাপড়, ভাল চ্যাহারার কথা? ভুরু কুঁচকে অনেকক্ষণ ধরে ভাবল বাঁয়েন। অনেকদিনই ও মানুষের মত গুছিয়ে কিছু ভাবতে পারে না। ভাববার কিছু নেইও ওর। শুধু গাছের পাতার শব্দ, বাতাসের ডাক, রেলের আওয়াজ নিয়ে কত কথা আর ভাবা যায়!

কিন্তু আজ ওর মনে হল টোকাটার সর্বনাশ হয়ে যাবে। হঠাৎ মানুষের বউয়ের মত অবিবেচক মলিন্দরের ওপর রাগ হল। টোকাটাকে সামলে রাখবা কার কাজ? বাঁয়েনের নজর থেকে আড়াল করা কার দায়িত্ব?

উঠে, লণ্ঠন জ্বেলে ও হনহন করে রেললাইন ধরে ধরে এগোতে লাগল। লাইন ধরে এগিয়ে গেলে ঐ দূরে গুমটি ঘর, লেভেল ক্রসিং। ওখান দিয়ে আসে মলিন্দর। এসে আলপথ ধরে ঘরে যায়। লাইন ধরে যেতে যেতে ও লোকগুলোকে দেখতে পেল। লোকগুলো লাইন থেকে কি সরাচ্ছে।

না, লাইনের উপর বাঁশ গাদা করছে এনে এনে।

আজ বুধবার রাতের ফাইভ-আপ লালগোলায় মেলব্যাগ আসবে। অনেক টাকা। অনেকদিন ধরে ওরা এই জন্যে তৈরী হচ্ছে।

—তোরা কে?

বাঁয়েন লণ্ঠন তুলল, নিজের মুখের পাশে দোলাল। লোকগুলো মুখ তুলছে। ভয়ে সাদা, চোখ বিস্ফারিত। ওর সমাজের মানুষদের এত ভয় পেতে বাঁয়েন কোন-দিন দেখেনি।

—বাঁয়েন?

তুরা বাঁশ-গাড়ি দিচ্ছিস, তুরা গাড়ি মারবি? আবার পালিয়ে যাচ্ছিস, হা মোক ডরে? ই বাঁশ ফেলা আগে, সর্বনাশ হবে।

—ওরা বাঁশ নামাতে পারে না লাইন থেকে, সর্বনাশ ঠেকাতে পারে না। সমাজ চিরকাল এই করে, সমাজের এই কাজ। ওদেরি একজন একদিন ঢোল লহরৎ দিয়ে ওকে বাঁয়েন করে দিয়েছিল। বাতাসে বিষ্টির ঝাপট, চণ্ডী লণ্ঠনটা হাতে নিল। অসহায়, কি অসহায় চণ্ডী। ও যদি বাঁয়েন হয় তো ওর পোষা অন্ধকারের দানব-গুলো এসে ঐ ট্রেনটাকে থামিয়ে দিচ্ছে না কেন? সমাজ তো এই পারে। শুধু এইটুকু। কি অসহায় চণ্ডী, চণ্ডী এখন কি করে?

লণ্ঠন হাতে চণ্ডী লাইন ধরে ছুটতে লাগল। এক হাত তুলে মানা করতে

লাগল—এসো না, আর এসো না-গো, এখানে পাহাড়-প্রমাণ বাঁশ গাড়া।

• ট্রেন দুরন্ত ছেলের মত কোন বাধা না মেনে একেবারে চণ্ডীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

প্রাণ দিয়ে ট্রেনটাকে দুর্ঘটনা থেকে বাঁচাবার জন্যে চণ্ডীর নাম অনেক দূর পৌঁছে গিয়েছিল। বুঝি বা সরকারের ঘরেও।

লাশ ঘর থেকে ওরা যখন চণ্ডীকে নিয়ে চলে গেল তখন দারোগাবাবু মলিন্দর-দের গ্রামে এলেন। সঙ্গে বি ডি. ও.।

—রেল কোম্পানী চণ্ডী গাঙ্গোদাসীকে মেডেল দিবে মলিন্দর, তা তোদের বেত্তান্ত তো আমি জানি। বললাম, ওর কেউ নেই তবু মুকাবিলা করে দেওয়া দরকার তাই ইনি এসেছেন।

—সাহসের কাজ, খুব সাহসের কাজ করেছে, সবাই ভাল বলছে মহকুমার। তোমার পরিবার ?

সবাই চুপ করে। সমাজের লোকগুলি এ ওর দিকে চাইল, ঘাড় গলা চুলকে মাটির দিকে চেয়ে কেউ বলল, আজ্ঞা আমাদেরি জাতি।

ভগীরথ অবাক হয়ে গেল। সকলের মুখের দিকে চাইতে লাগল।

চণ্ডীকে ওরা জ্ঞাতি বলল ? চণ্ডীকে ওরা স্বীকার করে নিচ্ছে ?

—তোমাদের সকলের হাতে তো ওর মেডেল দেবে না সরকার।

—আজ্ঞা আমাকে দেন।

ভগীরথ এগিয়ে এল।

—তুই কে ?

—উনি আমার মা।

—বটে, তোর নাম কি—কি করিস···

বি ডি. ও. লিখতে লাগলেন। ভগীরথের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল··· ভগীরথ গলা ঝেড়ে বলল—আজ্ঞা আমার নাম ভগীরথ গঙ্গাপুত্র।

বাপ পূজা মলিন্দরের পুত্র। নিবাস ডোমপাড়া।

মা ঈশ্বর চণ্ডী গঙ্গাদাসী···।

ভগীরথ বংশপরিচয় দিতে লাগল।

সাঁঝ-সকালের মা

বৈশাখের তাতে মাঠের ছাতি ফাটে, সাধন কান্দোরীর মা জটি ঠাকুরনী মরে গেল।

মরে যাবার আগে জটি ঠাকুরনীর পেট গলা ফুলে ঢাক হয়েছিল। বাঁশে দোলা বেঁধে সাধন কান্দোরী মা-কে নিয়ে হাসপাতালে গিয়েছিল।

'মোকে আঁসপাতালে দিস না সাধন। আঁসপাতালে ডোমে লাড়ীভুড়ি টেনে ছিঁড়া করবে বাপ।'

'ডাক্তারে বলে আঁসপাতালে লিয়া করতে।'

'অ বাপ, মোর সাধন বাপ, ডোম দিঞে লাড়ী ছিঁড়া করাস না বাপ!'

'লাড়ী ক্যাও ছিঁড়ে না মা।'

'ছিঁড়ে বাপ! তু কি জানবি বল? দুধের ছেলা তুই। ডোমে লাড়ী ছিঁড়ে, আঁত ছিঁড়ে। ডাক্তারে বুতলে আঁত রেখে দেয় বাপ।'

'কেন গো মা?'

'তু কি জানবি বাপ? দুধের ছেলা তুই। এ মনিষ্য শরীর ই কলিকালে পুড়াবার লয়, গোর-গাড়ার নয়, জানলু?'

'হেই মা! ই কি কথা?'

'হক কথা বাপ! কিন্তু আত্মীয় বন্ধু মনিষ মরলে সামাজ দেয়, চিলুতে উঠায়, লা কি বল?'

'হক কথা।'

'উ ডাক্তার-বদ্যি-ডোম-ধাই সভে শুগুন পানা চিয়ে দেখে।'

'মা।'

'চিয়ে চিয়ে দেখে। তা বাদে য্যাতক্ষণ বেওয়ারিশের মড়া পায় তখন উ-রা ভাগীদার হয় বাপ। ডোমে লাড়ী আঁত ডাক্তারকে দেয়। ধাই কাপড়-জামা ল্যায়। ডোম মড়াটি পচা করিয়ে হাড় বিচে পয়সা ল্যায়।'

'ধ্যুর, তা আমি হতে দিই?'

'দিস না বাপ। আমি তোর সাঁঝ-সকালের মা! মোকে তু আঁসপাতালে মারা করাস না।'

'চুবো যা মা।'

সাধন কান্দোরী ধমক দিয়ে উঠেছিল। জটি ঠাকুরনী ওকে পেটে ধরেছিল এক-

দিন। ওরা বড় প্রাচীন জাতি, জরা-ব্যাধের বংশধর। ওদের সম্প্রদায়ের নাম পাখ-মারা সম্প্রদায়। সেই বংশের মেয়ে জটেশ্বরী সাধনকে পেটে দশ মাস ধরে প্রসব করেছিল।

কেমন করে গর্ভধারিণী মা সাঁঝ-সকালের মা হয়ে গেল সে এক আশ্চর্য বৃত্তান্ত। সাধনের দেড় বছর বয়েস থেকে জটেশ্বরীর ওপর দেবতার ভর। সেই থেকে জটি দিনেমানে জটি ঠাকুরনী। সূর্য ওঠা থেকে সূর্য ডোবা অবধি ঠাকুরনীকে কেউ মা-বউ-বোন ভাবতে নিষেধ। ডাকতে নিষেধ।

সাধনকে জটি নিষেধ করেছিল।

'মা বোলে ডাক্যে না বাপ, বাপো আমার।'

'কখ্নো লয় ?'

'লা বাপো, খুব বিয়েনবেলা, স্যিয্যি না উঠতে মা বলে ডেকে লিবি। স্যিয্যি ডুবতে মা বলে ডাকবি।'

'শুধু সাঁঝে আর সকালে, তাই লয় গো মা ?'

'হ্যাঁ বাপো!'

'সাঝে আর সকালে তু মা। আর দিনেমানে তু ঠাকুরনী ?'

'হ্যা বাপো। আমি তোর সাঁঝ-সকালের মা।'

এই সাঁঝ-সকালের মা জটেশ্বরী কেমন করে যাদবপুরে লাইনের পারে এল, কেমন করে ওর ছেলেকে রিক্সা করে দিল—সে অনেক কথা।

মা ছাড়া সাধন কান্দোরী কিছু জানে না। সাধন নির্বোধ, তিরিশ বছর বয়সেও ওর বুদ্ধিসুদ্ধি অপরিণত। মোষের মত শরীরে ওর পাকস্থলী ছাড়া আর কিছু নেই। ফুসফুস, রক্তজবার পাপড়ির মতো হৃদযন্ত্র, সাপের মতো পিচ্ছিল নাড়ী, ভোরের দোপাটির মতো কুসুমকোমল জীবকোষ, কিছু নেই ওর শরীরে। শুধু একটা পাকস্থলী আছে।

আর আছে খিদে। শুধু খেতে দেবার লোভ দেখিয়ে ওকে দিয়ে ওর মনিবের যুবতী বউ কাঠ চ্যালা করায়, টিউবকলের জল টানায়। মণ মণ কয়লা ভাঙিয়ে নেয়।

মনিবের যুবতী ঘোমটা-টানা সুন্দরী বউ।

'মনিবানীর দিকে চেয়ো না সাধন।'

'লা মা।'

'য্যাখন চাইবি, মাত্তিভাবে দেখবি, জান্নু বাপ।'

'হ্যাঁ মা।'

মা যা বলে সাধন তাতেই হ্যাঁ বলে। মা ওর জগৎ-সংসার, মা ওর চাঁদ-সূর্য।

সেই মা যখন জ্বরে, আমাশায়, পিত্তরসে, কফে ভুগে ভুগে ফুলে গেল, তখন সাধন মনিবকে বলল, 'টাকা দেন মশায়, মোকে টাকা দেন।'

'কেন সাধন ?'

'মোর মা মরে যায় মশায়।'

'কি হয়েছে, অসুখ ?'

'হ্যাঁ মশায়। মা দিনেমানে ছেঁয়া দেখতে লেগেছে, লুন খেয়ে বলে বাতাসা খেলাম। আজ দুপুরে মশায় মা বলে মোকে 'মা' বলে ডাক সাধন।'

'বললে!'

'হ্যাঁ মশায়। ডাক্তার আনা করব আপনি টাকা দেন।'

সাধন কান্দোরীর মনিব ওকে দশটি টাকা হাতে দিয়ে বলল, 'মা-কে চিকিচ্ছে করা সাধন। শত হলে গরভধারিণী।'

'আমার মা মনিষ্যি লয় গো মশায়। মা ঠাকুরনী।'

'তুই ডাক্তার ডাক।'

অনাদি ডাক্তার যাকে চিকিৎসা করে সে-ই মরে যায় বলে কলোনীর লোকেরা ওকে মেরে তাড়িয়েছিল। অনাদি ডাক্তার এখন রেলপারে খালধারে দোকান খুলেছে। বর্তমানে তার প্রচুর পসার। ইদানীং বহু খুনজখমের লাশকে ও মোটা টাকার বিনিময়ে 'ডায়েড অফ হার্ট ফেলিওর' লিখে শ্মশানে পাচার করে। শ্মশানের লোকদেরও আজকাল টাকা দিয়ে কেনা যায় এই যা সুবিধে।

অনাদি ডাক্তারের যে বাড়বাড়ন্ত হবে তা জটি ঠাকুরনী বলেছিল। হয়তো সেই জন্যে, হয়তো বহু ভ্রূণহত্যা, গর্ভপাত. মিথ্যা সার্টিফিকেটের পাপের ভয়ে, ব্রাহ্মণ অনাদি ডাক্তার জটি ঠাকুরনীর পা ধরে তেল-নারকেল-চাল-লবণ দিয়ে প্রণাম করে।

অনাদি ডাক্তার তাই তাড়াতাড়ি জটি ঠাকুরনীকে দেখতে গেল। ভয়ানক দুর্গন্ধ জটির ঘরে। তক্তপোশে টকটকে লাল রংয়ের ময়লা চেলি পরে জটি ঠাকুরনী রূপ-কথার রাক্ষসীর মতো চিৎ হয়ে পড়ে ছিল। পেট ফুলে উঁচু, হাত-পা চিতিয়ে ফেলে রাখা। জটি ঠাকুরনীর চোখে শুধু আশ্চর্য, অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি ছিল। পিচুটিভরা রক্তাভ চোখের দৃষ্টি এত সুন্দর হতে পারে তা অনাদি ডাক্তার জানত না।

অনাদি ডাক্তারের টেবিলে মাঝে মাঝে যে-সব যুবতী মেয়েরা অসহায় বেদনায় শুয়ে থাকে, তাদের চোখের চেয়েও জটি ঠাকুরনীর চোখ সুন্দর। আসন্ন মৃত্যু ছাড়া আর কেউ এমন সৌন্দর্যে মানুষের চোখ রাঙিয়ে দিতে পারে না।

অনাদি থমকে গেল। নাড়ী দেখে, পেট দেখে অনাদির চোখে জল এল।

আহা, জটি ঠাকুরনীর কাছে সে বছরে পাপ স্খালন করতে দু-একবার আসত।

'মা, পাপ হয়ে গেল মা।'

দিনেমানে জটি ঠাকুরনীকে কেউ মা বলত না, ঠাকুরনী বলতে হত। অনাদি আসত রাতের কালোয় মুখ ঢেকে।

'কি পাপ, অ আমার বাপ, কি পাপ ?'

'মেয়েটা মরে গেল মা।'

জটি ঠাকুরনী নিশ্বাস ফেলে বলত 'মহাপাপী ছিল যি উ। তুমি কি জানবে বাপ, উ-র আঁতাটা (আত্মা) লিয়্যে এখন যমদূত ডাঙশমারা করবে। মহাপাপে বাপের মুখে কালি দেয় নাই উ ? ভদ্দর ঘরের মিয়ে তু, তুর এমন বেভ্রম ?'

'কি হবে মা ?'

'এই লাও বাপ। গোসাপের কণ্ঠহাড়টি মাদুলীতে আছে। বালিশের তলে রেখে লিদ যাবে। আর তে-সন্ধে গঙ্গাজল দেবে ঘরে, কেমন ?'

অনাদির মতো পাপী-তাপীদের জন্যে আঁতুড়ের মরাছেলের নখ, গোসাপের কণ্ঠ-হাড়, ধনেশ পাখির তেল'কে সংগ্রহ করবে ? পয়সা নয়, কড়ি নয়, শুধু একপালি চাল নিত জটি ঠাকুরনী। সন্ধ্যে হলে ঠাকুরনী হয়ে যেত সাধনের মা। ঠাকুরনী হয়ে যে চাল পেত, মা হয়ে তার ভাত রেঁধে ওর হাবা ছেলেকে খাওয়াত।

এখন অনাদিকে কে দেখবে ? দুঃখে অনাদির চোখে জল এসে গেল। অনাদি বলল, 'সাধন, হাঁসপাতালে লিয়ে যেয়ে দেখা। ঠাকুরনীর শরীল আমি ভাল বুঝি না।'

অনাদি টাকা দিল। বলল, 'ট্যাক্সি চাপিয়ে লিয়ে যাবি।'

সাধনের মহাপ্রাণী ভয়ে উড়ে গেল। টাকা নিয়ে ও তাড়াতাড়ি মিঠাইয়ের দোকানে গেল। মনের দুঃখে মুড়ি-বাতাসা-গজা কিনে দোকানে বসে বসেই খেল সাধন। ঘটি ঘটি জল খেল।

ট্যাক্সি-ড্রাইভার জটিকে নিল না। বলল, 'মুর্দা হ্যায়। গাড়িমে মর্ যায়গা।'

তখন সাধনের মনিব বাঁশঝাড় থেকে বাঁশ দিল। খাটুলী তৈরি করে জটি ঠাকুরনীকে নিয়ে সাধন বাঙুর হাসপাতালে গেল।

হাসপাতাল বড় অচেনা জায়গা। এত বড় বাড়ি, এত মানুষ-জন, সাধন বলল, 'ভাই বলরাম ! ডরে মোর হাত পা পেটের লাড়ীতে সান্ধায়। ঐ আঁসপাতালে এত দরজা, কিন্তুক কুন পথে ঠাকুরনীকে ভিতরে লিয়্যে যাই তা বল ?'

'তুই এক জেতের মানুষ সাধন।'

বলরাম, জগদীশ আর উদ্ধব ডাক্তারকে ডাকল। জটি ঠাকুরনীকে ওরা ভর্তি

করবেই করবে। ডাক্তার যত বলে 'বুড়ি এখনি মরবে', সাধন তত কাঁন্দে 'ঠাকুরনীকে বাঁচিয়ে দেন গো! ঠাকুরনী বিনে মোর জগত আন্ধার! আহা! ঠাকুরনী যি সাঁঝ হলে মা হয় গো! মোর মাথায় সাদা চুল, তবু মোকে লিয়্যে কত স্বহাগ করে ঠাকুরনী! লিজ্জে না খেয়্যে মোকে খাওয়ায় গো!'

'কি বলছ তুমি? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না তোমার কথা।'

'ডাক্তারবাবু গো!'

সাধন মাথা-কাটা বলির মোষের মতো মাটিতে গড়িয়ে গড়িয়ে ছটফট করতে লাগল।

বলরাম এই কুতঘাটে বিয়ে করেছে। কলোনীর মানুষ ও, ভদ্রলোক দেখে ভয় পায় না। যতদিন বলরাম গরিব ছিল ততদিন ভদ্রলোক দেখে ওর রাগ হত না। তখনো ওর গায়ে ধলেশ্বরীর নদীর শীতলতা, স্বভাবে ধানক্ষেতের নম্র শ্যামলিমা ছিল।

এখন কলোনীতে বাড়ি, নিজের রিক্সা ও বারুইপুরে ধানজমি করবার পর থেকে বলরাম বদলে গিয়েছে। ভদ্রলোক দেখলে, নম্র ব্যবহার পেলে, মিষ্টি কথা শুনলে ওর থুতু ছেটাতে ইচ্ছে করে। বলরাম জানে বর্তমানে এই বাংলা বাপের নয়, দাপের।

বলরাম এগিয়ে এল। কাটা-কাটা কথায় বলল, 'উনি সামান্য মানুষ নয়, জানলেন? উনি দেবাংশী মেয়েছেলে, আমরা ওঁকে মান্য করি, ধর্মপূজোয় ওঁকে ডালা দিই। সিট থাকলে ভর্তি করে নিন না সার। সিট আমার নয়, আপনারও নয়, সর্বসাধারণের, তাই না?'

অবশেষে জটি ঠাকুরনী ভর্তি হল।

সাধনের কান্নাকাটি দেখে ডাক্তারের কষ্ট হয়েছিল। লজ্জা পেয়েছিল ডাক্তার। এতবড় সা-জোয়ান পুরুষকে মায়ের জন্য এমন করে কাঁদতে দেখেনি ডাক্তার।

'ঠাকুরনী বাঁচবে না ডাক্তরবাবু?'

'দেখি সাধন। অস্থির হয়ো না।'

'কুন ওগ উয়ার লাই মশাই! উনি মনিষ্যি নয়, উনি দেবতা গো! ওগ উয়ার কাছে আসতে ডরায়।'

'তা তো বটেই।'

'এই তো উনি দিনেমানে ঠাকুরনী থাকে গো মশায়! সাঁঝে সকালে আমার মা হয়। গঙ্গাজলে চ্যান করলে, আঙা কাপড় পরলে উনি ঠাকুরনী। ত্যাখন আর সভার মতো আমিও উয়াকে মান্য দেই গো!'

'তাই নাকি?'

'কিন্তু মা বুলবার লেগ্যে আমার জীউটা ফাট্যে গো মশায়! তাই! য্যাখন সাঁঝ

হয়, আমি যেয়্যে উয়ার কোলে মাথা রাখব আর মা! মা! মা! বলে সাধ মিটয়্যে ডাকব।'

ডাক্তার অবাক হয়ে সাধনকে দেখছিল। নার্স একটু হেসে বলল, 'তোমার অত-বড় মাথাটা ওঁর কোলে রাখ?'

সাধন গভীর আন্তরিকতায় বলল, 'মাথা আখব, মা বলে ডাকব, তা বাদে কত অঙ্গ করব মোরা! উয়ার দিনেমানে ভক্তজনা আছে। কিন্তুক এতের বেলা আমি বিনা উয়ার ক্যাও নাই।'

'দিনে কি খেত তোমার মা?'

'আমি কি জানি মশায়? এই ধরেন গা, চা খাবে, গাঁজা খাবে, গঙ্গাজল খাবে। দেবাংশী শরীলে কি ভাত-জল চায়?'

'সন্ধ্যেবেলা?'

'ভাত রান্ধবে, মোকে দেবে, লিজে খাবে ত্যাতটুকুন। য্যামন কচিছেলা খায়।'

'সেই জন্যেই রোগটা হয়েছে সাধন।'

'লা গো! ওগ উয়ার লাই। ওগ কি দেবাংশী শরীলে পশে? মোকে মনে হয় ক্যাও বিষ করে বাণমারা করল বুঝি?'

'দেখি, আমরা দেখি।'

'ডাক্তারবাবু!'

'বল?'

সাধন মাটিতে পা খুঁড়ে বলল, 'আপোনাদের ঘরে তো লক্ষ্মী বান্ধা গো। ভাতের পাহাড়, ডালের সাগর। তা উয়ার ভাগের ভাতটা মোকে দিতে পার? উতো এখন খায় না!'

'তা হয় না সাধন।'

ডাক্তার অবাক হয়ে সাধনকে দেখতেই থাকল। মানুষের শরীরে পশুর মত সরল প্রবৃত্তি এমন করে ডাক্তার আর কখনো দেখেনি।

কিন্তু জটি ঠাকুরনীর চিকিৎসা হল না। 'উয়ার কি হয়েছে, বলেন মাশায়,' বলে ডাক্তারের মাথা খেয়ে ফেলল সাধন।

ডাক্তার কি বলবে? জটি ঠাকুরনীকে ওরা গ্লুকোজ দিল, স্যালাইন দিল, গলার নলী শুকিয়ে গিয়েছে বলে নল চালিয়ে পেটে খাবার দিতে চেষ্টা করল। চেষ্টার ত্রুটি হল না।

জটি ঠাকুরনীর অবস্থা ভাল হল না। মাঝে মাঝে যখনি ওর জ্ঞান হয় তখনি ও বলে, 'আঁসপাতালে মোকে এখো না বাপ মোর। মোর সাধন বাপো। উ

ডাক্তার মোর লাড়ী ছিঁড়বে, ডোমগুলান মোর খুলি-হাড় বিচে ফার্সা করবে। মোকে ঘরে লিয়া কর।'

তিনদিনের দিন ডাক্তার জটির রোগ ধরতে পারল। জটির রোগ বড় ছোঁয়াচে। আজও ভারতভূমিতে তার চিকিৎসা বেরোয়নি কোন। এ রোগের নাম অনাহার। না খেয়ে না খেয়ে, খুদকুঁড়ো সাধনকে খাইয়ে জটি ঠাকুরনীর নাড়ী শুকিয়ে গিয়েছিল।

'এ দেব-রোগ সাধন, এর চিকিৎসা আমি জানি না।'

ডাক্তার একটু ঠাট্টা করল।

'তবে লিয়্যে যাই?'

'নিয়ে যা।'

জটি ঠাকুরনীও চোখ চেয়ে বলল, 'আরে মড়া, আরে বোকা সাধন! মোর জন্মবিত্তান্ত তু জানিস না? জানিস না আমি কুন সামাজের মিয়ে? মোকে ঘরে লে, ঘরে আমি শরীল রাখব।'

বলরাম, জগদীশ, সাধন, আরো পাঁচজন সমারোহ করে জটি ঠাকুরনীকে ঘরে নিয়ে এল। জটির ঘরের সামনে একটা নিমগাছ। তার ছায়াতে জটিকে শোয়ানো হল।

'নিমগাছের ছায়া ভাল সাধন। আমরা পাঁচজন আছি। তুই যেয়ে ওনার কাছে বস গা।' বলরামের কথায় সাধন গিয়ে জটি ঠাকুরনীর কাছে বসল।

'একোজনা বামুন ডাক গো!'

'আছে, বামুন আছে।'

'কে গো?'

'অনাদি ডাক্তার।'

'উনিকে ডাক। ঠাকুরনীর কাছে বসাও।'

অনাদি ডাক্তার জটি ঠাকুরনীর কাছে বসল। সাধন অভিভূত কাতর।

'কথা বুলে যাও গো কিছু, ও আমার সাঁঝ-সকালের মা!'

'বুলব।'

জটি এখন শেষ সময়ে চেতনা ফিরে পেয়েছে।

'বুল গো!

'তোমার বাপ কান্দোরী। তোমরা জেতে বেদিয়া। বনে ঘুর, বাদাড়ে ঘুর, আর আশ্চাজ্জা চিকনপাটি বুন।'

'তুমি?'

'আমি ?'

এখন আকাশে সূর্য, বেলা এখন দশটা। জটি যখন ভাল ছিল এই সময়ে ও ঠাকুরনী হয়ে ঘরে বসে থাকত, মানুষজনের পুজো নিত। এখন সাধনের খুব ইচ্ছে মা হয়ে যায় জটি, বলে—সাধন আমার কাছে আয়।

জটিরও ইচ্ছে হল সাধনকে কাছে ডাকে। বলে অ সাধন, কাছে আয়।

জটি তা বলতে পারত। জটি তা বলল না। এখন তার চারপাশে কত ভক্ত, কত মানুষ। এরা ওর কাছে আসে, প্রণাম করে, সম্মান জানায়। ওরাই তো বছরভোর নিত্য চাল যুগিয়ে যুগিয়ে সাধনকে বাঁচিয়ে রাখে। নিজের ইচ্ছেয় জটি একদিন ঠাকুরনী হয়েছিল। আজ ওকে ঠাকুরনী হয়েই মরে যেতে হবে।

'তুমি কে গো ?'

সাধন সরল ভক্তিতে জিগ্যেস করল। মা কে ? জটি কে ? সাধনের বাবা যদি কান্দোরী হয়, জটি কি অন্য সমাজের মেয়ে ? সাধন, বলরাম, জগদীশ সবাই কাছে ঘিরে ঘন হয়ে এল।

'তুমরা ছুট নও বাপো ! তুমরা জেতে বড়, অ্যানেক বড।'

'তুমি ?'

'আমাদের বেত্তান্ত বড় আশ্চাজ্জ গো ! মোর আদি পুরুষ সেই জারা ব্যাধ। নাম জান ?'

'জরা ব্যাধ ?'

'মোরা বলি জারা ব্যাধ। মোদের জিহ্বায় তুমাদের সাড় লাই ডাক্তার।'

'ঘোর বিকার।'

অনাদি ডাক্তার সভয়ে বলল। এমন বিকারের রুগীকে হাসপাতাল ছেড়ে দিল কেন ? এমন রুগীকে ঘিরে এত মানুষের ভিড় কেন ? জরা ব্যাধ তো মহাভারতের মতই পুরনো, গল্প-কথা।

'বিকার লয় ডাক্তার। মোর কথা সত্যি লা মিছা তা বলতে লারব। শুনেছি...'

জটি এক আশ্চর্য কথা বলতে লাগল।

'কুন দেশে য্যান সাগর, কুথায় য্যান দ্বারকাপুরী। জারা ব্যাধ সি দেশে যেঞে বাণমারা করেছিল।'

'কাকে ?'

'কিষ্ণকে। পুঁথি পড় নাই ?'

'সবাই জানে।'

'ই তো পাপের রাজা মাহাপাপ! ভগমানকে বাণমারা করে ই হতে বড় পাপ লাই। সি বাদে জারার বংশ সি দেশ তেগে ই দেশে এল।'

'কোথায় ?'

'হিজলী—কাঁথি—তমলুক—মেদিনীপুরে।'

'তারপর ?'

'মোদের সামাজ বড় ছোট। মোরা শ্মশানে-মশানে ঘুরি, সাপ ধরি, শ্মশানের কলসীতে জল খাই।'

'ছি!'

'মোরা পাখপক্ষী ধরি, মোদের বলে পাখমারা।'

'পাখমারা কোন জাতি গো? নাম তো শুনিনি।'

মোদের আনসামাজে সাঙা হয় না। কিন্তুক আমার মন যেয়ে উ সাধনের বাপে বসল। সামাজে কথা হত, তাই মোরা চলে যেয়ে সাঙা করি গো।'

জটি গুছিয়ে বলতে পারল না। প্রথম বিয়ের নাম বিয়ে। দ্বিতীয় বিয়ের নাম সাঙা। পাখমারাদের জাত ধর্ম অনুযায়ী জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিটি মেয়ের সঙ্গে ওদের দেবতার বিয়ে হয়। আগে দেবতাকে জল-নারকেল দিয়ে তবে ওরা মানুষের ঘর করতে আসে।

'তারপর, অ্যানেক, অ্যানেক দিন বাদে আমি ঠাকুরনী হলাম গো। আমার 'পরে সাঁজ-সকালে দেবতার ভর।'

'জটি ঠাকুরনী, জল খাবে, জল ?'

'না বাপো সকল। এখন আমি মাহানন্দে স্বর্গে যাব। কিন্তুক সাধন…'

জটি হেঁচকি তুলল।

'কি ? মোকে কি বল তুমি ?'

'আমি ঠাকুরনী হয়্যেছিলাম। দেখ, মাথার 'পরে সূর্য।'

'এখন দিনমান।'

'তুর মা লয় সাধন, ঠাকুরনী স্বর্গে যায়। তুকে অ্যানেক দেব্য দিতে হবে যি।'

'কি দেব্য ?'

সকলের মনে মহা কৌতূহল। সাধনের মাটির উঠোনে পাড়া-পড়শীর ভিড়। যেন এক অন্ত্যজ, গরিব, হতভাগিনী মারা যাচ্ছে না, যেন কোন মহামানী দামী মানুষ মারা যাচ্ছে তাই এত ভিড়।

সবাই চুপ করল। নিশ্বাস টানল। কি চাইবে তাদের জটি ঠাকুরনী শেষ সময়ে।

'সাঁঝে মরতাম বিয়েনে মরতাম, তুর কানাকড়ি লাগত না। এ্যাখুন তু মোকে হাতী দিবি। ছরাদে হাতী দিবি।'

'কিরে কাড়লাম।'

শোকে দুঃখে পাগল, ঘটনার অস্বাভাবিকতায় হতবুদ্ধি সাধন বলল, 'সভে শুন, উনির ছরাদে আমি হাতী দান করব।'

'ঘো…ঘো…ঘো…ঘোড়া দিবি।'

'দিব।'

'অন্ন-বস্ত্র-ভুঁই-সোনা-উপো অযচ্ছল দিবি।'

'দিব।'

সাধন ডুকুরে কেঁদে উঠল, 'সব দিব গো! তুমি মোরে ছেড়ে যেয়ে না। মোর ক্যাও লাই!'

'তুর বো…বো…বো…'

জটির গলায় কথা আটকে গেল। সাধনের যে বউটা পালিয়ে গিয়ে বাপের বাড়ি আছে তাকে নিয়ে আসবার কথাটা জটি বলে যেতে পারল না। তার আগেই ওর মাথা টলে পড়ল।

কোরা কাপড়ে সাজিয়ে, ফুলচন্দনে মুড়ে, ঢাকঢোল বাজিয়ে ওরা জটি ঠাকুরনীকে পোড়াতে গেল। সব খরচ অনাদি ডাক্তার দিল। জটির মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে অনাদি ডাক্তারের প্রথমেই মনে হল, যাক্, আর নিত্য নিত্য চাল দেবার দায়-দায়িত্ব রইল না। চালের দাম যখন তালগাছের মাথায় ওঠে তখনো অনাদি জটি ঠাকুরনীকে চাল দিয়ে পেন্নাম করতে যেত। অনাদির বউ বড় রাগ করত, বলত, 'দেবাংশী মানুষ, কিন্তু ভক্তজনের কষ্ট হয়, তা বোঝে না?'

বড় দুঃখ হল অনাদির। বলরামের হাতে টাকা গুঁজে দিয়ে অনাদি বলল, 'তোরা যা খাবি খাস। কিন্তু ঠাকুরনীকে চন্নন কাঠে পোড়াবি। হ্যাঁ, কাঠ শুঁকে নিবি। ফুল দিস, খই ছেটাস, পয়সা ছেটাস, কেমন? তোর বোনাইয়ের না কেত্তন দল ছিল?'

জটির মৃত্যু এখন বলরামদের কাছে একটা অলৌকিক ব্যাপার। মরণকালে, ঘোর বিকারে জ্বরাচ্ছন্ন মাথায় জটি যা যা বলেছে সব কিছু এখন বলরামদের কাছে দৈববাণী। তাই বলরাম বলল, 'না আইলে মাথা ছিঁড়িয়া ফালামু।'

কচিৎ বলরাম এ ধরনের কথা বলে। এই কথা শুনেই ওর ভগ্নীপতি এসে হাজির হল। নামে সদানন্দ, স্বভাবেও তাই। সরকারী আপিসে পিওন ও।

'গুলি মার চাকরিতে। ক্যাজুয়াল লীভ নাই? কামাই করলে কখনো সরকারী

আপিসে কাজ যায় না।’

এই কথা বলে ও কোমরে গামছা বাঁধল। মাথার চুল আঁচড়ে, গলায় কাগজের বনমালা পরে সদানন্দ আর ওর সেথোরা ‘হরিনাম অঙ্গে লিখে হরিপদে যাঁও’ গাইতে গাইতে জটি ঠাকুরনীকে নিয়ে চলে গেল।

॥ ২ ॥

সাধনের সাঁঝ-সকালের মা কেমন করে মানবী থেকে দেবী হল সে বড় আশ্চর্য কথা।

ওরা মেদিনীপুরের পাখমারা, ওরা যাযাবর। ওরা বলে ওরা জরা ব্যাধের বংশধর। ঈশ্বরকে হত্যা করেছিল বলে ওরা অভিশপ্ত। সুদূর দ্বারকা থেকে ওদের চলে আসতে হয়েছিল।

ওদের ঘর থাকতে নেই। ওরা পাখি ধরে, পাখি বেচে। শ্মশানের গাছে রান্নার হাঁড়ি টাঙিয়ে রেখে ওরা সংসার করে। শবশয্যায় ওদের বর-বউ অবহেলে ঘুমোয়, ভালবাসে। চিতার আগুন দেখে ওদের মনে দেহতত্ত্ব জাগে না। মা ছেলেকে সোহাগ করে, স্বামী-স্ত্রী বসে গান গায়।

মেদিনীপুরে লবণ খালাড়িতে, কাজুবাদামের বাগানে, দক্ষিণ ভারতের এমন অনেক লোক আসে, যায়, কাজ করে।

ওদের সমাজের বাইরে বিয়ে করতে নেই। কিন্তু জটির শরীরে আশ্চর্য রূপ ছিল। তামাটে রং, নীল চোখ, কটা চুল। চুল চুড়ো করে বেঁধে জটি তাতে লাল পাথরের মালা জড়াত। বড় ভাল লাগত জটির নদীর জলে মুখ দেখতে, গাঢ় নীল কাপড় পরে নিজের শরীরটি সাজাতে।

শীতকালে জটিরা তখন সুবর্ণরেখার চরে। চরের বালিতে তখন যাযাবর পাখিদের ভিড়। শরবনে ফাঁদ পেতে জটি শিস দিয়ে দিয়ে পাখি ধরত।

সেখানেই একদিন উৎসবের সঙ্গে ওর দেখা। উৎসব জাতিতে কান্দোরী। ওর জাতব্যবসা চিকনপাটি বোনা। উৎসবের তখন বছর তিরিশ বয়স। বেঁটে, বলিষ্ঠ, শ্যামল চেহারা। কাঁধ অবধি বাবরী চুল। উৎসব গান বাঁধত, গান গাইত।

জটিকে দেখে ও গান বেঁধেছিল

‘ও নীল শাড়ি, আণ্ডা মেয়ে
দেখ্ চেয়ে
তোর লেগে মোর পরাণ জ্বলে যায়॥’

জটির হাতে তখন জালে জড়ানো নীলকণ্ঠ পাখিটা ছটফট করছিল।

জটি ওর সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। পিচ কেটে বলেছিল, 'পরাণ জ্বলে যায়! খালভরার গান শুন। দিলে তো মোর পাখিগুলান্ উড়ায়ে?'

'ও পাখি ধরে কি হবে সখী
মোর প্রাণপাখি
এনে ফেলে দিব তোর পায়ে
হা তোর লেগে মোর পরাণ জ্বলে যায়॥'

উৎসব গেয়ে উঠেছিল।

খুব মজা লাগছিল ওর। ওদের সমাজের মেয়েগুলো তো এমন বন্য হয় না! এমন করে চোখ টানে না! মেয়েটার চোখ, ঠোঁট, নাক যেন পাথর কেটে বের করা।

'খালভরা!'

জটি গাল দিয়ে চলতে শুরু করেছিল। উৎসব লাফিয়ে গিয়ে ওর হাত ধরেছিল।

'তু আমায় গাল দিলি কেন?'

'তু গান বাঁধলি কেন? আমার পাখি উড়ালি?'

উৎসব হা হা করে হেসেছিল। তারপর অতর্কিতে ওর হাত থেকে জালটা কেড়ে নিয়ে নীলকণ্ঠ পাখিটাকে ছেড়ে দিয়েছিল। হতচকিত, ক্রুদ্ধ জটির ওপর জালটা ফেলে দিয়ে বলেছিল, 'তু আমার পাখি। পালাবি? তু আমার প্রাণপাখি।'

জটি কাঁদতে শুরু করেছিল। তারপর জাল ফেলে দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল জটি। উৎসবের হাসি ওকে অনেকক্ষণ তাড়া করেছিল।

পরদিন উৎসব চলে এসেছিল ওদের ডেরায়। জটির ঠাকুমাকে গড় করে বলেছিল, 'টুকো ওষুদ দেন দেখি। বনেবাদাড়ে ঘুরি, বুকে আমার বেথা করে গো। আপোনারা তো গুণী মানুষ, ওষুদের কারবারী, তা টুকো ওষুদ দেন।'

জটি ফোঁস করে বলেছিল, 'উ খালভরাকে পেটন ওষুদ দিলে ভাল। উ মোর পাখি উড়ায়্য দিল, তা জানু?'

জটির ঠাকুমা হেসেছিল। জটিকে গাল দিয়ে বলেছিল নিজের কাজে যেতে। এ সমাজের ছেলেমেয়েকে বাইরের দিকে চাইতে নেই, নিজের সমাজে থাকতে হয়। জটির চনমনে ভাব দেখে ঠাকুমার ভয় হয়েছিল।

উৎসব ওদের ডেরায় আর আসেনি। জটির পেছন পেছন ঘুরে ঘুরে ও জটিকে নতুন নতুন অচেনা সব স্বপ্ন দেখিয়েছিল।

ঘরের স্বপ্ন, মাচায় ধানের ডোল, বেতের দোলায় শিশু-সন্তান। সে ঘরে জটি

আয়নায় মুখ দেখে, রূপোর গয়না পরে, লাল-নীল নানা রঙের শাড়ি সে ঘরের উঠোনে মেলা থাকে।

চিকনপাটির চেয়েও মনোহারী নকশায় স্বপ্নটার জাল বুনে বুনে উৎসব জটির ওপর জালটা ফেলে দিয়েছিল।

জটি আর জাল ফেলে পালায়নি।

ওরা পালিয়ে গিয়েছিল।

খড়্গপুর থেকে দীঘা। কাজুবাদামের মরশুমে দিনমজুর, মাছের মরশুমে মাছ শুঁটকি করার কাজ।

অনেকদূর না পালালে কাওয়ামারারা অভিশপ্তদের সমাজ ছেড়ে যাবার অপরাধে ওদের তীর ফুঁড়ে ফেলত।

উৎসব স্বপ্নটাকে ঠিক সত্যি করতে পারেনি। কিন্তু জটি বড় সুখী হয়েছিল। কি জীবন! শুধু তুটি তুটি রাঁধ আর খাও আর ভালবাস। হাতে টাকা পেলে কাপড় কেন। কুঁচের মালা, গালার চুড়ি, রুপোদস্তার গোটা। অন্যরকম করে চুল বাঁধ, অন্য ছাঁদে কাপড় পর। এখন তো আর তুমি কাওয়ামারা নও। এখন তুমি জাতে উঠেছ, শ্রেণী বদলিয়েছ।

'মোদের জাত ফেলনা লয় জটি! মোরা পণ দিয়ে মেয়ে লিই, সমাজকে ভাত-খাসী দিই।'

'উ কথা থাক!'

জটি সভয়ে বলত, ওর শুধু মনে হত এই ঘর, এই ভালবাসা থাকলে হয়! চির-অভিশপ্ত ওরা, ঈশ্বরকে যারা হত্যা করে গোড়ালিতে বাণ মেরে, তাদের বুঝি ঘুরে ঘুরেই জীবন শেষ করতে হয়।

জটি তো তা করেনি!

যদি সেই রাগে ঠাকুমা বাণ মারে! মা জটি আর উৎসবের খড়ের পুতুল তৈরি করে শলা দিয়ে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে!

বড় ভয় পেত জটি, গুন গুন করে বলত, 'উদের কথা রাখ দেখি, মোর সাথে আন কথা বল।'

'তু ডর খাস?'

'খালভরা!'

মৃদুস্বরে বলত জটি। পেছন ফিরে চুল বাঁধতে বসত। একেই কি বলে জাত হারানো, নিচু থেকে উঁচুতে ওঠা? কই, গলায় তো জোর খুঁজে পেত না জটি! বলতে তো পারত না 'মর গা যা!'

মাঝে মাঝে শুধু ডুম-ডুম, ডুম-ডুম ঢোলের শব্দ শুনলে জটি চমকে উঠত।

পাখমারাঁরা অমনি করে ঢোলে নরম চাঁটি মারতে মারতে আসে। দল বেঁধে ঘোরে ওরা, মৌমাছিদের মত এক জায়গায় চাক বেঁধে থাকে।

ঐ একসঙ্গে থাকাটা ওদের কাছে সবচেয়ে বড় জিনিস।

ওরা তো সামান্য নয়, ওরা যে জরা ব্যাধের বংশধর। ব্যাধ তো সামান্য নয়, সে যাঁকে মেরেছিল তিনি যে স্বয়ং কৃষ্ণ ভগবান। গাঁই-জ্ঞেয়াতি-সকল মানুষ এত পাপ করেছিল, এত শাস্তি পাচ্ছিল যে মনের দুঃখে কৃষ্ণভগবান নির্জনে গিয়ে দুটো দণ্ড জিরোচ্ছিলেন। রাঙা টকটক পদ্মফুলের মত পা।

'আঙা টকটকে, পদ্মফুলের মত পা!' জটির ঠ.কুমা মাথা নেড়ে নেড়ে বলত, 'সি শরঝোপ হতে দেখে উয়ার বুদ্ধি হরে গেল যেমন! দিলে টং করে বাণ মেরে! বাস! অমনে কি হল জান?'

আকাশ অন্ধকার হল, সূর্য মুখ ঢাকল। সমুদ্র মনের দুঃখে জলের প্রাণীগুলিকে উগরে দিল। মাছের ডোঁঙা মারা পড়ে যারা জলের নিচে গেছে তারা অবধি প্রাণ পেয়ে কেঁদে উঠল। গোয়ালারা গাই দুইতে গিয়ে দেখে দুধের বদলে রক্ত পড়ছে। ফটফটে সকাল। কিন্তু রাতের মত কালো আকাশে তারা জলতে লাগল।

তখনি সেই দৈববাণী হল।

ভগবানকে যারা মারে তাদের ঘরদোর থাকতে নেই। তাই দৈববাণী বললে, 'জারা হে জারা! ব্যাধ হে ব্যাধ! ই ভোবনে ভগবান বার বার আসে। তুমার মত একেকটা কসাই ভগবানকে বাণফুঁড়া করে। যারা ই কাজ করে, তাদের ঘরে থাকতে মানা। তুমি এখন তোমার আঁতের লোক, গাঁতের লোক লিয়ে বে-উদ্দিশা হও গা। জানলে?'

'কুথা যাই?'

'যেদিকে দু'চক্ষু যায়।'

'সামাজ লিয়ে যাব?'

'সামাজ লিয়ে যাবে লয় তো কি থুয়ে যাবে? তোমার সামাজ এখুন মাহাপাপীর সামাজ। উ সামাজে যে ছেলেমেয়েরা বিয়া দিবে তার মরণ। তা দেখ বিয়াসাদী যা হবে নিজেদের সামাজে। সামাজ ছেড় না। আর দেখ, জারা হে জারা! ব্যাধ হে ব্যাধ! মোর কণ্ঠ কানে যায়?'

'যায়।'

'আর দেখ, তুমার সামাজের প্রতিটি ছেলা বল, মেয়া বল, যেন সামাজ না ছাড়ে। তুমার পাপে উরাও তো পাপী, তাই। জন্মকালে উদের সাথে দেবতার

বিয়া দিবে।'

'দিব।'

জরা কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল। আহা! দ্বারকা ছেড়ে যেতে কে চায় গো! কি সুন্দর দ্বারকাপুরী! নীল সমুদ্রের তীরে কি সুন্দর সোনার চুড়ো দেওয়া ঘর-দোর। জরা অবশ্য বনেবাদাড়ে থাকে, দূর থেকে দেখে, কিন্তু পরের সুখ, পরের রমরমা, দেখেই কি সুখ কম?

তারপর কি জরার কম শাস্তি হয়েছিল? গাঁতের লোক আঁতের লোক, পোঁটলাপুঁটলি, শিকারী কুকুর, সব নিয়ে কি কম ঘুরতে হয়েছিল?

কোথায় সত্যপুত্র, কোথায় কেবলপুত্র, কোথায় চোল, কোথায় পাণ্ড্য, শুধু ঘুরে ঘুরেই মরল জরা। ঠাঁই আর পেল না।

'হ্যাঁ! ভগবানকে বাণমারা করে এলেন মোদের দেশকে সর্বনাশ করতে। ওরে আমার চালাক শিয়াল! দ্বারকাপুরী শ্মশান করেছ, এখন আমাদের মারবে?'

জরা জায়গা আর পায় না। থিতোতে আর পারে না। এদিকে ওপরে বসে দেবাদিদেব নিশ্বাস ফেলেন। দ্বাপর যুগ যায়, কলি যুগ আসে। ঘুরে-ঘুরে জরার বয়েস হল অযুত নিযুত। পায়ে গোদ হল। অঙ্গে ব্যথা। কে যেন একদিন দয়া করে বললে, 'রাঢ় জান? বঙ্গ জান? গৌড় জান? যাও! গঙ্গা যেখানে সাগরে মিশে, সেই দেশে যাও। সে দেশে সকল পাপী-তাপী-লোভী-তঞ্চক-শয়তান আশ্রয় পায়। সে দেশ কারেও ফিরায় না। সেই দেশে যাও তুমি।'

জরা এই দেশে এল।

সমাজের মধ্যে বিয়ে, শ্মশানের শয্যায় ফুলশয্যা, শ্মশানের কলসীতে বউ ভাত রাঁধে, গাঁই-জ্ঞেয়াতির পাতে দেয়। খুব স্বাধীন ওদের মেয়েরা পুরুষরা। ওদের মেয়েদের রূপের শেষ নেই। তামাটে চুল চুড়ো করে বেঁধে ওরা পলাকাটির মালা দিয়ে জড়ায়। ওদের চেহারায় পাথরের মূর্তির মত স্বচ্ছ সৌন্দর্য। বহু পুরুষ ওরা কুল ভাঙেনি। স্বজাতে বিয়ে করেছে। রক্তের পবিত্রতা ওদের মহাপ্রাচীন। তাই ওদের চেহারা এত সুন্দর।

কমতে কমতে, মরতে মরতে, এখন ওরা মাত্রই শ'খানেক জন আছে। কখনো ওরা দল ছেড়ে সরে যায় না।

শহরের রাস্তা ধরে, গ্রামের পথ ধরে ওরা চলে যায়, ডুম-ডুম-ডুম-ডুম ঢোলক-বাদ্য বাজিয়ে।

পাখমারা যায়! পাখমারা যায়!

শহরে ওরা পারতপক্ষে আসে না।

মাঝে মাঝে, বছরে একবার দু'বার, ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার আপিসে ওরা নাম লেখাতে আসে। কেউ মরে গেলে নাম লিখিয়ে রেখে যায়।

সরকারী খাতায় ওরা বুঝি সংরক্ষিত উপজাতি।

জটি তাই, এক কানে, আধেক মনে উৎসবের কথা শুনত। আরেক কানে, আধেক মনে বাজনা শুনত ডুম-ডুম-ডুম-ডুম।

ওরা যদি আসে?

মা-বাবা, পিতামহী, গাঁই-গাঁতের মানুষ?

যদি বলে, 'চল মোদের সঙ্গে? বনে চল, সামাজে। ফিরে চল?'

জটি কি করবে?

উৎসব ওর ভয় দেখে হাসত। গান বাঁধত।

'ওরে তোর মিছে ভয়।
পিরীতের ফাঁদে ধরা দিতে কেন এত ভয়!'

জটি বলত, 'থালভরা!'

উৎসব বলত, 'আমার জান থাকতে তোকে ল্যায় কে? তোর উ বুনো বেটারা? তারা উৎসবকে চিনে? একবার দারোগাকে বলা করালে সব বেটাকে শায়েস্তা করে ছেড়ে দিবে।'

তবু জটির ভয় যেত না। কিন্তু ক্রমে ক্রমে, উৎসব ওকে অনেক ভয় ভুলিয়ে দিল। জটির কোলে এল এই মোটাসোটা, একমাথা চুল এক কালোকোলো ছেলে। দেখে আর বলে দিতে হয় না এ ছেলে উৎসবের। বাপের মুখ যেন অবিকল বসানো। শুধু চোখ দুটি মায়ের মত। স্বচ্ছ, নীলাভ, টলটলে।

জাতে ওঠার আকাঙ্ক্ষা খুব বেড়ে গেল উৎসবের। জটিকে তো ও নিজের জাতে তুলেছিল। উৎসব মনে মনে জানে সে চিকনপাটি বোনে, সে পাথমারা-পাথধরাদের চেয়ে জাতে উঁচু। আবার এই যে এখন মজুর খাটা—এও আরেক ধাপ জাতে ওঠা।

ছেলের বাপ হয়ে উৎসবের মনে হল সে আরো উঠতে চায় জাতে। সে আর গরীব-গুরবোর বৃহৎ সমাজে থাকতে চায় না। ভদ্রলোকের ছোট্ট সমাজের এক কোনায় আসন পেতে চায়।

জটিকেও উৎসব তাই-ই বলল।

'জটি লো জটি, জটেশ্বরী! বিডিও আপিসে যেয়েছিলাম, তা বি-ডি-ও বাবুরা কি বললে জানিস?'

'কি?'

'একুন আর কুন বাধা নাই। আমি টাকা খর্চ করে কাছারীতে যেয়ে একুনি নাম পালটাতে পারি। কান্দোরী-মান্দোরী যে শুনে সেই বুঝে জেতে মোরা ছোট গো!'

'নাম পালটাবি?'

'কেন লয়? উৎসব কান্দোরী কেমন শুনতে? উৎসব দাশ, সাধনচন্দ্র দাশ কেমন শুনতে? তা বাদে অন্য কাজ লিয়ে বড় শওরে চলে যাস যদি, তাহলে তো কাজ সারা!'

'কেন?'

'বড় শওর জগন্নাথের ছিক্ষেত্তর। সেথা ক্যাও কারো খোঁজ ল্যায় না। নাম দেখলে চিন্তা করবে এ বেটা লিশ্চয় জেতে উঁচু, লইলে নামের পিছে দাশ কেন?'

উৎসবের কথা শুনতে শুনতে হঠাৎ আনন্দ হয়েছিল জটির। কোমরে হাত দিয়ে ও নাচতে শুরু করেছিল। 'চল, চল, তাই চল। এখুনি যেয়ে জেতে উঠি।'

উৎসব সস্নেহে বলেছিল, 'পাগলী! এখন কি? ছেলার বয়েস হোক! মুখে অন্নপ্রসাদ দেই! দেব-ঠাঁইয়ে পুজো পাঠাই!'

জটির একবার মনে হয়েছিল যার পূর্বপুরুষ একবার ভগবানকে হত্যা করে, সে কি নিজের সমাজের নির্দিষ্ট দেবতা ছাড়া অন্য কাউকে পুজো করতে পারে? যদি পাপ হয়? যদি ক্ষতি হয়?

তারপর মনে হয়েছিল উৎসব ঠিকই বলেছে। সব ছেড়ে পালিয়ে গেলো, সরকারের কাছারীতে লিখে-পড়ে জাত পালটালে তাহলে আর ওর মা-ঠাকুম ওকে ধরতে ছুঁতে পারবে না।

'তাই ভাল!' জটি চোখ বুজে বলেছিল।

পাখমারাদের পূর্বপুরুষ জরা ব্যাধকে যে দেবতা দৈববাণী করেছিলেন, তিনি হেসেছিলেন?

হল, সাধনের মুখপ্রসাদ হল। উৎসব তখন খড়্গপুর স্টেশনে মোট বয়। কুলীদের সমাজকেও ও ভাত-খাসী দিল। তারপর চোরাই বিক্রির চোলাই মদ খেয়ে বমি করে হাসপাতালে মরে গেল।

নিজের দেখানো স্বপ্ন, প্রাণভরা ভালবাসা, কণ্ঠভরা গান, সব নিয়ে চলে গেল উৎসব। জটি আবার একা। জটি এখন স্বাধীন। জটি এখন ইচ্ছে করলে যেখানে মন চায়, চলে যেতে পারে। কিন্তু দোলায় শুয়ে ঐ যে ছেলেটা কাঁদে আর মিটিমিটি চায়?

জটি বুঝতে পারল এখন ওকে কি করতে হবে। চলে যেতে হবে ওদের

সমাজে। পা ধরে কাঁদতে হবে পিতামহীর। জটি তো জানে উৎসব মরেছে পিতামহীর বাণে। ডাক্তার যা বলুক আর পুলিস যা বলুক!

ভয়-পাওয়া পাখির মত ছেলেকে বুকে নিয়ে জটি চলে গেল ওদের সমাজে।

হা ভগবান! কোথায় ওদের গাঁই-জ্ঞেয়াতি-আঁতের মানুষ? কোথায় সেই বিচিত্রবর্ণের পোশাক, কুকুর-ছাগল গাধার পিঠে জিনিসের বোঝা, পিতামহীর খলখল হাসি?

শ্মশানে নেই, মশানে নেই, কোথাও নেই ওরা। জটি ছুটে ছুটে শহরের ট্রাইবাল বোর্ডের আপিসে গেল।

'পাখমারাদের ঠিকানা দেন মহাশয়, আপোনার ব্যাংত্যতা করি', জটি পিওনের পা ধরতে গেল।

'শ্মশান-মশানে দেখ্‌গা যা! কোথা যেয়ে পড়ে আছে দেখ্‌গা!'

জটির চোখ ফেটে জল এল। এ সমাজ ছেড়ে ও সমাজে, এ জাত ছেড়ে ও জাত, কত লোভ দেখিয়ে উৎসব তো সব স্বপ্ন কেড়েকুড়ে নিয়ে চলে গেল।

জটি এখন কি করে?

অনেক রূপ, অনেক স্বাস্থ্য, অনেক যৌবন নিয়ে জটি গিয়ে স্টেশনে বসল। কোলের কাছে ছেলে। জটি গালে হাত দিয়ে আকাশ-পাতাল ভাবে আর ভাবে।

জটি ভাবে ওর ছেলের কথা। আর পাঁচজন ভাবতে শুরু করল জটির কথা।

জটি এখন কি করে, কোথায় যায়? জটি গিয়ে কুলী লাইনের হনুমানতলার সন্নেসীর কাছে পবামর্শ চাইল।

'এখানে থাক্।'

সন্নেসী চোখ বুজেই বলল। প্রৌঢ় সন্নেসী। অনেক ঠাকুর-দেবতার পর এই হনুমানজীকে আঁকড়ে আছে বলে এখন ওর অবস্থা ফিরেছে খানিকটা।

জটি এসে এখানে বসবার সঙ্গে সঙ্গে হনুমানতলার ভিড বাড়তে লাগল। সন্নেসী মনে মনে প্রমাদ গনল।

কয়েকদিন বাদে তিন-চারজন লোক জটির কাছে এল। বলল, 'ঐ বুড়োর আশ্রয়ে থেকে কি হবে? চল্ আমাদের সঙ্গে। আমরা তোকে শহর দেখাব।'

মিছেমিছি জটি শিরায় শিরায় বহু বছরের প্রাচীন রক্ত বয়ে বেড়ায়নি। বন-জঙ্গল, বনের প্রাণী তার যেমন চেনা, অচেনা মানুষে তেমনি ভয় ওর।

'দূর হ, খালভরা', বলে জটি ওদের গালাগালি করেছিল।

হয়তো তারাই গিয়ে নালিশ করে থাকবে।

কয়েকদিন বাদে পুলিস এসে সন্নেসীকে শাসিয়ে গেল কড়া গলায়। বলল, 'সব

খবর পাওয়া গেছে।'

'খবর, খবর কি পাবেন বাবামশায়? আমি সন্নেসী মানুষ। ঠাকুর নিয়ে পড়ে থাকি।'

'ঠাকুর নিয়ে পড়ে থাক না ঠাকুরনী নিয়ে?'

'ছি ছি, মুখ পচে যাবে তোমার...।'

'এখানে মেয়েছেলে রাখ। এখানে বজ্জাতি, বদমায়েসী হয়। মদ চোলাই হয়, তাসের জুয়া খেলা হয়।'

'সব ঝুট।'

সন্নেসীর ফর্সা মুখ টকটকে লাল হয়ে গিয়েছিল।

পুলিসের লোকটি গেরস্ত মানুষ। সে বলেছিল, 'কথা যে মিছে তা তুমিও জানছ, আমিও জানছি। ঐ মেয়েটার জন্যে যত গোলমাল! তা ওকে কেন সরিয়ে দাও না?'

'সরিয়ে দিলে তো ওদের খপ্পরে যাবে। ওরা তো তাই চায়।'

'তবে মরগা যা!'

পুলিসের লোক রেগে চলে গিয়েছিল। যাবার সময় বলেছিল, 'কেন ওসব গুণ্ডা বজ্জাতকে চটাচ্ছ? গুড় যতক্ষণ রেখেছ, ততক্ষণ মাছি আসবে। ও মেয়েটা যতক্ষণ আছে ততক্ষণ মানুষ আসবে এখানে। ওদের তো রাজত্ব এখন। এসে যদি মেয়েটাকে টেনে নিয়ে যায় তখন কোন বাপের স্মুন্দি এসে ঠেকাবে শুনি?'

সন্নেসী মহাচিন্তায় পড়েছিল। তবে জটি বুঝেছিল এখানে আরো থাকলে সন্নেসীর বিপদ, ওরও বিপদ।

'লাও, আমার য্যাখন সোমসার ছিল, এই বাসনকুসন। সব গচ্ছিৎ রাখ ঠাকুর, আমায় টাকা দাও কটা!'

'কোথা যাবি? ছেলেটা কোথা যাবে?'

'জানি না।'

'তোর কেউ নাই?'

'জানি না।'

সন্নেসী শেষে নিশ্বাস ফেলে ওকে একটা লাল চেলী কাপড় দিয়েছিল। এমন রাঙাচেলী দিয়ে বিহারের মানুষ মড়া ঢাকে।

লালচেলী আর একটা ছোট ত্রিশূল দিয়েছিল সন্নেসী। বলেছিল, 'একদিন তোকে শেয়ালে-শকুনে ছিঁড়ে খাবে তা মনে জানতে পারছি। তবু তুই এই বস্তরে-অস্তরে চলে যা মা। এ ঘোর কলিতেও থাড় কেলাসে সাধুসন্নেসী চলে যেতে পারে,

কেউ মাথায় পা দেয় না।'

'যদি শুধায় কিছু ?'

'বলবি আমি জটি ঠাকুরনী।'

'ঠাকুরনী ?'

'আহা বলবি, বলতে মানা কি ?'

'ঠাকুরনী !'

সত্যিই ট্রেনে কেউ কিছু বলেনি জটিকে। ওর রূপ, রাঙা কাপড়, পিঠের পোঁটলায় ছেলে, হাতে ত্রিশূল, দেখে সবাই অবাক হয়ে যাচ্ছিল।

জটি জানলা দিয়ে চেয়ে ছিল বাইরের দিকে। দুই চোখ জলে ভেসে যাচ্ছিল ওর। এই তো মানুষ ওকে মান্য দিল, সমীহ করল। এরই নাম কি জাতে ওঠা ? আহা উৎসব যদি থাকত, তবে দেখতে পেত কাছারী নয়, আদালত নয়, শুধু এক-খানা কাপড় আর ত্রিশূলের জোরে জটি কেমন জাতে উঠে গিয়েছে।

আরেকটি লোক ওকে লক্ষ্য করছিল। লোকটি ট্রেনে গান গায়, কখনো শ্যামা-সঙ্গীত, কখনো হরিনাম। লোকটি বয়স্ক, রোগা, সংসারে ওর কেউ নেই।

জটিকে দেখে ও বলেছিল, 'হাওড়া তো পৌঁছলে বাছা। এখন যাবে কোথা ?'

জটি কথা বলেনি।

জটি চোখ বড় বড় করে হাওড়া স্টেশন, জনারণ্য দেখছিল। এই বুঝি সেই ছিক্ষেত্তর। যার কথা উৎসব বলেছিল ! এত মানুষ এখানে, অসংখ্য, অগণন। জঙ্গলে বুঝি একটা গাছে এত পাতা নেই। এত মানুষের মধ্যে জটি কোথায় যাবে ?

'বলি যাবে কোথা ?'

লোকটি আবার জিগ্যেস করেছিল।

জটি বলেছিল, 'তা তো জানি না।'

লোকটি বলেছিল, 'আমার সঙ্গে যাবে ?'

'কুথা ?'

জটি ওকে ভয় পায়নি। তখনো জটির ভেতরে সেইসব আদিম সহজাত প্রবৃত্তি কাজ করছে। মানুষ দেখলে ও পলকে বোঝে কাকে ভয় করবার, কাকে ভয় করবার নয়। এই লোকটিকে দেখে ওর ভয় হয়নি। তাছাড়া সামনের আশ্চর্য সব দৃশ্য ওর চোখ টেনে রাখছিল।

'আমার সঙ্গে।'

'কুথা গো কুথা ?'

'আমার বাসা। আমি গাড়িতে গান গাই।'

'গান গাও ?'

'হ্যাঁ গো !'

লোকটি বুঝিয়ে দিয়েছিল সব। গান গেয়ে ও ভিক্ষে করে। যদি জটি সাধনকে কোলে নিয়ে ওর সাথে-সঙ্গে ঘোরে তাহলে ভিক্ষে পাওয়া সোজা হয় আরো।

'তুর ঘর কুথা ?'

'তু মু বলিস না বাপু, যাবি তো চল।'

বেশ চলল এক বছর। জটি সঙ্গে থাকে, লোকটি গান গায়। পয়সা নিয়ে বাসায় গিয়ে সন্ধেবেলা জটি চাল কিনে ভাত রাঁধে, লোকটি দাওয়ায় শোয়, জটি ঘরে ঘুমোয় দোর আটকে।

'সাধন রে সাধন ! বাপো রে বাপো !'

জটি বন্য আদরে ছেলেটাকে অস্থির করে দেয়। তা ছাড়া স্টেশনের কাছাকাছি নেপালী ও ভোটবুড়ীদের মালা-তাবিজ-শেকড়-পাখির পা-ব্যাঙের ছাল বেচতে দেখে ওর ও শহুরে বুদ্ধি হয়েছে।

যখন কেউ জিগ্যেস করে, 'হ্যাঁ গো, তুমি সাধ্নী হয়েছ। তা গেঁটে বাতের টোটকা কিছু জান ?'

জটি মুখ ভেংচে গালি দেয় না। পিতামহীর কাছে দেখা টোটকাটুটকি মনে আনতে চেষ্টা করে, মাঝে মাঝে ওষুধ দেয়।

বেশ চলছিল, বেশ চলে যেতে পারত, কিন্তু লোকটি একদিন দাওয়া ছেড়ে ঘরে এসে ঘুমোতে চাইল। কতদিন আর দাওয়ায় ঘুমোতে পারে ও ? জটি কেমন করে জানবে দাওয়ায় ঘুমোবার কষ্ট কত ?

জটি ত্রিশূলটা তুলে ধরল। বলল, 'জানু আমি কে ? কুন সামাজের মিয়ে ? জানু মোর বাপ কে, মা কে, গাঁতি-জ্ঞেয়াতি আঁতের মনিষ কে ? তু আমায় কুপস্তাব করিস ? বাণ মেরে মেরে ফেলাব না !'

পরদিনই জটি চলে এল আশ্রয় ছেড়ে। অনেক ভেবে-চিন্তে ও ঠাকুরনী হল। ঠাকুরনী না হলে জটি ওর হাবা ছেলেকে বাঁচাতে পারত না। নিজেকে বাঁচাতে পারত না মানুষের নজর থেকে।

জটি বুঝেছিল অলৌকিকতা দিয়ে নিজের চারদিকে বর্ম না আঁটলে নিজেকে ও বাঁচাতে পারবে না।

'সোন্দর মুখের মরণ !' জটি অস্ফুটে বলল।

'সাধন ! এখন তো তোমায় ছরাদ্দ করতে হবে বাপ ।'

পাঁচজন এসে বলল ।

'করব হে পাঁচজন । মা-কে আমি হাতী দিব, ঘোড়া দিব, ভুঁই দিব, সোনা-দানা সব দিব । কিরে কেড়েছি ।'

সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল । সাধনের কথা পাগলের প্রলাপ । কিন্তু সাধন যে কিরে কেড়েছে তাও তো মিথ্যে নয় ।

তাছাড়া, জটি তো সামান্য মানুষ ছিল না । সে যে ঠাকুরনী, অলৌকিক, আধি-ভৌতিক জগতের দোরধরুনী ।

'কি যে করলি সাধন ! তুই যা বললি তা কত টাকার খেলা তা জানিস ?' বল-রাম গভীর আন্তরিকতায় বলল ।

'কিরে কাড়লাম যি ।'

'এখন যা, ভিখ মাঙতে যা । দোরে দোরে ভিখ মেগে আয় ।'

সাধন গলায় কাছা নিয়ে ভিক্ষে করতে বেরুল ।

মা নেই, এখন আর কেউ সন্ধ্যে হলে তপ্ত ভাত রাঁধে না । শোলমাছ পুড়িয়ে, ছাল ছাড়িয়ে, আদার রস, লেবুর রস, লঙ্কা, লবণ, তেল দিয়ে মেখে বলে না 'বাপো, মোর কুলের কাছে বসে খাও ।'

চোখে জল, গলায় কাছা, কোমরে ছেঁড়া কম্বল, সাধন ভিক্ষে করতে গেল ।

কেউ দিতে চায় না । ঘুরে ঘুরে, পায়ের নড়া খসিয়ে সাধন একুশটি টাকা পেল । আর এক পালি চাল । এক পালি চাল দিয়ে অনাদি ডাক্তার জটির সঙ্গে জন্মের সম্পর্ক কাটাল ।

অবশেষে বলরাম গেল কালীঘাট । সবচেয়ে দরিদ্র, সবচেয়ে হতভাগ্য চেহারার এক পুরুতকে সাষ্টাঙ্গ পেন্নাম ঠুকে বলল, 'বড় বিপদ ঠাকুর । আমার নয়, আমার বন্ধুর । এমন একটা উপায় বাতলাও দেখি, সাপও মরে আবার লাঠিও না ভাঙে ।'

'কেমন করে ? বলি বিপদটা কি ?'

বিপদের বহর শুনে তো বামুন হেসে বাঁচে না । বলরাম বললে, 'আপনারা তো চিরটা কাল মধুর ঠাঁইয়ে গুড় দেন । সোনার ঠাঁইয়ে পাঁচসিকা । দেখুন দেখি শাস্তরে কোন বিধান আছে কিনা ।'

বামুন নাকে নস্যি টিপে বলল, 'মূল্য ধরে দেবে, বলি তা পারবে তো ?'

'ধর গা একশো টাকা!'

'একশো টাকার যোগাড় যদি থাকবে, তবে তোমার মতো পাঁচসিকের বামুনের কাছে আসি?'

'আশী টাকা?'

বামুন লোভাতুর চোখে চাইল। এই সময়ে ইস্ক্রুপ আঁটলে ক'টা টাকা আসে। কিন্তু কোন সাহসে বামুন দর কষবে? কালীঘাটের বামুন এখন উপোসী ছার-পোকা। পাঁচ টাকা হাতে পেলে সসাগরা ভারতভূমি দান করিয়ে দেবে। বলরাম একটু ভেবে নিল। যাওয়া-আসার খরচ, একটু নেশার খরচ, কত কাটবে, কত রাখবে। তারপর, কড়া গলায় বলল, 'দেখ ঠাকুর, তোমার হাতে আমি আঠারোটি টাকা দেব। কাজটি তুমি করিয়ে দেবে। নচেৎ আমি অন্য ঠেঁয়ে চললাম। পয়সা ফেললে পুরুতের অভাব? গুড় ছড়ালে পিঁপড়ে আসে না? 'হ্যাঁ' বলবে না 'না' বলবে ভেবে দেখ। আমার হাতে টাইন কম। তোমার সঙ্গে কেজে-কোঁদল করতে আমার টাইন নেই।'

'নিয়ে এস তোমার বন্ধুকে। তা বাবা, মার্কণ্ডের কাপড়, পিত্তিপুরুষের কাপড়, ঘি, ফুল, কাঠ, তিল, পঞ্চশস্য, পঞ্চগব্য—সব তোমরা আনবে তো?'

'ও রে আমার চালাক মাধাই! তাই যদি আনব তবে আর তোমার ময়লা গামছার গন্ধ শুঙতে আসি?'

বলরাম সাধনকে নিয়ে এল।

সব যোগাড় করে রেখেছিল পুরুত। পুরুতের বাড়ির বারান্দায় বসেছিল সব যোগাড় করে।

'দক্ষিণ মুখে বস বাপ!'

পুরুত খনখনে গলায় বলল। ও পাশে ছাঁটা চুল, লাল চোখ, ছাতার মতো ভূষোরঙের একটা লোক বসে আছে।

'উটি অগ্রদানী। দান নেবে।'

অগ্রদানী চোখ খুলে বললে, 'লাও দেখি মামা! হাজার টাকার ছরাদ তো? দশ মিনিটে সেরে দাও দেখি, একবার চাকদ যেতে হবে।'

'এই তো! নাও বাপু, আচমন কর।'

আচমন হল। শ্রাদ্ধ শুরু হল। একেকটা জিনিস সাধনের হাতে ছোঁয়ায় পুরুত আর বিদ্যুৎবেগে কেড়ে নেয়। আঠারোখানা একটাকার নোট নিয়ে বলরাম বসে আছে, মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে।

সুতো ছিঁড়ে সাধন অজানা সব লোক ও লোকাতীতকে অজস্র বস্ত্র দান করল। তারপর পুরুত বলল, 'বল, মা-কে কি দিতে চেয়েছিলে?'

'এঁগ্যে, হাতী!'

'লাও বাপ, পাঁচসিকা ফেল। ইটিও তোমার হাতীদানের পুণ্য হল, জানলে? বিকল্পে মূল্য ধরলে, এই ভাবে দান করা চলে, জানলে?'

বলরাম কাগজে লিখলে হাতী, তার পাশে লিখলে পাঁচসিকে।

সাধনের মুখ এখন বিহ্বল, বিমূঢ়। এ কি আশ্চর্য কথা! পাঁচসিকে মূল্য ধরে দিলে প্রতিশ্রুত গজদানের ফল হয়? এমন জানলে কি সাধন...

'পাঁচসিকা ধর, অশ্বদান হল।'

তখন অদ্ভুত এক প্রতিযোগিতা শুরু হল। সাধন বলে অশ্ব-ভুঁই-সোনা-ধান-বস্ত্র-তৈজস। পুরোহিত বলে পাঁচসিকা—পাঁচসিকা। বলরাম শুধু দেখে এই অপরিমিত দান-যজ্ঞ আঠারো টাকার মধ্যে থাকছে কিনা।

'বামুনকে গো-দানটা পাঁচ আনায় সেরে দেন ঠাকুরমশায়,' বলরাম হেঁকে বলল।

প্যাকাটির ধোঁয়ায় চোখ কুঁচকে অগ্রদানী বলল, 'পাঁচ আনায় গাই-গরু হয়?'

'না হলে মামা-ভাগ্নাকে আঙুল চুষে মরতে হবে। দক্ষিণা দিতে হবে না?'

সাধনের পরনে মা-র একখানা ছেঁড়াখোঁড়া লাল চেলী। সাধনকে দেখতে এখন ক্ষ্যাপা মোষের মতো। প্যাকাটির আগুনে মাটির এতটুকু খুরিতে কয়েক দানা চাল সেদ্ধ করা হয়েছে, শ্রাদ্ধান্ন। ভাতের গন্ধ নাকে যাওয়াতে সাধন এখন ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে উঠছে।

'লেঃ সাধন, আচমন করে বামুনকে পেন্নাম ঠুকে উঠে পড।'

সাধন উঠে পড়ল। সাধনের চোখ মাটির দিকে। সাধনের গামছায় বাঁধা অনাদি ডাক্তারের দেওয়া এক পালি চাল। চালটা বামুন সবটা রাঁধল না কেন? চালটা তো মাকেই দেওয়া হল, তাহলে কয়েক দানা রাঁধবার অর্থ কি? সাধনের সন্দেহ হল। নাক দিয়ে ঘোঁত করে শব্দ করল ও।

'তুই ব্যাটা আমার হাতে আঠারো টাকা ধরিয়ে দিয়ে হরিশচন্দোর হয়েছিলিস? রামচন্দোর হয়েছিলিস?'

বলরাম হাসতে গিয়ে থেমে গেল। সাধন উপুড় হয়ে পড়েছে, চাল গামছায় বাঁধছে।

'কর কি, কর কি বাপ? ও চাল যে আমার পাওনা।'

'চুবো শালা !'

সাধন বামুনকে গাল দিল। এই বামুন না ওকে দিয়ে জটি ঠাকুরনীকে অগাধ, অতুলন ঐশ্বর্য দান করিয়েছে ? জটি ঠাকুরনী না এখন সোঁ সোঁ করে স্বর্গে যাচ্ছে ? যে দেবতাকে ওর পূর্বপুরুষ মেরেছিল, তারই পায়ের কাছে ? গোলকধামে ? সাধন সব ভুলে গেল কেন ?

'সাধন, কি করিস ?'

'চাল লিয়ে যাই, ভাত আঁধব।'

'আরে ও ছরাদের চাল রে, তোর খেতে নাই !'

'চুবো বলরাম !'

মত্ত হাতীর মতো চেঁচিয়ে উঠল সাধন। বলল, 'ঘরে কানাকড়ি লাই যে চাল কিনে আঁধব। ই চাল আমি হাতছাড়া করি !'

'বেটা মূর্খ, গজমূর্খ !'

'চাল আমার ! বলরাম ! আমার পাছু আসিস না।'

পুরুত নিষ্ফল আক্রোশে বলল, 'শ্রাদ্ধের চাল নিয়ে রেঁধে খাওয়া ? এ শ্রাদ্ধ তোর নষ্ট হল ব্যাটা !'

'কেন নষ্ট হবে, আমি হাতী দিই নাই ? গরু দিই নাই ? সোনা-রূপা, বস্ত্র দিই নাই ? কোন শালা আমার মায়ের ছরাদ নষ্ট করে শুনি ?'

বুকের কাছে চালের পোঁটলা, সাধন হেলে দুলে বাড়ি যায়। সাধন বাড়ি যাবে, উনোন ধরাবে, ভাত রাঁধবে।

ভাতের গন্ধ বড় ভাল গন্ধ। ভাতের গন্ধে সাধন তার মাকে খুঁজে পায়। যতদিন ভাত রাঁধবে সাধন, তপ্ত ভাত খাবে, ততদিন ওর কাছে সাঁঝ-সকালের মা বাঁধা থাকবে।

মায়ের কথা মনে করতে গিয়ে পুরুতের ওপর দুর্ব্যবহারের অনুতাপে সাধনের চোখ জলে ভেসে গেল। মা, তুমি যেমন তেমন করে স্বর্গে যাও। সাধন এখন ভাত রেঁধে খাবে। তুমি দোষ নিও না।

ভীষ্মের পিপাসা

মাঘ মাসের শেষে বিষ্টি হলে সুফলন হত, কিন্তু মাঘ মাসের শেষে এ বছর আকাশে মেঘ ছিল না। তবু ভীষ্ম গরানী পেতলের ঘটিতে জল নিয়ে মাঠে গিয়ে বসে থাকত।

বসে থেকে থেকে একবার আকাশ দেখত, একবার মাঠ দেখত। রবি নেই, মাঠে রবি নেই। অড়র কলাইয়ের গাছ শীর্ণ ভিখিরী ছেলের মতো ভয়ে ভয়ে মাথা নাড়ে।

'অরা জল চায় অর্জুন! বুইলি দাদা, জল চেইয়ে মাথা লাড়ে।'

বলেই ভীষ্ম ঢকঢক করে জল খেল। বড় পিপাসা ভীষ্মের, অর্জুন ওকে জল দিতে দিতে বিরক্ত হয়ে যায়। জল ওর শরীরে থাকে না, তবু ওর পেট, পিত্ত, পাকস্থলী, ফুসফুস, কণ্ঠনালী সব সময়ে জল চায়।

'হঃ! ওদের কি তোমার মতো ওগে ধরেছে?'

'জল চায়!'

'জল চায়, জল দিতে পারবে?'

'জল চায়!'

ভীষ্ম সকরুণে বলে আর নিজের ঘটিটার দিকে চায়। আহা, ভীষ্ম গরানীর যখন যৌবন ছিল, তখন ওরা জল ডাকত। ঘরদোর ছেড়ে গিয়ে ভীষ্ম তখন দাওয়ালদের মেয়ে পরাণবালার প্রেমে উন্মত্ত। দাওয়ালরা আদিকাল থেকে ক্ষেত-মজুর। গেরস্তের মাহিন্দার হয় না ওরা, জমিদারের কাছ থেকে জমি নেয় না। ওরা শুধু ঘোরে আর ঘোরে।

বাঁকুড়ায় ধান কেটে ওরা বর্ধমানে চলে গিয়ে রবি বোনে। রবি বুনে দিয়ে ওরা মুর্শিদাবাদ চলে যায় পাটের ক্ষেত আওলাতে। আবার ক্ষেত নিড়োবার সময় হলে ওরা ঠিক চলে আসে।

পরাণবালার বাপ বিষ্টি ডাকত। ভীষ্ম ওদের সঙ্গে বৈশাখে বাঁকুড়ার লাল-মাটিতে, চৈত্রে বীরভূমে অজয়ের পাড়ে, পুজো করত, বিষ্টি ডাকত।

অর্জুন সে-সব বিশ্বাস করে না বলে ভীষ্মের দুঃখ হয়। বলে, 'তুই কি জানবি অর্জুন? মোর মন্তরে দশ আকাশ ছেইয়ে মেঘ আসত। পবনের কি ডাক অর্জুন! শাঁ শোঁ করে যেমন হাঁকুরে এসে পড়ত!'

অর্জুন ওর কথা ভাল করে শোনে না। এসে গাছের নিচে বসে আর হলধরের

কাছ থেকে বিড়ি চেয়ে নিয়ে নিজের বিড়িটা ধরায়। তারপর চেয়ে থাকে দূরে ঐ মণ্ডলদের ক্ষেতের দিকে। ধূ ধু মাঠ, শীর্ণ তৃষিত গাছের চারার মরুভূমির মাঝখানে মণ্ডলের খেতটা টলটলে সবুজ।

এ দেশে নদী নেই, ক্যানাল নেই। ভরসা এক টিউবওয়েল। এবার টিউবওয়েলেও জল উঠতে চাইছে না কিছুতে। বুঝি বা মাটি থেকে সব জল শুকিয়ে যাচ্ছে।

ভীষ্ম বলে, 'মাটির তলে গঙ্গা বয়, জানিস অর্জুন!'

'বয় তো জল কোথা গেল?'

'এখন আর বয় না।'

কেন বয় না তা জিগ্যেস করলে ভীষ্ম পাপপুণ্যের ফর্দ খুলে বসবে। বুড়োর কথা শুনলেই অর্জুনের মাথায় রক্ত চড়ে যায়। ছিল, মাটিতে জল ছিল। দেড়শো ফিট টিউবওয়েল বসালেই সবাই পাচ্ছিল জল। কিন্তু ঐ মণ্ডলরা পর পর বড় বড় টিউবওয়েল বসিয়ে সব জল টেনে নিচ্ছে।

'বুড়ো কি বলে রে অর্জুন!'

'জলের কথা ছাড়া ওনার মুখে অন্য কথা শুনোচো?'

মাঠের দিকে চেয়ে চেয়ে ভীষ্মের বড় কষ্ট হয়। বড় জল খেতে হয় ভীষ্মকে, বহুবার বাইরে যেতে হয়। পেতলের ঘটিটা ও সঙ্গে নিয়েই ঘোরে। অনেক সময়ে রাত-বিরেতে বাইরে, তারাভরা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ও বিষ্টি ডাকার মন্তরের কথা মনে করতে চেষ্টা করেছে। মনে আনতে পারেনি।

পরাণবালার প্রেমে উন্মত্ত হয়ে ভীষ্ম যখন ঘুরে ঘুরে বেড়াত তখন সব মনে থাকত ওর। কিন্তু অর্জুনের বাপ মরে গেল, ঠাকুর্দা মরে গেল। অর্জুন তখন রক্তের ডেলা, গায়ে মায়ের পেটে আঁধারবাসের আঁশটে গন্ধ। ভীষ্ম ওদের দেখবে বলে চলে এল।

পরাণবালা ডুকরে ডুকরে কেঁদেছিল। ভীষ্মও কেঁদেছিল খুব। বলেছিল, 'মোরে তুমি দুষো না পরাণ! এ জেবনে আমি সোমসার করব না নিচ্ছস জেন!'

এখন পরাণবালার মুখটাও মনে পড়ে না। শুধু, রোগের তাড়নায় বাইরে এসে আঁধার মাঠ আর তারাভরা আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে মনে হয় যেন কার সঙ্গে একসময়ে ভীষ্ম একসঙ্গে এসে এইসব আকাশ-মেঘ-বাতাস-ধান-রোদের সঙ্গে বন্ধু পাতিয়ে গিয়েছিল। ভীষ্মই সেই খেলা ভেঙে দিয়ে চলে এসেছে। তখন মেঘ জল দিত ডাকলে পরে, বাতাস বহে যেত ভীষ্মের কথায়।

বুড়ো বটগাছের মত এক মাথা শাদা চুল নিয়ে ভীষ্ম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে-সব

সময়ে কাঁদে। কেন ওর মনে নেই কিছু ? কেন ওর হাতের ঘটিতে গঙ্গা অফুরন্ত হয় না ? তা যদি হত তাহলে তো ভীষ্ম পৃথিবীর সমস্ত ধানখেতে খরায় জল দিয়ে আসত ? বিশ্বসংসারে একটি গোলাও খালি রাখত না ?

অর্জুনদের সংসারে গাই-বলদ-ঢেঁকি-ছেলেপিলে-হাঁস-কুকুর। ভীষ্ম একপাশে থাকে। একটা চালাঘরে। ওর শরীরে যে রোগটা ঢুকেছে, সে রোগ ভাবনাচিন্তার, সুখী মানুষের রোগ।

'কি, চিন্তা কর না কি ?' ডাক্তার বলেছিল।

'আজ্ঞে। চেন্তা করে করে জেবন বের করে দিচ্ছে।

অর্জুন খেঁকিয়ে উঠেছিল। কোথায় গ্রাম, কোথায় হেল্‌থ সেণ্টার। বাঁশের মাঝে বড় ঝুড়ি বসিয়ে, বাঁকে বয়ে ভীষ্মকে নিয়ে যেতে অর্জুনের কাঁধের চামড়া ছিঁড়ে গিয়েছিল।

ভীষ্মকে ডাক্তার অবশ্য বিশেষ ওষুধপত্র দেয়নি। বলেছিল, 'কি আর দেব ? যে ক'দিন থাকবে, ভাল হয়ে থাক গা !'

ভীষ্মের খুব আনন্দ হয়েছিল। ঝুড়িতে বসে দুলে দুলে যেতে আসতে কত মজা !

সেদিনই বাড়ি এসে ও অর্জুনকে ওর রূপোর তাবিজটা দিয়ে দেয়।

'দিচ্ছ কেন ?'

'জমিজমা সব দিলাম আর তাবিজটুকু তোকে দেব না দাদা ?'

অর্জুন বলেছিল, 'নাবু জমিটার জন্যে তোমার পরাণ পোড়ে, তাই না কত্তাদাদা ?'

'বড় খেয়েটে হাসিল করেয়েছিলাম !'

ভীষ্ম টেনে টেনে বলে অপ্রতিভ হেসেছিল।

'এবার ধানটা ভাল হলে ছাড়িয়ে আনব।'

'দেখ্‌ দাদা !'

'কি ?'

'নাঙল যার জমি তার বলে যে বাবুরা নাচায়, তোরা নাচতেছিস, দেখ, হাল-বলদ-বীজ-বেছন-দাওয়াল সব মুনিবের থাকে, তোদের ঘরে কি আছে বল্‌ ? শুধু জমি লিয়ে কি…?'

'সব কথা বুঝ তুমি ?'

ভীষ্ম চুপ করে যায়। তা এবার তো আমার জমি—তোমার জমি, সকল জমিই অজন্মার জমি হয়ে গেল। মাঘ মাস থেকে আকাশের চোখ শুকনো, চৈত্র বৈশাখ

কেন, জ্যৈষ্ঠেও জল হল না। সব ধুলো হয়ে গেল।

এই ক' মাসে আরো বুড়ো হয়ে গেল ভীষ্ম। মরতে ওর মোটে ইচ্ছে করে না ; কিন্তু পিপাসা এত বেড়েছে যে মনে হয় পাতাল ফুঁড়ে যত জল আছে সব খায়, যত নদী, যত সমুদ্র আছে সব খেয়ে বসে থাকে। যাকে যখন দেখে তখনি বালকের মতো বলে, 'বুক শুইকে যেতেছে বাপ ! বড় পিপাসা !'

কে আর ওর ঘটি ভরে জল দেয় কও। অর্জুন কেন, এদিকে ব্লকের পর ব্লক খেত জ্বলে গিয়েছে। জ্যৈষ্ঠের গোড়ায় দাওয়ালরা এবার মোটে এল না। এবার ওরা বর্ধমানেই থাকবে।

'খাল নদীব দেশে পিত্তিভূমি হলে জল পেতাম গো ! এ দেশে কল ছাড়া ভরসা নেই !'

বলে অর্জুন একদিন ওর নিডানীটা উঠোনে ছুঁড়ে মারল। নিড়ানীটা মাটিতে গেঁথে বসে গেল আর অভ্যেসবশত ভীষ্ম দাওয়া থেকে বলল, 'কেষ্ট !'

মাটিতে পোকা-পতঙ্গ-কেঁচো-কোন্নোই থাকে। মানুষ পায়ে দাপালে, কাস্তে-নিড়ানী অতর্কিতে ছুঁড়লে একটা দুটো কেষ্টর জীব মরে তাই ভীষ্ম বলল, 'কেষ্ট !'

'তুমি চুপ যাবা ?' বলে অর্জুন এমন চেঁচিয়ে উঠল যে ভীষ্মর কানেও কথাটা বাজল।

'রাগ কললি ? অ অর্জুন ! রাগ কললি ?'

'আর রাগ !' অর্জুন ওর কানের কাছে চেঁচিয়ে বলল, 'সবাই চাঁদা দিয়েলাম, দরখাস্ত গেল, বি ডি আপিসে হেঁটে হেঁটে পা খসে গেল, এবারে বড় কল বসবে, জলের অভাব থাকবে না !'

'কি হল ?'

'হল আমার মাথা ! কোথা যেয়ে কল বসতেছে তা জান ? বিশ্ববাবুর জমিতে। ওনারা এবার গরমেণ্টের ঘরের বিছন এনেছে। নতুন ধান করবে তাই বেস্তর জল চাই !'

'এখন কি চারা রুইবে না কি ? এখন সময় ?'

অর্জুনের বউ ভিজে ভিজে গলায় বলল। সেই বটতলা থেকে জল আনতে ওর কোমর ভেঙে আসে, কান্না পায়। এখনো ওর গলায় কান্না।

'যাও না, যেয়ে বলে এস !'

'অ অর্জুন ! তুই আপিসে যেয়েছিলি ?'

আপিস মানে ব্লকের আপিস। পাকাবাড়ি, দেওয়ালের নাম লেখা বোর্ড, খাকী জামা, এই সবকিছুর ওপর ভীষ্মের অসীম বিশ্বাস।

'যেয়েছিলাম। তারা বললে, বিছন বল, ওষুদ বল,—সব বিশ্ববাবুরা নিয়ে গেল ; তোমরা, গরানীরা, এই সন্দেশ নিয়ে যেয়ে খাওগা !'

ভীষ্ম অর্জুনের কথা বুঝতে পারল না। হাল ছেড়ে দিয়ে বলল, 'যে যা যাস এ ঘটিটা এট্টু ভরে দিয়ে যা ! বড় পিপাসা !'

'কত্তাদাদার ঘটিতে জল দে !'

অর্জুন মাথায় গামছা বাঁধতে লাগল। এখন হলধরের কাছে যেতে হবে। কেন যেতে হবে, গিয়ে কি লাভ হবে তা অর্জুন জানে না, কিন্তু এখন ওদের হলধরের কাছেই যেতে হয়। হলধর যা বলে তাই শুনতে হয়। না শুনলে না কি মহাবিপদ হবে।

বউ ভুরু কুঁচকে বলল, 'কত জল টানব দিবেরাত্তির ?'

'যত উনি চাইবে !'

'সব্বনেশে পিপাসা গো !'

অর্জুন বেরিয়ে গেল। বড় বিপদ, বড় দুঃখের জীবন। অথচ এখনো অর্জুন এ জীবন ছাড়া অন্য জীবনের কথা ভাবতে পারে না। ভীষ্ম হঠাৎ যেন বুঝতে পারল সব ! বড় টিউবওয়েল চৌমাথায় বসেনি। জলের কষ্ট যে-কে সেই রয়ে গেল। অর্জুনের বড় কষ্ট। ঐ অর্জুনকে ভীষ্ম যখন প্রথম দেখে, এতটুকু রক্তের ডেলা। কোলে তুলতে অবাক হয়ে ভীষ্মর দিকে চেয়ে ছিল। ভীষ্মর এক কানে তখন একটা পেতলের মাকড়ি থাকত। অর্জুনের গায়ে তখনো মায়ের পেটে আঁধারবাসের আঁশটে গন্ধ। ওর মুখ চেয়ে পরাণবালাকে কথা দিয়েছে, সে-কথা মনে করে কতদিন ধরে ভীষ্ম নিজের রক্তকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিল। ঘুমোতে ঘুমোতে ওর রক্ত একদিন জলের মতো শান্ত হয়ে গেল।

সেই অর্জুন !

তার পরদিন ভীষ্ম সকাল থেকে খেল না কিছু। আগে যেন কি সব নিয়ম মানত, সংকল্প করে থাকত। সব কথা মনে পড়ে না। উপোস করে বসে বসে ভীষ্ম শুধু ভুরু কুঁচকে ঘোলাটে চোখে ধানখেতের দিকে চেয়ে রইল। অসম্ভব পিপাসা ভীষ্মের, জলের পিপাসা। কিন্তু জলও ভীষ্ম কম করে খেল।

'শরীল ভাল ঠেকে না ? শুনতে পাচ্চো ?'

'তুই তোর কাজে যা !'

কলাইডাল সেদ্ধ, কচু সেদ্ধ, তেল-লঙ্কা-ভাতের প্রাণভোলানো গন্ধ থেকে মন ফিরিয়ে নিল ভীষ্ম। বলল, 'রূপোসে কি বুড়ো বয়েসে শরীল ভাঙে ? এখন খাবি তোরা।'

সারা দিন ধরে ভীষ্ম কত কথা ভাবতে চেষ্টা করল। কি মন্ত্র বলত, কি ছড়া কাটত, কি নিয়ম মানত। যতবার মনে করতে গেল শুধু জলের কথাই মনে হল ওর।

অজয়ের জল দেখেছিল রাঙা, বর্ষায় খ্যাপা হাতী। কোথায় দেখেছিল কাদের প্রাচীন দীঘি, সেখানে না কি জলের নিচে কুয়ো থাকে তাই পুকুরে জল কখনো ফুরোয় না। সে কি সত্যযুগের কথা? যখন ভীষ্ম জল ডেকে জল আনত, আকাশ-পানে মুখ তুলে বিষ্টির জল খেত? ভীষ্ম কি সত্যযুগে বেঁচে ছিল না কি? হবেও বা! নইলে নিজেকে কেন মাঝে মাঝে মনে হয় এই পৃথিবীর চেয়েও পুরনো সে? এই মাটির চেয়ে ওর বয়েস বেশী? কেন মনে হয় এই জল না হওয়া, ধান না হওয়ার কথা? এই মানুষের লোভ আর অনাচারের সব গোপন রহস্য সে, ভীষ্ম গরানী ছাড়া আর কেউ জানে না? তাই কি ওর এত পিপাসা?

ভীষ্ম ঢক ঢক করে জল খেল। এত পিপাসা ওর শরীরে! এমন করে সব জুড়োতে জুড়োতে জল নামে গলা দিয়ে। যেন গঙ্গা নেমে যাচ্ছে ভিতরে। ভীষ্ম শুনেছে কোথায় যেন কোন হিমের দেশে গঙ্গা থাকে। সে দেশে ওপর থেকে নদী নামছে তো নামছেই।

পরাণবালার বাপ বলত, 'বুইলে বাবা? রেতের বেলা গঙ্গা তুষার হয়ে থাকেন। লামুতে লামেন না। রেতে যেয়ে ভগীরথ মাকে ডাকেন আর ডাকেন। বিয়েন বেলা মুখে ওদ লেগে মা ঘুম ভেঙে লামুতে লামেন।'

'মা একবার লাম গো! আকাশ ছেইয়ে লাম।' ভীষ্ম কাতর স্বরে বলল। তারপর পেতলের ঘটি নিয়ে মাঠের দিকে গেল। আকাশভরা তারা ফুটফুট করছে। কে এমন কুসুম কুসুম রাতে ভীষ্মর সঙ্গে নছোল্লা করত? বলত, 'এক থালা সুপারী গণতে না পারে ব্যাপারী, এই কথার কথা কি? বল দেখি?' ভীষ্মর কেন তার নামটা অব্দি মনে পড়ে না?

'সব বেস্মরণ!' ভীষ্ম মাথা নাড়ল। তারপর অর্জুনের হাসিল করা নতুন জমিতে গিয়ে বসল। শুধু জমিতে কি করবি অর্জুন? তোর হাল নেই, বলদ নেই, বিছন নেই। চাপাকল নেই যে খেতে জল দিবি, আকাশের জল তোর নয়। সেই জন্যেই তো এবার তোর জমি, কাড়ালদের জমি সব অজন্মার, অফলনের জমি হয়ে গেল রে। তোর জমিটার যত পিপাসা, তোর কর্তাদাদারও এত পিপাসা।

'জল দাও মা ভদ্রেশ্বরী!' ভীষ্ম ধানখেতে বসে হাত জোড় করল। কোন দিকটা পুব দিক? পুব আকাশে মেঘ তোল। আমার নাম ভীষ্ম গরানী। এক সময়ে আমি এই মাটির পেটে আঁধারবাস করেছি, আমার গায়ে সেই আঁশটে গন্ধ

লেগে আছে। আমার শরীরেও পিপাসা।

ভীষ্মর মনে হল আকাশ মাটি ফুঁড়ে ওর ডাক চলে যাচ্ছে, 'জল দে! পিপাসা!'

জল এল। আষাঢ়ের শেষে এমন জল, ধান শুকিয়ে এসে এমন জল! ধানখেত ঘাসে ভরে গেল। নিড়িনী দিতে দিতে, ঘাস তুলতে তুলতে অর্জুনরা হাঁপিয়ে গেল। আকাশ এখন পরাণবালা। কখন হাসে, কখন কাঁদে তার ঠিক নেই।

ভীষ্মকে ওরা ধানখেত থেকে সকালে তুলে এনেছিল, সেই থেকে ভীষ্ম আর উঠতে পারে না। শুয়ে শুয়ে শুধু আকাশ দেখে আর জল খায়। চোখ দিয়েও জল পড়ে তার। অর্জুনকে মিনতি করে বলে,'মোরে একবার তোর হাসিল জমিতে নিয়ে যেতে পারিস অর্জুন?'

'কি দেখবা? জল ডেকে এনে ড্যাঙা জমি লাবু করে দিলে তাই দেখবা? লজ্জা করে না?'

খেতে ধানচারা মরে যায়, সেই আক্রোশে অর্জুন ভীষ্মকে গাল পাড়ে বসে বসে।

'আমার জেবন আর নাই রে, এবার আমি যাব।'

'তুমি মোরে খেয়ে তবে যাবে।'

'গাল দিলি?'

'দিলাম।'

প্রচণ্ড রাগে অর্জুন ওর নিড়িনীটাই ছুঁড়ে মারল ঘরের কোণে। 'ব্বাপো রে!' ভীষ্ম চেঁচিয়ে উঠল, 'অক্তপাত করে দিলি? মোর ওগে অক্ত বন্ধ হয়? ডাক্তার বলে নাই?'

'হাঁ কত্তাদাদা, এ আমি কি করলাম?'

খুব কাঁদল অর্জুন। পাথরকুচির পাতা বেটে দিল ভীষ্মর পায়ে। তারপর আবার বাঁকে বসিয়ে ওরা নিয়ে গেল ভীষ্মকে। ডাক্তার মুখ অন্ধকার করে অর্জুনকে যতক্ষণ বকল ততক্ষণ ভীষ্ম চোখ বুজে থাকল। তারপর বলল, 'ঘরে চল। ঘরে যেয়ে মরব।'

ঘরে পৌঁছবার আগেই অর্জুনের হাসিল জমিতে ওরা বাঁক নামাল। ভীষ্মর শরীর এলে পড়ছে, ঢলে পড়ছে। হলধর ছুটে গ্রামে খবর দিতে গেল। গরানীরা কয়ঘর আছে। ওদের সমাজের মাথা, সবচেয়ে বুড়ো মানুষ, সকলের ঠাকুরদা ভীষ্ম ধানখেতে মরে যাচ্ছে। সময়ের মরণ, কালের মৃত্যু, সকলকে সাক্ষী থাকতে হয়।

'জল দে অর্জুন, গঙ্গা দে।'

অর্জুন ভীষ্মকে জল দিল। তারপর উপুড় হয়ে পড়ল অর্জুন, 'ও কত্তাদাদা গো! তুমি ভেন্ন মোর জেবন রইত না। মুখে এট্টা কথা বলে যাও। মোরে পাতকী করে যেও না।'

ভীষ্ম তখন জলবিষ্টি আনছে, ওর সঙ্গে পরাণবালা। সব মন্ত্র মনে আছে ওর। পৃথিবীর সব মাটি পায়ে দলে দলে ভীষ্ম বিষ্টির মেঘ নিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে। লে বেটা জল লে! সব চাষী জল নিচ্ছে ভীষ্মর মেঘ থেকে। সমস্ত ধানখেত শস্যে ভরে গেল। খেত, সুপ্রসবিনী হও! খেত ভীষ্মের কথা শোনে। ধান লাও হে মানুষেরা ধান লাও।

লক্ষ লক্ষ অযুত নিযুত মানুষ এসে ধান কাটে, ধান তোলে। ওদের মধ্যে অর্জুন কোথায়? না কি সবাই অর্জুন?

ভীষ্ম চোখ খুলল। সবুজ সবুজ ধানখেত, কিন্তু এ ধান কারো গোলায় উঠবে না। ধানে-ঘাসে একাকার হয়ে গেল।

অর্জুন তুই আমায় কি বলতে বলিস?

'পি—পা—সা!' ভীষ্ম টেনে টেনে বলল।

'জল খাবা?'

ভীষ্ম ঘাড় নাড়ল। চোখ বুজল। এ পিপাসা জলের নয়, ধানের পিপাসা। এই কথাটি ভীষ্ম অর্জুনকে বলে যেতে পারল না।

অর্জুন হা হা করে কাঁদে। মরে গেল ভীষ্ম। অর্জুন ওর পিপাসা মেটাতে পারল না।

হলধর অন্য গরানীদের নিয়ে এখন গ্রামের দিকে যায়। ওরা পিটুলী গাছ কাটবে, বাঁশ কাটবে। ধানখেতে অর্জুন একা ভীষ্মকে নিয়ে বসে থাকে। চারদিকে পৃথিবীর সকল ধানখেত সবুজ মাথা নেড়ে হা হা করে। ভীষ্মের মাথা অর্জুনের কোলে কিন্তু ভীষ্মের এ পিপাসা মিটল না। সব পিপাসা বুঝি মিটবার নয়।

বিশালাক্ষীর ঘর

মায়ের কোলে সন্তান আসত যেত, আসত যেত, অবশেষে কোলের মেয়েটিকে বাশুলীর থানে ফেলে দিয়ে মা মাটিতে গড়িয়ে গড়িয়ে কেঁদেছিল। বলেছিল, সবগুলোকে খেয়েছিস আক্কুসী, এটাকেও খা!

সে চল্লিশ বছর আগেকার কথা। সে বছর সময়ে জল, মাঠে ধান। বাশুলীর থানে পুজো পড়েছিল খুব। তাছাড়া তখনো এত ওষুধ-বিষুধ বেরোয়নি। ফি বছর ম্যালেরিয়া-বসন্ত-কলেরা—মা-মনসা কয়েক হাজার প্রাণ নিতেন।

হয়তো খেয়ে খেয়ে বাশুলীর অরুচি হয়েছিল, তাই বিশালাক্ষীকে উনি আর নিলেন না।

ও বিশু, তুমি বড় হলে কি করে মা?

দুক্ষু কষ্ট করে গো! বড় দুক্ষু করে! কিন্তুক একসময়ে আমার বাপ-জ্যাঠার কপালে গাড়ি চেপে বেইড়েছি। মোটরগাড় নয়, ঘোড়াগাড়ি। তখনো গড়িয়া-রাজপুর-জগদ্দল-বোড়াল ধু ধু গ্রাম। ওদের অনেক জমি ছিল। বিশালাক্ষীর বাপ-জ্যাঠার ঘরে সন্তান বলতে ও একা। ওর জ্যাঠা পরাণে পণ্ডিত যে উঠতি জমি-দারকে সব জমিজমা বেচেছিল নেশার ঘোরে, তারই বেতো ঘোড়া আর ভাঙা গাড়ি কিনে এনেছিল জমি-বেচা টাকায়।

সেই গাড়ি চড়ে বিশালাক্ষী বেড়াত।

বড় অহঙ্কার বেড়েছিল ওর বাপ-জ্যাঠার। তার আগে অব্দি ওরা জাতে বুঝি নিচু ছিল। কিন্তু সেই যে গান্ধী বললেন, তোমরা সবাই মানুষের জাত, সেই যে যজ্ঞ করে সবাই জাতে উঠল, সেই থেকে ওরা ভাল জাত।

জাতের অহঙ্কার, হাতে কাঁচা টাকা তার অহঙ্কার, ওলাবিবির থানে বুঝি পুজো পড়েনি, তা উঠনো কলেরায় ওলাবিবি ওর বাপ-জ্যাঠাকে নিলেন। প্রথমে বাপ-জ্যাঠার মড়া বেরোল। শ্মশানে মড়া নিতে না নিতে আত্মীয়স্বজন গিয়ে বললে, বিশুর মা, জেঠিও বমি করছে গো, মড়া তোমরা জাগিয়ে রাখ।

এক দিন, এক রাত মড়া নিয়ে সবাই শ্মশানে বসে। তারপর একসঙ্গে চার-জনকেই ওরা হরিধ্বনি গঙ্গাজল দিয়ে স্বর্গে পাঠালে। বিশুকে মা নিলেন না।

তারপর কতদিন গেল, বিশু পাগল বরের বউ হল। এক ছেলে কোলে নিয়ে একদিন বিধবাও হল। ঝি খেটে খেটে ওর দেহ কালি হল, হাতে-পায়ে হাজা। ওর যে একখানা ঘর হতে পারে সেকথা বিশু স্বপ্নেও ভাবেনি।

জ্ঞাতগুষ্টই খবর দিলে।

ওর বাপ-জ্যাঠার দরুন একফালি জমি হালতুতে। সে জমির আশপাশে কোথাও আর মানুষ বসতে বাকি নেই।

অত জমি সব আমাদের ছিল তুমি জানতে?

বিশুর ছেলে সাইকেল পাম্প করতে করতে জিজ্ঞেস করল। বিশুর ছেলে কারখানায় লেদমেসিন চালায়। বিকেলবেলা সরু প্যান্ট পরে ও, গলায় রুমাল বাঁধে। বছর কয়েক হল বিয়ে করে ও শ্বশুরবাড়ি গিয়ে উঠেছে। মাকে দেখলে ওর বড় লজ্জা হয়। ওর শ্বশুরবাড়িতে কেউ ঝি খাটে না।

মাঝে মাঝে এসে মাকে দেখে যায়।

অত জমি সব আমাদের ছিল?

সব আমাদের।

সব সময়ে বিশু ভাত রাঁধে না, ভাত খায় না। না খেলে মাথা ঝিমঝিম করে, আর আবোল-তাবোল স্বপ্ন দেখে জেগে জেগে।

ছেলের কথায় বিশু স্বপ্ন দেখল যেন। বলল, সব আমাদের ছিল, জানলি? তোর দাদামশায়রা মস্ত জমিদার ছিল তা জানলি? এই য্যাত জমি দেখতে পাস, সব তাদের ছিল?

তোমার বাপ তা'লে বড়লাট ছিল বল?

মস্করা নয় বাপ!

এ জমি তা'লে তোমার?

আমি কি জমি নে' সগ্‌গে যাব? যদি একখানা কুঁড়ে তুলে নিস সে তোদের থাকবে।

বিশু নিশ্বাস ফেলে বললে। ছেলের সঙ্গে অব্দি ও জোর গলায় কথা বলতে পারে না। সংসারে কারো ওপর জোর করতে পারে না বিশু। জন্মকাল থেকে এ পর্যন্ত কাউকেই ও আপন করতে পারেনি। পরে স্বামী ওকে ভাত-কাপড় দিত না বটে, কিন্তু পাগলামির ফাঁকে ফাঁকে ওকে বড় বড় কথা শোনাতে ছাড়ত না।

বলত, হতভাগী, কুল-জাত, কুল-সমাজ সব ভুলে খেয়ে ঝি খাটতেছে?

স্বামী দেওর ভাশুর সবাই ওর ঝি-খাটা পয়সা কেড়েকুড়ে নিত বটে, কিন্তু ওকে কথা শোনাতে ছাড়ত না।

এই গড়িয়ায় পরের ঘরে পড়ে থাকবার জন্যেও ওরা কথা শোনাত খুব।

বলত, আজপুরের খোড়োঘর আজকন্যের পছন্দ হল না?

ছিল, রাজপুরে ওর শ্বশুরদের একখানা খড়ের ঘর ছিল। কিন্তু স্বামী পাগল

হয়ে বেরিয়ে পড়তে দেখুরা মা-ছেলেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল।

এই হয়েছে সারাজীবন। একটি মানুষ, একটি জীবন, কোন কিছুই আপন করে হাতে পায়নি বিশু। মানুষ ওকে শুধু ব্যবহার করেছে একদিকে, অন্যদিকে গালাগালি করেছে।

মনে জ্বালা ধরলে মাঝে মাঝে বিশু চেঁচামেচি করেছে বটে, কিন্তু স্বামী-ছেলে সবাই ধূর্ত হেসে চুপ করে থেকেছে। ওরা জানত, রাগ পড়ে গেলেই বিশু ঘোষাল-বাড়ি থেকে এক থালা ভাত, দোকান থেকে বিড়ি আর পান স্বপুরি নিয়ে আসবে। ওরা বিশুকে চিনে ফেলেছে। বিশুকে যারা গামছার মতো মুচড়ে মুচড়ে কষ্ট দেয়, ও তাদের জন্যেই জীবন দেয়। এটা ওর স্বভাব।

স্বামীর সময়ে বিশুর যে ভাগ্য ছিল, এখন ছেলের সময়েও তাই। বিশুর বড় ইচ্ছে, ও ছেলের কাছে থাকে। কিন্তু সে তো আর ছেলের শ্বশুরবাড়িতে সম্ভব নয়?

নিজের সংসারে মানুষ ছেলের কাছে থাকে। নিজের ঘরে থাকে। কিন্তু নিজের ঘর কোথায় পাবে বিশালাক্ষী? কে ওকে নিজের ঘর দেবে?

বিশু তাই এমন দুরাশার কথা মনের কোণে ঠাঁই দেয়নি কোন দিন। কিন্তু জ্ঞাতগুষ্টি হঠাৎ ওকে মন্তরের মতো আশ্চর্য কথা শুনিয়ে গেল।

ও মহেশের মা, হালতুতে তোমার জমি আছে মা, দখল নাও গা!

বিশু ছেলেকে ডেকে পাঠল। মহেশ ওর উপযুক্ত ছেলে। তাছাড়া বেটাছেলে সাহায্য না করলে মেয়েমানুষ হয়ে বিশু কি জমিজমা উদ্ধার করতে পারবে?

ছেলে বলল, এ জমি কোত্থেকে এল বল তো?

মা বলল, জানি না বাপ। চল যেয়ে বেত্তান্ত শুনে আসি।

কসবার লাইন ছাড়িয়ে সূর্য-ওঠার দিকে হাঁটতে হাঁটতে এক জায়গায় ওরা সেই বাবুর বাড়ি খুঁজে পেল।

রীতিমত পাকা ঘরদোর, তক্তাপোশে বসে বাবু কাগজপত্তর দেখছিলেন।

তুমি বিশালাক্ষী পণ্ডিত? তোমার বাবা ঈশ্বর পরাণচন্দ্র পণ্ডিত? তোমার জেঠা হারাণচন্দ্র পণ্ডিত?

হ্যাঁ, বাবা!

বাবার স্নেহ, মায়ের মমতা কাকে বলে তা জানে না বলেই বিশালাক্ষী বিশ্ব-সংসারে যাকে পায় তাকেই বাবা-মা বলে ডাকে।

তোমার বাপ-জেঠার এখানে দেবত্ত জমি ছিল?

উনি কি জানবে? আমার কাছে শুনুন!

বিশালাক্ষী উপেনকে দেখে অবাক হয়ে গেল। উপেন তো ওদের গ্রামের মানুষ। ওদের সমাজের মাথা। উপেন এখানে কি করে এল?

মাছের গন্ধে বেড়াল আসে জানলে পিসী!

উপেন গোঁফের ফাঁকে হাসল। বলল, আমার জেবনটা তো কার জমি, কার মামলা তার চিন্তাতেই কেটে গেল। তোমার বাপ-জেঠার দেবত্ত জমির কথা শুনেছিনু বটে। আর তোমার গিয়ে সোয়ামী, আমাদের পিসে, তিনিও জানত।

তিনি জানতু?

নয়তো কি? তুমি ছিলে অজ-বোকা। দেবত্ত সম্পত্তি আর মায়ের থানের কথা তুমি জানতে পিসী? শুনেছিলে?

শুনেছিলাম বটে ছিল সব, কিন্তু ময়েশের বাপ বলতু ওসব হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে।

আর তুমিও তাই বিশ্বাস করেছিলে, তাই নয়?

হ্যাঁ, বাবা।

বিশুর চোখ দিয়ে ঝরঝর বয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। অনাথা, সংসারে কেউ ছিল না। দিদিমার কোলেপিঠে মানুষ। দিদিমা ময়েশের বাপের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল। তখন বিশুর বয়েস মোটে ন'বছর। দিদিমা ঘর করতে দিতে চায়নি কিন্তু বিশুর শাশুড়ী বলেছিল—ন'বছুরে মেয়ে কাজকম্ম করে না? কাজ করলে তোমার নাতনী মরে যাবে?

বিশু ঘর করতে গেল। বিশুর বর কখনো বাড়ি থাকত, কখনো থাকত না। টাকা পয়সা বিশু চোখে দেখেনি বটে কিন্তু ধানচালের কষ্ট তেমন ছিল না। ক্রমে ধানচালের কষ্ট হল। শোনা গেল বিশুর বর ঠাকুর-ঠাকুর করে ধর্মপাগল হয়েছে। তখন বিশুর বড় কষ্ট। ময়েশকে কোলে নিয়ে বিশু শরিকদের ধান ভানত। ময়েশের বাপ মরে যেতে চালাঘরের আশ্রয়টুকুও ঘুচে গেল।

বিশু তো ময়েশের বাপের প্রতিটি কথা বিশ্বাস করত। বিশ্বাস করবে না? ময়েশের বাবাকে যে পাঁচজনে খুব বাহবা দিত! বিশু আর ময়েশকে ভাত-কাপড় দিক বা না দিক, ময়েশের বাবা বুক চাপড়ে চাপড়ে গরম গরম কথা বলতে কখনো ছাড়ত না।

স্বামীর কথা মনে পড়ল বিশুর। মাথায় উকুন, গায়ে চাম-উকুন, একমুখ দাড়ি। ময়লা গেরুয়া কাপড় পরে তিন মাস চার মাস বাদে ঘুরে ঘুরে আসত লোকটা।

লে আও টাকা! হম বড়া সাধু হ্যায়! আও সাধুজনকো সেবা লাগাও!

সঙ্গে সঙ্গে দু'একটা লোকও থাকত। বিশু ওদের ভাত রেঁধে দিত, জামা-

কাপড় ক্ষার কেচে দিত, দাড়ি কাটতে পয়সা দিত।

বেশ দেখতে ছিল ময়েশের বাপ। খুব গলা ছেড়ে গান গাইতে পারত। হাত দেখতে জানত। পাড়ার ভদ্রঘরের বউ-ঝি সবাই ওর কথা শুনতে ভালবাসত। বলত, তোর কি ভাগ্য বিশু! তোর স্বামী কি সামান্য লোক?

বলত, হ্যাঁ ময়েশের বাপ, ঘরে থাক না কেন? গান গাইলে, হাত দেখলে, তাতে দুটো পয়সা তো হয়?

ময়েশের বাপ বলত, তা যা বলেছেন মায়েরা! ঘরে থাকা যে ভাল তা কি আর বুজি না? কিন্তুক কি জানেন? উ মাগীর জন্যে ঘরে থাকতে সাধ যায় না। উ কি কম বজ্জাত মেয়েছেলে! আজপুরের খোড়োঘরে লাথি মেরে উ শওরে এল। কেন এল? আমরা জানলেন, বংশ ভাল, উঁচু ঘর। নিজঘরে না রইলে মান থাকে কি?

সবাই তো বিশুকেই দোষ দিত। আহা! মানুষটা এমন গান গায়, এমন ধর্মকথা বলে! তার বউ হয়ে ঝি খাটে বিশু সেই দুঃখেই তো লোকটা দেশান্তরী। আর কি সচ্চরিত্র! ঘরে থাকুক বা না থাকুক, যখন খোঁজ চাইবে, তখনি দেখবে কোন-না-কোন শিবের থানে পড়ে আছে!

সবাই ওর কথা বিশ্বাস করত।

বিশুও বিশ্বাস করত। বিশুকে ওর দিদিমা বলেছিল—তোর তিভুবনে কেউ নি' বিশু! মানুষ নাথি-ঝাঁটা মারলেও নিহু হয়ে থাকবি!

বিশু তাই মুখ নিচু করেই থাকত। বাপ-জ্যাঠার জমি কি ছিল আর কি ছিল না বিশু কিছু জানে না। ময়েশের বাপ বিশুর দিদিমার সঙ্গে মাঝেমধ্যে কোর্ট-কাছারি যেত বটে কিন্তু কেন যেত তা বিশু জানে না।

উপেনের কথায় তাই বিশু বলল, আমাকে ময়েশের বাপ যা বলত আমি তাতেই বিশ্বাস যেতু বাপ!

ময়েশ বলল, কি ব্যাপার বলুন তো?

উপেন বলল, তোমার মায়ের বাপ-জ্যাঠার এখানে শেতলাথান ছিল। আর ছিল জমি। গড়ের জমিজমা জমিদারদের দিয়ে দেয়। তা বাদে সব ঝপাঝপ মরে গেল যখন, তখন তোমার মায়ের দিদিমা যেয়ে হাতে পায়ে ধরে তোমার মায়ের যিনি জ্যাঠা ছিল, তার শালাদের এনে এই মন্দিরে বসায়।

ঐ মন্দিরে?

অবাক হয়ে তাকাল বিশু। নিচু একতলা মন্দির। মন্দিরের ওপর নিশান বাঁধা। দুটো রোগা হ্যাংলাপনা লোক বসে ঝিমোতে ঝিমোতে মা-মা-মা-মা

বলে কীর্তন গাইছে। এই মন্দির ওর বাপ-জ্যাঠার ছিল? বাপ কেমন, জ্যাঠা কেমন, কিছুই মনে পড়ে না বিশুর, কিন্তু এখন মনে হল তারা বোধ হয় মহাপুরুষ ছিল। মানুষ তো একখানা খোড়োঘরই তুলতে পারে না। এমন মন্দির, এমন দালান যাদের থাকে তারা মহাপুরুষ ছাড়া আর কি?

ঐ মন্দিরে। কথা ছিল পুজো এখন ওরা করবে, আবার তোমার বে-থা হলে তোমার বর-ও পুজুরী হবে। যতদিন না হবে ততদিন ওরা তোমাদের মন্দিরের আয় অর্ধেক দেবে।

দিতু কি?

আ রে আমার বোকা মাধাই! দিত বইকি। না দিলে তোমার দিদিমা তোমায় পিতিপালন করল কি করে? বে' দিল কি আকাশ হতে? তোমার বরের সোম্‌সারটা কিসে চলত?

আমি জানিনি বাপ! আমায় কেউ কিছু বলতুনি।

তা বাদে কথা ছিল দেবত্ত জমি যখন, তখন বিক্রীবাটা করতে পারবে না কেউ!

উপেন বাবুর দিকে তাকাল, বাবু উপেনের দিকে। বাবু বললেন।

বিক্রী কেন করবে বাছা? লীজ দেবে। লীজ বোঝ?

না, বাবা!

উপেন বলল, সে আমি ওনাকে বুঝিয়ে দেব'খন। আপনি এখন বলুন দখল নেবার কি হবে!

দখল নিতে হবে। ঘর তুলতে হবে।

কে ঘর তুলবে, বিশু? কে দখল নেবে, বিশু আর ময়েশ?

দখল নিতে হলে তো শরীরে শক্তি চাই, লাঠি ধরবার মতো লোকজন! তা ছাড়া বুকে সাহস থাকা চাই। বিশু তো জানে কেমন করে মানুষ জমি জোর করে দখল করে, সরকারের পয়সায় কুঁড়ে তোলে!

দখল নিতে হবে বাবু?

হ্যাঁ, বাছা। দখল নিলেই ঘর তুলতে হবে। আর ঘর তুলে যদি বসে থাক বাছা, তা'লে ওরা অবিশ্যি গণ্ডগোল করবে।

কারা?

যারা পুজো কত্তেছে।

আমাকে শুনতে দাও দিখিনি?

ময়েশ এগিয়ে এল। এতক্ষণে কিছুটা আঁচ করতে পারছে ও।

অনেকক্ষণ কথাবার্তা হল। এখন বোঝা গেল এই মন্দির আর জমির ভোগস্বত্ব

আসলে বিশুর। নেহাত রক্তের গুঁড়ো। এতটুকু মেয়ে বলে ওর দিদিমা খুঁজে খুঁজে ওর জ্যাঠার শালাস্বমুন্দিদের ডেকে এনেছিল। বলেছিল ধর্মের থান বাছারা! অধম্ম করনি। মোর বিশু বড় হলে ওকে আধেক দিও।

সে আর বলতে?

জ্যাঠার শালা কচিরাম সেই দিনকালেও জানত চাষাভুষোর লোকবলই আসল বল। ওর সাতটা ছেলে ছিল। আর ছিল দজ্জাল এক বউ। ওর বউয়ের হাতের মাংস থলথল করে নড়ত।

ওরা এসে দখল করে বসেছিল সব।

তখন তো বিশ্বাসের দিন। মা-শীতলার দোর্দণ্ডপ্রতাপ। মানুষ ডালা বোঝাই চাল এনে, কালো পাঁঠা এনে শীতলার পুজো দিত।

তাই কচিরামের পাকা দালান হল। নিজের টেপাকল। ছেলেরা সবাই মন্দির আঁকড়ে পড়ে রইল। এখনো শনি-মঙ্গলবারে ওরা মন্দিরে কীর্তন গায়।

এতদিন একভাবে গিয়েছে। তারপর বছর-বিশেক ধরে ওরা একটু একটু করে দু'পাঁচঘর মানুষকে যেমন-তেমন টাকা নিয়ে জমি লীজ দিয়েছে। ময়েশের বাপ তা জানত। সে নেশাভাঙের দশ-বিশ টাকা নিয়ে কাগজে টিপ দিয়ে সরে পড়েছে। একা বিশু কোন কথা জানত না। বাবু জানতেন। সব জানতেন। কিন্তু সে টাকা যে বিশু পায় না তা তো ওঁর জানার কথা নয়! তা ছাড়া ওরা তখন বাবুর পরামর্শ নিত।

এখন ওরা আরেক বাবুর আশ্রয়ে গিয়েছে। এই বাবুর কোমরের জোর অনেক বেশি। পার্টির লোক উনি, পাড়ার কাউন্সিলার। এখন ওরা সমস্ত জমি, এই এক বিঘা চার কাঠাই টুকরো টুকরো করে একুশ বছরের লীজ দিয়ে দিতে চলেছে। তাই জানতে পেরেই উপেন আর বাবু বিশুকে খোঁজ করেছেন। বড় দয়ার প্রাণ উপেনের, বড় ধর্মপ্রাণ এই বাবু। ওঁদের তো কোন স্বার্থ নেই!

তা আমায় কি করতে হবে?

ঘর তোলবে।

কেমন করে? ওরা দেবে?

আহা! ঘর তুমি তোল না কেন? বড় জোর ঘর তুললে পরে ওরা বলবে তোমার সবটা লয়! তখন ওরা যেয়ে পার্টিশানের স্যুট করুক না। মামলা করুক।

মামলা করবে কেন গো?

আহা! পার্টিশানের স্যুট হলে ডিক্রী বেরুতে দশ বছর। তা কি ওরা জানে না? ঐ ঘর তোলাটা হল যেয়ে মস্ত প্যাঁচ। জানলে পিসী? ওরাও

তখন বলবে চল বাছা, আপসে মিটিয়ে নেই। লেখাপড়া করে তোমরা আধা নাও, আমাদের আধা থাকুক।

তা বাদে? তা বাদে কি হবে বাবা উপেন? আমার তো ভয়ে হাত-পা কালি মেরে যাচ্ছে।

উপেন মুখ খিঁচিয়ে বলল, শালা মোদের জাতের এই মরণ। মুখে মোয়া তুলে দিলেও মোয়া দেখে না! তা বাদে কি হবে শুধাও কেন গো? তা বাদে তোমাদের জমি তোমরা দু'পাঁচ হাজার করে করে লীজ ছাড়বা আর ঘরে বসে টাকা গোনবে!

ঘরে বসে?

হ্যাঁ গো পিসী। এখন হল গা কাজের সময়। এখন আর বাবুর টাইন নষ্ট করোনি।

কি করতে হবে?

বাবু কাগজে নিকে একেছেন সব! এই দাগনথি নিয়ে যেয়ে বেহালার আদালতে গিয়ে টাকা দিয়ে দলিল খালাস করুক গা ময়েশ।

ময়েশ কি পারবে?

আহা, আমি তো আছি।

তা বাদে খরচ-খরচা···

বাবু তো আছেন!

বিশু হঠাৎ কেঁদে ফেলল। মাটিতে লম্বা হয়ে পড়ে গিয়ে হাত জোড় করে বলল, একখানা খোড়োঘরের বেবস্থা আমায় করে দেন বাবু! আমি বড় অনাথিনী গো! ঝি খেটে খেটে মোর হাড়মাস কালি হয়ে গেল। একখানা খোড়োঘর হলে আমি ছেলের সোম্সারে রইতে পারি। গতর পড়ে যাচ্ছে বলে গিন্নীমা নিত্যি বলেন, বিশু এবার পত দেখ বাছা! য্যাতক্ষণ আমি আছি ত্যাতক্ষণ একরকম! কিন্তু ছেলেরা কি আমি চোখ বুজলে তোমায় এই ঘরে থাকতে দেবে, না কাজে রাখবে?

ময়েশ চোখ পাকিয়ে মা-র দিকে চাইল। ময়েশের হাতে উল্কিতে টিয়াপাখী আঁকা, পরনে রঙীন জামা, গলায় রুমাল। মা ওকে অপদস্থ করবে বলেই যেন কথাগুলো বলল।

বাবু করুণায় গলে গেলেন। একটু ঝুঁকে বললেন, ঘর হবে বইকি। খুব ভাল ঘর হবে তোমার। পাকা দালান, নিজের টেপাকল। প্রথমে অবশ্য ওদের আঁতে ঘা দেবার জন্যে খোড়োঘরই তুলতে হবে। তা বাদে ভাল ঘর হবে।

সে ঘরে বাস করা যাবে ?

বাস তো করতেই হবে। নইলে কাজ আগাবে কেন বল ?

টাকা-পয়সার কি হবে ?

আমি দেব, সব আমি দেব। ঘর তুলবার বাঁশ, খড়, ভিতের ইট, মিস্ত্রীমজুরের ব্যবস্থা সব আমার। এখন যেয়ে দলিলটা তোল আর একটা ভাল দিন দেখে ভিতটা পুজো করে ফেল, কেমন ? ঐ কচিরামের বংশ আর ওদের বাবু হারু মিত্তিরকে আমি একবার দেখে নিই !

বাবুকে পেন্নাম করে উঠে পড়ল বিশু। মন্দিরের দিকে চেয়ে মনে মনে বলল, মাগো, আমার পিতিপুরুষের হাতে তোমার পিতিষ্ঠে! আমাকে দয়া কর মা, ষোড়শোপচারে তোমায় পুজো দেব মা, সোনার নত দেব।

পথে বেরিয়ে ময়েশ বলল, উপেনজেঠা ? বাবুর নাম কি ?

রাখাল দত্ত। হেরো মিত্তিরের পিসতুত ভাই।

উনি কি এখানকার লোক ?

না বাছা ! উনিও ভিনদেশী। তোমার বাবা যখন কচিরামের চোলে পড়েছিল তখনই কচিরামকে চুমরে-চামরে রাখালবাবু বাড়ির জমি বের করে নেন।

দেবত্তরের জমি ছিল !

লীজ নিয়েছিল, সে তুমি বুঝবে না।

ঐ ওদের কাছ থেকে ?

ছিল, ময়েশের বাপও ছিল। তোমার বাপকে তো তুমি দেখুনি ময়েশ, সে তোমার জ্ঞানে নেই।

থাকবে না কেন মশায় ? মোল তো আমাদেরি রকে পড়ে। কম নিছ্‌নামাতুর কেচিছি ওর ?

সে তো শেষকালে। সে সময়ে বাপ তোমার সাধু রে, সন্ন্যিসী রে বলে যত রাজ্যের গেঁজেল-মাতালের পেছু ছুটতে লেগেছে। ঐ কচিরামের সঙ্গে কি আঁবে-দুধে ছিল তোমার বাবার ! সেই করে করেই তো কচিরাম ওকে দিব্যি হাতগস্ত করে নিলে। বললে তুমি আমার বোনাইয়ের ভাইঝি-জামাই। সন্তানতুল্য। আমারও তো তাই বট হে। তোমার দিদিশাশুড়ীর দয়ায় এটুকু করে খাচ্ছি না। তোমায় তো বঞ্চিত করতে পারব না !

ওনাকে টাকা দিত ?

অনেক টাকা পিসী ! নিজেরা দুশো নিলে, ওকে হাতে পাঁচটা টাকা দিলে। পা ধরে বললে তুমি হলে সাধুমানুষ, হ্যানো-ত্যানো কত কি। অমনি সে মানুষও

গলে জল হয়ে গেল।

কচিরাম না কে সেই লোকটা ?

না বাবা, মিছে বলব না, ঐ রাখালবাবুও ছিল। কচিরাম যেমন কচালে, আমাদের বাবু তেমনি কুচুণ্ডে। দুজনে তখন ভাব কত !

এসব কথা বিশুর কানে যাচ্ছিল কি যাচ্ছিল না। ও শুধু ভাবছিল ঘর হবে ওর, নিজের ঘর। ছ্যাচা বেড়া, খোলার চাল, জ্যৈষ্ঠে রোদে ফাটবে, ভেসে যাবে শ্রাবণে। তবু নিজের ঘর।

ভাবতেই ওর মনে হচ্ছিল স্বপ্ন দেখছে বোধ হয়। নিজের ঘর থাকা না থাকার সঙ্গে জাতে ওঠার কথা আছে তো। আসলে তো বিশুরা নিন্ম জাত নয়, আর ও যখন রক্তের ডেলা তখন যে যজ্ঞি হয়ে সবাই ভাল হিন্দু হয়ে গেল তার পর আর মন্দ জাত এ ভূ-ভারতে নেই।

সব জানে বিশু। কিন্তু সেই যে দিদিমা বলত পর-ভেতো হওয়া ভাল, পর-ঘোরো হতে নেই, সে কথা তো ও ভোলেনি !

এই তো বছর-বছর ভাদ্র মাসে ছাতামনসার ডাল ভেঙে বাস্তুপুজো হয়। যাকে বলে রান্নাপুজো। আগের রাতে রেঁধেবেড়ে পরদিন সেই আসিবাসি পাঁচ ভাজায় থালা সাজিয়ে বিশু ছেলেকে খেতে দেয়। কেন দেয় ? মনে ঐ এক আশা, বাস্তু-পুজো করতে করতে যদি নিজের ঘর হয় একদিন।

ঘর হলে জাতে উঠবে বিশু। কেউ আর দূরোছাই করতে পারবে না। এই তো আনন্দ ঝি চাটুজ্জেদের গিন্নী মরতে সংসারের ভার হাতে তুলে নিয়েছিল। কি খাটা খেটেছিল ও সংসারে তা সবাই জানে। কর্তা তো কত কি দিতে চেয়েছিল, আনন্দ নেয়নি কিছু।

এখন আনন্দ রথতলায় ভিক্ষে করে। কুটকুটে কালো রং, শরীর এঁকেবেঁকে যেন হেন্তালের লাঠি। বিষ্টি বল, বাদল বল, বটতলায় পড়ে থাকে আনন্দ। বিশুকে দেখলেই বলে আমার নয় কেউ ছিল না তাই নারকোলের আধখানা মালা নে' বেইরেছি। তোর তো ছেলে আছে, তুইও আধখানা মালা নিয়ে বেরুবি, ও ময়েশের মা ?

শুনলে কি ভয়ই পায় বিশু। ভিখিরী হয়ে পথে পথে কারা বেরোয় ? যাদের সাতকুলে কেউ নেই। ময়েশের বাপের কথাবার্তা আর কালীকেত্তন শুনে বাবুদের ঘরের বউ-ঝি সব আহা-আহা করত। তার বউ হয়ে ঝি খেটেই তো কত অন্যায় করেছে বিশু।

পরাণে আর নারাণে দুই পণ্ডিত ভাইয়ের প্রতিই বা কি সুবিচার করেছে ?

তারা কি কম মানুষ ছিল ? হলে বা কলেরা, ত্বজোড়া স্বামী-স্ত্রীকে একটা চৌকো চিতায় দাহ করা হয়েছিল যখন, তখন কি কম ধন্য ধন্য হয়েছিল চারদিকে ? রথের সময়ে নাকি কারা "সতীমাহাত্ম্য" নামে গোলাপী কাগজে পদ্যের বই ছাপিয়ে এক পয়সা করে বিক্রি করেছিল।

এখন একজনদের গোয়ালঘরের পেছনে গো-চোনার দুর্গন্ধে বোঝাই একখানা এঁদোঘরে বাস। মাঝে মাঝে গরুর খুরের খটখটানি শুনেও ভুল হয়ে যায় বুঝি কারা জুতো খটখটিয়ে বিশুকে ধরতে আসছে।

একখানা ঘর হলে সব দুঃখ ঘুচে যায়। বিশু জাতে ওঠে।

ও ময়েশ, ও উপেন ! এই তো কেমন দোকান ! এট্টু দই খাবে বাবারা ? মিষ্টি দই ?

ময়েশ অবাক হয়ে চাইল। বলল, কেন মা ?

আজ শুভদিন এট্টা।

বিশু অন্যমনস্ক হয়ে বলল। হঠাৎ, মাঝখানের সব কথা ভুলে গিয়ে ওর দিদি-মার উঠোনের মনসাগাছটার কথা মনে হয়েছে বিশুর। কেমন সড়া সডা মনসা-পাতা ! ছাতিমগাছের মতো শোভা সে পাতার। এই মনসাপাতার কাজল পরলে চোখ বাঁচে, এই ছায়ায় গেরস্থের লক্ষণ।

মনসাগাছটা বড হয়ে বেশ ছায়া-ছায়া হয়েছিল। ওর নিচে বসে বিশু ছোট-বেলা

এক পয়সা তেলের দাম—মনোরঞ্জন ব্রাহ্মণ !
বত্তিবাটি বত্তিবামুন—হে সূর্য তুমি সাক্ষী !
হাড়ের গলায় পাঁচ পাট্টি—তোল ঝাঁপ !

ছডা কেটে কেটে তেলতেলে নুড়ি দিয়ে গুটি খেলত। মাটির উঠোনে। দিদিমা বলত শানের মেঝেয় গুটিখেলার টুকটুক শব্দ হলে মা-লক্ষ্মী পালিয়ে যান। মাটির উঠোনে শব্দ হয় না।

মনসাগাছের ডাল একটা চাই। বাস্তুপুজোর সময়ে। বিশু বলল, থাও উপেন ! তুমি না হলে কে বলতে যেতু বল ! যে আঁধারে আছি সে আঁধারেই থাকতু বাপ ! আর কিছু হতুনি। তবে এট্টা কথা !

কি ?

ঐ, জ্যাঠার শালার ছেলেগুলোর সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ না করে ভাবেসাবে কাজ করলে ভাল হতু না ?

ভাব করতে হয় পরে করো পিসী। এখন তোমাদের জমিতে ওদের হক থাক্ বা না থাক্, ওরা বাস করতে করতে এট্টা হক জন্মেছে। তা ভিন্ন তল্লাটের লোক, তুমি ধরগা, ওদেরি চেনে! তোমাদের নাম আদালতের দলিলে আছে কিন্তুক সে সংবাদ তো সবাই রাখে না। তোমাদের ঘরখানা উঠুক! এবার তোমরা এসে এখানে বাবুর বাড়ি থিতু হয়ে বসো। বসে ঘরখানা করে নাও। তোমাদের ঘরে যেমন তোমরা উঠবে, ওরা এসে বলবে সম্পত্তি ভাগ হোক!

বলবে?

বলবে বইকি! আমরাও বলব ভাগ হোক। তা বাদে সব মানুষ এসে দাঁড়িয়ে ভাগজোক করে দেবে।

ময়েশের মুখ সন্দেহে কুটিল হয়ে রইল। বিশুকে ঘরের টাকা দেবে বাবু, দলিল তুলতে খরচ দেবে, কেন দেবে? মাকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে বলল, কারো কাছে বলতে বসনি যেন। দিনকাল তেমন কি!

না বলে কেমন করে পারবে বিশু? বৌ-বরণের গরম ছুধের মতো, চোখের জলের মতো, বিশুর বুক থেকে আবেগ উথলে উথলে উঠল।

ও পিসী, কাজে যাবে না? মা ডাকলে।

আর কাজে যাবে না গোপাল, পিসীর এখন অনেক কাজ গো!

কাজের জন্মেই তো ডাকলে।

নিজের কাজ গো, নিজের কাজ!

পিসীর যে নিজের কাজ থাকতে পারে তা জেনে গোপাল অবাক হয়ে গেল। পিসী তো তাদের কাজ করে, চাটুজ্জেদের বাসন মাজে, গোয়াল কাড়ে। পিসী তো বোসদের বাড়ি বসে বসে কয়লার গুল দেয়, নারকেলপাতা চাঁছে।

অ গোপাল, এট্টা কাটারি দে!

কেন পিসী?

মনসাডাল এনে ওঠোনে পুঁতে রাখি, নয়তো পুকুরপাড়ে?

মনসাডাল, পিসী?

পিসীর যে ঘর হবে বাপ! বাস্তুপুজো করতে হবে না?

বিছানা-মাতুর বার কচ্ছ যে?

বিশু ভরত্বপুরে বিছানা-মাতুর নিয়ে পুকুরে গেল। এঁটোকাঁটার কাজ, অপবিত্র কাজ। সব পরিষ্কার আর শুচি করে নিতে হবে। তারপর ঘর বাঁধা। তারপর ঠাকুরপুজোয় গিয়ে হামি হয়ে দাঁড়ানো। তারপর শুধু ধূপ-ধুনো ঠাকুরের নামগান! মটকার থান পরে বিশু হেঁটে যায়, সবাই বলে, কে গো! কি গো! সবাই বলে

পণ্ডিতদের ওয়া'রিস উনি ! উনিরই সব !

বিশুর মনিবরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন। তারপর গিন্নী বললেন, লোকবল নেই, অর্থবল নেই, পারবে বাছা ? ছেলে তো সুপুত্তুর ! মা মরলে চেয়ে দেখবে না। ঘর যে ছাড়ছ বিশু, এ ঘর এখনি কিন্তু ভাড়া বসে যাবে।

বিশু গিন্নীর দিকে নয়, রান্নাঘরের বারান্দার দিকে চেয়ে রইল। কেমন তাল-গাছটা উঠেছে। কেমন কাঁঠালগাছটা। এইরকম পাকা গাছে তক্তা, খুঁটি সব ভাল হয়।

তারপর বিশু একদিন উপেনের সঙ্গে ওখানে গিয়ে উঠল। ময়েশের বউ বাস্তু-পুজোর দিন এসে চলে গেল। বলল, কোথায় থাকবে মা ? শওর নয়, বাজার নয়। ওঃ, কচুগাছের জঙ্গল দেখেছ ? ঘরদোর হলে একরকম ! এখন এখানে কে থাকবে বল ?

বাবু বললেন, এই তো বাস্তুপুজো হয়ে গেল। ও-পক্ষের সাড়াশব্দ পেলে কিছু ?

না।

আহ্লাদে ডগমগ বিশু, যেন বাবুর বাড়ির একখানা খুপরিতে বাস করে, বাপ-জেঠার দেবত্র জমিতে মনসা পুঁতে এখনি ও জাতে উঠে গিয়েছে। ও এখন বন্যা-ত্রাণের দিদিমণি ! কাপড়, খাবার জনে জনে বিলোতে পারে। ও এখন চাটুজ্জে-জেঠাইমা ! সত্যনারায়ণের প্রসাদ বিলিয়ে বছরে কয়েকবার অন্নপূর্ণা হয়ে বসে থাকে ! বিশু তাই কচিরামদের বাড়ি একথালা প্রসাদ পাঠিয়ে দিল।

পরদিন রাখাল দত্ত মুখ অন্ধকার করে বিশুকে ডাকলেন। বললেন, তোমারি সব বাছা ! নেয্য জিনিস ! কিন্তু আমার পরামর্শ নেবে তো ? তুমি কি এ জায়গার চাল-চলতি জান ?

কেন বাবা ? কি দোষ হয়ে গেল ?

তোমার পেসাদ ওরা ছাগলের সামনে এটু দিয়েছিল। খেয়ে ছাগলটা ছট-ফটিয়ে মরে গেল। এখন, বিষ্যুৎবারে পুকুরের পশ্চিমপাড়ে, বুঝলে না, ছাগলের অপঘাত মরণটা ভাল দেখায় না !

মরে গেল কেন ? সাপ কামড়ায়নি তো ?

সর্পাঘাত হতে পারে। আবার ওরা বলছে তুমি দেইজি করে বিষ দিইছিলে।

বিশু তো প্রথমে অবাক হল, তারপর কাঁদতে শুরু করল। বাবু বললেন, কচিরামের ঝাড় তো ওরা ! জাতসাপের বংশ ! ছোবল না দিয়ে একটা কথা কবে না। দেখ ! যতক্ষণ না ঘর ওঠে, আর যতক্ষণ না সে ঘরে তুমি বাস করতে পার, ততক্ষণ জেনো বিপদ আছে।

আমার তুমি আছ বাবা !

মনে মনে জাতে উঠেছে বিশু। ময়েশের সঙ্গে এক করে ফেলেছে রাখাল দত্তকে। রাখালবাবুর সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল, কিন্তু তিনি কথা বললেন না। বরঞ্চ ঠিক করলেন ভেতরে বলে দিতে হবে বিশুকে তুইয়ে-তুষিয়ে রাখতে।

বিশুর ঘর উঠল।

দুটো-তিনটে মজুর এল। বাঁশ রে, খুঁটি রে, খোলা রে, বেড়া রে !

শুধু ঘরের চেহারা বিশুর মনের মতো নয়। ঘর হবে—সে-ঘরে এদিক থেকে ওদিক হেঁটে চলে যাওয়া যাবে। পুবের রোদে ভোরবেলা বসা যাবে, সন্ধ্যেবেলা দক্ষিণের দাওয়ায়। এই এত এত জমি বিশুর, ঘর এত ছোট কেন ?

ও বাবা রাখাল, ঘর যে খেলনাঘর ! মজুরগুলো বলে তুমি নাকি মোটে ওদের দেড়শো টাকা দিয়েছ ?

আহা ঘরে গিয়ে ওঠ না গো ! দখলপত্তন ঠিক হোক, কোটা তুলে দেব।

ময়েশ বললে ধুত্তোরি, তাই বিশু গিয়ে ওর নতুন ঘরে শুয়ে রইল। নতুন ঘর নিজের ঘর। সে-ঘরের গন্ধ অব্দি অন্যরকম। মনে মনে বলল, যদি ভালয় ভালয় ভাব হয়ে যায় তবে যেয়ে কচিরামের বাড়িতে সবাইকে নেমন্তন্ন করব। খোরো গেরস্থর আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেইজি করা ঠিক নয়।

বিশু যখন ঘুমে অচেতন তখন কচিরামের ছেলেরা রাখালবাবুর কাছে গেল। আবার উপেন এল। দোর বন্ধ করে আলো জেলে অনেক কথা হল সকলের। এতদিন তো বিশুর কোনো খোঁজ ছিল না, বেশ তো কচিরামরা লীজ দিচ্ছিল, রাখালবাবুর বাড়িতে কথাবার্তা হচ্ছিল। ময়েশের বাপ যতদিন ছিল, ছিল। ময়েশরা তো কিছুই জানত না। কি দরকার ছিল রাখালবাবুর খাল কেটে কুমীর আনবার ?

রাখালবাবু বললেন, বাছা ! জাতসাপের ন্যাজে পা দেবে, এট্টু ছোবল খাবে না ?

নেন বাবু, যা হয় ঠিক করেন। দিনকাল ভাল নয়। জবরদখলের দিন। ঐ যে যা বলে এট্টা বেবস্থা করে পার্টি বসিয়ে দিন।

তবে যাও, ময়েশের নামে একটা ডায়েরী করে এস।

সে করা আছে মশায়। এখন আপনি তাকে এনে এখানে রাত্তিবাস করান দেখি ? বেটাছেলে নইলে কি আর ফোজদুরী হয় ?

উপেন উসখুস করে বললে, কাজটা ঠিক ধম্ম হয় না তো ? ময়েশের মা স্ত্রীলোক, তায় বুড়ো হয়েছে। ওরে কিছু টাকা দে সইরে দিলে হত না ?

রাখালবাবু বললেন, বুড়ো হয়েছে! বুড়ো হয়েছে তো এত লোভ কিসের? তিনকাল গেল ঝি খেটে এখন উনি কাঁঠালকাঠের চৈকিতে শুতে চান!

উপেন বললে, আমাকে মাপ করে দেন বাবু। চক্ষে বসে বসে ওটা আর নাই বা দেখলাম।

উপেন বিশুর কাছে গেল।

ও পিসী, ও ময়েশের মা! একবার যাবে? আমার দেশে যাবে?

কেন?

এই ধর যেয়ে সব দেখে আসবে!

কি যে বল বাবা! আমার হল যেয়ে নতুন সোম্‌সার। হাঁ দেখ, ও-পক্ষ তো কোনো সাড়া দেয় না, আজ একদফা মায়ের থানেও ঘুরে এনু। রাখাল ছেলেকে বল দিকি, পিসীর ঘরটা পাকা করে দাও। আর একটা কল-সেজখানা নইলে কি আর গেরস্ত হয়?

তোমার কাগজ দলিল কোথায় পিসী?

সব ঐ রাখাল ছেলের কাছে। ঐ তোলালে, ঐ রেখেছে।

উপেন বিড়বিড় করে বলল, ডাইনের হাতে ছেলের আত্তি!

জোরে বলল, পিসী, চললাম গো!

তার কয়েক দিন বাদেই বিশুর ঘর ছাই হয়ে গেল। কি যে হল, কেমন করে যে হল কিছুই বুঝলে না বিশু। কারা ওর ঘরে আগুন দিলে, কারা ময়েশকে দাঙ্গা-হাঙ্গামার জন্যে ফৌজদারীতে ফেললে, কেন রাখালবাবু সেই সময়টাই এখানে রইলেন না, কেন বিশুকে অনেক অনেক ভাল কথা বলেও থানাবাবুরা পাড়া ছেড়ে চলে যেতে বললে!

নয়তো মামলা কর। মামলা মানে উকীল-মোক্তার-টাকার খেলা। ময়েশের তিন মাস জেল হয়ে গেল। ময়েশের বউ বিশুকে দাওয়ায় অব্দি উঠতে দিলে না। হেঁটে হেঁটে আদালতের গাছতলায় বসে কেঁদে কেঁদে বিশুর চোখ ঝাপসা হয়ে গেল একেবারে।

ময়েশকে দেখতে গেল বিশু জেলে নিয়ে যাবার কালে। তা ময়েশ বললে, ছেলে-ছেলে কারে কত্তেছ? তুমি আমার কেউ নও। আমি তোমার কেউ নই!

আমার কি হবে ময়েশ?

যাও, ভিখ মাঙ্‌গা যেয়ে!

অঝোরে কাঁদল বিশু। পুরনো মনিববাড়িতে ওর জায়গা নেই, দেশঘর বলে ও কিছু মনে করতে পারে না। ঝি কাজ করে স্বামীর নাম ডুবিয়েছিল একদিন,

আবার অতি লোভ করতে গিয়ে তার দোষে ছেলেটা জেলে গেল।

তিনটে মাস আমায় চরণে ঠাঁই দেন মা! মাইনে চাই না, বাঁসনকোসন মাজব, পড়ে থাকব। ময়েশ না বেরোলে তো আমার উপায় হবার নয়।

গিন্নীর দয়া হল। বললেন, তোমার ঘর তো রাখিনি বাছা। তবে ঐ গোয়াল-ঘরে যদি পড়ে থাকতে পার তাই দেখ।

বুড়ো গাইটাও দুধ দেয় না। বিশুরও আর তেমন গতর নেই। রাতে শুয়ে শুয়ে বিশু গোরুটার নিশ্বাসের শব্দ শোনে আব ভাবে, গোরু মরলে মুচি চামড়া নেয়, শিংজোড়া বিক্রি হয়। মাংস শেয়াল-শকুন খায় বটে কিন্তু হাড় থেকে সার হয়। বিশু মরলে কি হবে? ময়েশ ওকে আগুন দেবে তো?

জেল থেকে বেরিয়ে ময়েশ ওকে ক্ষমাঘেন্না করে আশ্রয় দেবে এই ভরসায় জেল-খালাসের দিন বিশু গিন্নীমার নাতি জটেশ্বরের সঙ্গে জেলের ফটকে গেল।

ময়েশ খালাস হয়ে গিয়েছে আগের দিন। চলে গিয়েছে কোথায়। বিশুকে ওরা ঠিক তারিখটা অব্দি বলেনি। ঐ ময়েশের শ্বশুরবাড়ির লোকেরা। সেপাইটা বা কি অনামুখো গো! বিশু তো ওকেও সাধ্যমত পান খেতে দিত, সেপাই বাবা বলে গড় হয়ে নমস্কার করত!

ঝিমঝিমে বিষ্টি। ভাদুরে আকাশে ঘোলা মেঘ। ট্রাম থেকে নেমে পড়ল বিশু। জটেশ্বরকে বলল, তুই যা বাবা, আমি এট্টু মায়ের মন্দির হয়ে আসি।

সেই যে নামল, আর ফিরে গেল না বিশু। মায়ের মন্দিরের চারদিকে সোম্-সারের ভিখিরী। কারো কি ঘর ছিল না গো? কারা বুঝি প্রেতকাজ করে বেরুচ্ছে, কুচো-কুচো এক পয়সা ছিটোচ্ছে। বিশুও একটা পেল, অবাক হয়ে চাইল। ওর পাশের মেয়েটা বলল, নতুন বুঝি? তা এট্টা নারকেলমালা, না হোক অ্যালুমিনির বাটি আনবে তো? এখানকার কথা কে বললে? পাঁচী? দেখ, বাবুরা বলে গতর খাটিয়ে খাও! গতর খাটাবার চেয়ে এ এমন মন্দ কাজ নয়কো। তুমি আমাদের কাছে থাক বাছা। তোমার মুখখানা বেশ ভদ্দর-ভদ্দর, কাঁদ-কাঁদ। দেখে বাবুদের মায়া হবে। চা খাবে?

জীবনে এই প্রথম বিশুকে কেউ আদর করে ডাকল, সমাজে নিতে চাইল।

বিশুর চোখ জলে ভেসে গেল। কত বড় সমাজের মানুষ সে এখন! শ্রেণী হারাতে হারাতে সে এখন ভারতের নিঃস্ব-দরিদ্র-উপবাসীর শ্রেণীতে পৌছে গিয়েছে। তার শ্রেণী তার সমাজ সব চেয়ে বড়, সব চেয়ে বেশি সে সমাজের ক্ষমতা। ভিখিরীর জাত মারে কে?

মায়ের মন্দিরের ওপরে ফ্যাকাশে নীল আকাশে কাক উড়ছে। এখন ঐ

আকাশ তার মাথার ওপর ছাত, তার ঘরে চাঁদসূর্য আলো দেয়। মেঘ ছায়া ধরে। বিশালাক্ষীর ঘর এখন আর কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। বিশ্বসংসারের সব পথঘাট বিশুর। বিশু নিজের ঘরে হাঁটতে লাগল। কি বড় ঘর গো, দেওয়ালের বাঁধাবাঁধি নেই।

হারুণ সালেমের মাসি

অঘ্রানের সকালে জলের ওপর ঠাণ্ডা সর ভাঙেনি, বাস-স্ট্যাণ্ডের চায়ের দোকানে উনুন ধরেনি, হারা গৌরবীর উঠোনে এসে দাঁড়াল। হারার বয়স সাত হলে কি হয়, জ্বরে জ্বরে জিভ এড়ে কথা ওর সড়গড় হয়নি এখনো। মাঝে মাঝে কথা আটকে যায়। হারা বলল, 'মা ললে না মাসি! ডেকে ডেকে দেখলাম মা রা দেয় না।'

গৌরবী ওর নিড়িনি আর থলি খুঁজছিল। হাতে নিড়িনি নিয়ে পেট-কাপড়ে থলিটা গুঁজে গৌরবী আর হারার মা বিলের ধারে, খালপাড়ে থানকুনি পাতা তোলে, কচুশাক কাটে। যজ্ঞডুমুরের ডাল, দুর্বোঘাস, বেলপাতা, যা পায় সব ওরা বেচে দেয় যশোদের কাছে। যশোদা ক'জন রোজ সকালের গাড়িতে কলকাতা যায়, দুপুরে ফেরে।

গৌরবী যায় না। গৌরবীর একখানা পা জন্ম থেকে খুঁতো। গোড়ালি আর পাতা বাঁকা। আঙুলগুলো পেছনে বাঁকানো। গৌরবী তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারে না। শাক পাতা গুগলি তুলতে হারার মা-র ওপরই ওর নির্ভর।

ঈশ্বরের জিনিস তো! শাকে পাতায় দোষ নেই।

হারার কথা শুনে গৌরবী অবাক হয়ে গেল। বলল, 'রা কাড়ে না কেন?'

'জানি না।'

'র!'

গৌরবী হারার পেছন পেছন পা টেনে টেনে হারাদের ঘরে গেল। হারার বাবা ঘরামি ছিল। ঘরখানা খুব উঁচু করে বেঁধেছিল। মাথা তুলে দেখতে হত। ঘর তোলার কিছুদিন বাদেই হারার বাবা মরে যায়। ওর মাথার বালিশের নিচে রূপোর হাঁশুলির মতো চকচকে নিয়ড়চাঁদা সাপ ছিল। হাতের আঙুল থেকে বিষ খুব তাড়াতাড়ি মাথায় উঠে গিয়েছিল।

মাদুর মুড়ে হারার বাবাকে উঠোনসই করবার পর ওর সমাজের লোকরাই, 'ওঃ! ঘর তুলেছিল যেমন কোঠাবাড়ি' বলে মাটিতে থুতু ফেলেছিল।

তখন হারার মা বুঝতে পেরেছিল অতখানি উঁচু ঘর তোলাটা সমাজের মানুষ ভাল চোখে দেখেনি। মনে করেছে কাঙালের আস্পর্দা। তোমার ছেলে-বিবির ভিখিরির দশা। তুমি সামান্য ঘরামি। তুমি পালবাবুদের চেয়ে উঁচু ঘর তোল কেন? সেই ঘরেই শুয়েছিল হারার মা। রোজই ওর রাতে জ্বর হয় আর চোখের ওপর

হাত চাপা দিয়ে শুয়ে শুয়ে ও কাঁদে। গৌরবীর হঠাৎ ভুল হয়ে গেল।

'আ লো মাগী! কাঁদিস না কি?'

বলে নিচু হয়েই গৌরবী মুখ তুলল। পেছনে সরে এল। দরজার কপাট ঠেলে দিয়ে হারাকে বলল, 'খবর দে হারা কাকাকে। বল মাসি ডাকে।'

হারার কাকা বাস-স্ট্যাণ্ডে মাঝে মাঝে থাকে, মোট বয়। আজ ছিল না। দুপুর পেরিয়ে বিকেল নাগাত রাজমিস্ত্রী পাড়ার ক'জন এসে হারার মা আয়েছা বিবিকে তুলে নিয়ে গেল। গৌরবী বলল, 'সঙ্গে যা হারা। মাটি দে।'

বিকেলের পড়ন্ত আলোয় একা একা যজ্ঞডুমুরের ডাল ভাঙতে ভাঙতে গৌরবীর নিজের জন্যে বড় কষ্ট হল। হারার মা ছেলের হাতের মাটি পেল, ভাগ্যে ছিল। নিজের ঘরে শুয়ে মরল, কপালে ছিল।

'আমি বা কোথায় মরব, কে মুখ শলা করবে কে জানে!'

এইসব সময়ে গৌরবীর বড় কষ্ট হয়। ও রেললাইনের দিকে চেয়ে থাকে। কয়েকটা স্টেশনের পথ মাত্র। সেখানে গৌরবীর সমাজের লোকরা জমি পেয়েছে, ঘর বেঁধেছে। ওর ছেলে নিবারণ সেখানেই আছে।

গৌরবীও থাকতে পারত। নিবারণ থাকতে দিল না। মানুষের বউ এসে শাশুড়ীকে পর করে। গৌরবীর কপালে তা হয়নি। বউ কিছু বলবার আগেই নিবারণ বলেছিল, 'এবার পুঁটির কাছে যাও গিয়া। মাঝে-মধ্যে আমি খবর দিব।'

'মেয়ের কাছে?'

'কেন, মনে নাই?'

তখনি গৌরবী বুঝেছিল কি ভয়ানক প্রতিহিংসা নিবারণের, কিছুই ও ভোলে না। বাসের কণ্ডাক্টারকে জামাই করতে গিয়ে নিবারণের বাবা ঘর তৈরির টাকা ভেঙে ঘড়ি, সাইকেল, টর্চ কিনেছিল। নিবারণের বয়স তখন অনেক কম। সাইকেলটা দেখতে দেখতে ও বলেছিল, 'সব একজনকে দিবি? তোমার একটা সন্তান?'

বাপ-ছেলেতে খুব বেধেছিল। গৌরবী বলেছিল, 'তোর এত বিষ কেন? সময়ে পুঁটি আমায় ভাত দিবে। কোন মেয়েটা আজকাল মা-বাপকে দেখে না বল?'

'ভাল। সময়ে বুঝা যাবে।' নিবারণ বলেছিল।

তার পর কত বছর ধরে নিবারণ চেষ্টা করে ঘর তুলল, মেঝেটা পাকা করল। নিজে বিয়ে করতে না করতে মাকে ভাত দিতে অস্বীকার হল।

সে আজ আট বছরের কথা। বাসের চাকরি খুইয়ে জামাই বহুদিন ঘরে বসা,

মেয়েও এ-বাড়ি ও-বাড়ি কাজ করে। গৌরবী আজ ছ-সাত বছর ধরে এই গ্রামে আছে। মেয়ের বাড়িতে গৌরবীর দুরবস্থা দেখে গৌরবীকে এখানে নিয়ে আসে মুকুন্দ। বড় যোগাড়ে মানুষ মুকুন্দ, হাতে পায়ে অসুরের বল। এ তল্লাট দিয়ে তিন-চার জায়গায় জমি করে ফেলেছে। আজকাল মানুষ বড় মন্দ হয়ে গেছে। ঘর জমিতে বসত না থাকলেই জবরদখল।

'ঘরটু'নি ধরে বসে থাক পিসী! নিবারণ যা হয় দেবে! উঠোনে যা হয় দুটো শাক-পাতা আজ্জে খেতে পারবে না?'

'বেঁচে থাক বাপ!'

বলে গৌরবী এখানে এসে উঠেছিল। বড যেন ভেতর পানে ঢোকানো গ্রাম। গ্রাম বললে হয়, না বললেও হয়। না বড়রাস্তার ওপর, না শহরের খুব কাছে। গৌরবী ভেবে পায়নি এখানে সে কেমন করে এক বেলা দুটো ভাত জোটাবে। নিবারণ এখন প্রাইভেট বাসের টিকিটবাবু। মা-কে মাসে পাঁচটা করে টাকা দিয়েছিল ক' মাস, তারপর আর দেয়নি।

খিদের জালায় গৌরবী মাঝে মাঝে মেটে আলু সেদ্ধ করে খেয়েছে। কাঠের আগুনের তাতে বসে বসে কত সময়, যেন আগের জন্মে শোনা রূপকথার মতো ঝি-কালের বউ-কালের শোনা কথা মনে পড়েছে। ফেলে আসা দেশে ঘরে শোনা কথা। পুকুরঘাটে বাসন মাজতে মাজতে শোনা কথা।

'অ পারুলের মা! মেয়ারে কেমন বা বিয়া দিছ?'

'ভাল দিদি! চার ওক্ত গরম ভাত খায়!'

গৌরবীকে দেখে দেখে ঐ হারার মা বলেছিল, 'যখন যেমন তখন তেমন চললে আমানি জোটে না? আমাদের জোটে কেমন করে?'

'কেমন করে?'

'নারকেল পাতা চাছ, কাঠি নে কুস্তে বাঁধ। শাক গুগলি, জগডুমুরের ডাল নে যশিদের দাও। বিকেলে পয়সা দে যাবে।'

হারার মা-র নামটা অব্দি গৌরবী জানত না। শুধু রমজানের মাস পালন করতে দেখে বুঝেছিল ওদের সমাজ আলাদা।

'আমার পা লেংড়া, আমি শওরে যাই না। তুই যাস না কেন?' গৌরবী জিজ্ঞেস করেছিল।

হারার মা নিঃশ্বাস ফেলে বলেছিল, 'ডরাই দিদি! ভয় হয়!'

না, গৌরবীর দাওয়ায় উঠে বসেনি হারার মা রান্নার সময়। কিন্তু উঠোনে বসেছে, উকুন বেছেছে। একই সঙ্গে দুজনে বাস-রাস্তায় বসে বসে হাটুরেদের বাজার

ফেরত ফেলে' যাওয়া বাঁধাকপির বুড়ো পাতা, থেঁতলে যাওয়া বিলিতি বেগুন 'কুড়িয়েছে।

সেই হারার মা ড্যাং-ডেঙিয়ে চলে গেল। বড় দুঃখ হল গৌরবীর। তারপর মনে হল তার চেয়ে হারার মা ভাগ্যবতী।

'হারাটার কি হল যশি? ওর কাকা নিয়ে গেল?'

'কে জানে মা।'

যশি প্রায় ছুটে চলে গেল। যশিরা হাঁটে না, ছোটে। আসলে ওরা চাল বয়। শহরে যায়। সঙ্গে শাকপাতা, নারকেল পাতার কাঠি, যা পায় নেয়। দাঁড়িয়ে কথা ওরা সকালবেলা বলতে পারে না।

গৌরবী মাথা নাড়ল। হারা প্রায়ই ওর উঠোনে বসে থাকে। গাছের ছায়ায় ঘুমোয়। মা-র গাছের ধুঁধুলটা, চিচিঙ্গেটা গৌরবীকে দিয়ে যায়। হারার মাথাটা বড়, শরীর রোগা। উপোস করা অভ্যেস হয়ে গেছে বলে চোখে একটা বিজ্ঞ ভাব। যেন ও সব জানে।

'কাকার সাথে গেল বুঝি?'

ভাবতেই ওর কষ্ট হল। আজ ক'বছর ধরে হারা আর হারার মা ওকে ওর নিঃসঙ্গতা ভুলিয়ে রেখেছে। ওদের কথা ভাবতে হঠাৎ গৌরবীর মনে হল কাপড়-খানা কেচে ধুয়ে চুলটা আঁচড়ে একবার নিবারণের কাছে গিয়ে দাঁড়ালে কেমন হয়?

'দুটো ভাত দে নিবারণ।' বলে কেঁদে পড়লে কি নিবারণ মা-কে ফেলে দেবে?

ভাবতে ভাবতে গৌরবী একটা মস্তবড় নারকেল পাতা টানতে টানতে ঘরে ফিরল। পাতা চেঁছে কাঠি বের করা বেশ কাজ। অনেকটা সময় তাতে যায়। বাকি সময়টা আঙুলের আন্দাজে উকুন বেছে বেছে কাটানো যায়। সন্ধ্যেবেলা তো এক-গাল খুদ চিবিয়ে এক ঘটি জল খেয়ে ঘুমিয়ে পডলেই হয়।

বাড়ি ফিরে গৌরবী দেখল উঠোনে হারা বসে আছে। অবাক হয়ে গৌরবী বলল, 'তুই?'

'কাকা আসতে বল্ল।'

'এখানে?'

'বল্ল যেথা খুশি সেথা যেয়ে মর গা!'

'সেকি?'

'বল্ল...'

হারা আঙুলের কর গুণে গুণে মনে করে করে বলল, 'কাকার ঘরে কাকী নেই।

'তোর নিজের কাকা?'

'মা বলত নিজের নয়।'

'তোর নিজের কে আছে?'

'মা বলত কেও নাই।'

'যা, দাওয়ায় খেয়ে শো গা!'

গৌরবী নিজে একগাল খুদ খেল, হারাকে একগাল দিল। তারপর চাটাই বিছিয়ে গড়াতে গড়াতে ভেবে-চিন্তে ওর মাথা ঘুরে গেল। হারা কি ওর কাছেই থাকবে নাকি? কি বিপদ, কি বিপদ! ওর নিজের বলতে কেউ নেই?

হারার মা-র কথা মনে পড়ল। ছেঁড়া কাপড় গেরো দিয়ে পরা, রোগা ছিপ-ছিপে মানুষ, একমাথা রুক্ষ চুল। চুলের বাহার খুব। কোঁকড়া, ফুরফুরে। গলায় একটা মাদুলি ছাড়া গয়না নেই। দুঃখীর দুঃখী, দরিদ্রের দরিদ্র। এমন গরিব দেখলে গৌরবীর বউকালে শাশুড়ীরা বলত, 'তেলজল দেও, মাথায় দেউক! ভাত দাও, পেটে খাউক!'

নিজের কেউ থাকলে এমন অবস্থা হত কি? অসম্ভব দুশ্চিন্তা হল গৌরবীর। হারার মা-র নয় সাতকুলে কেউ নেই, তা বলে গৌরবী কি করবে? তার নিজের আধপেটা অন্ন জোটে কি না জোটে! তাছাড়া! গৌরবী কেমন করে বা হারাকে ঠাঁই দেয়? হারা কি তার ধর্মের মানুষ, না সমাজের?

হারা ঘুমের মধ্যে অল্প অল্প ফোঁপাচ্ছে।

'বুঝি মা-র কথা ভাবে!' গৌরবী অস্ফুটে বলল। তারপর চাটাইটা নিয়ে হারার কাছে গেল। হারার গায়ে হাত দিয়ে বলল, 'কাত ফিরে শো হারা! স্বপ্ন দেখিস, ভয় কি?'

গৌরবী মনে মনে ঠাকুরকে ডেকে চোখ বুজল। দিনমানে ও যা পায় না, স্বপ্নে অনেক সময়ে তা পেয়ে যায়। স্বপ্নের গৌরবীর মাথায় তেল জবজব করে, পরনে গোটা কাপড়, পেটে ভাত। স্বপ্নের গৌরবীকে নিবারণ মাথায় করে রাখে। আজ স্বপ্নে ওকে হারার মা হাত ধরে নিয়ে গেল এক আশ্চর্য দেশে। সেখানে থানকুনি পাতা দুবোঘাসের মেলা। মাদারগাছের ছায়ায় ঢেঁকিশাকের জঙ্গল। এত শাক-পাতা সব দু হাতে তুলতে তুলতে গৌরবীর মনে হল এই তো স্বর্গ। তার স্বর্গ আর হারার মা-র স্বর্গ কি এক হতে পারে? নাকি সব গরিবের স্বর্গ আসলে এক?

সকালবেলা গৌরবী হারাকে বলল, 'খালপাড়ে যা হারা। যশিকে বল্ আমার দেহ ভাল নয়, যেন দেখা করে। আর দেখ্, যদি কেউ বলে রাতে কোথায় ছিলি,

হারা ভুরু কুঁচকে একটু বুঝতে চেষ্টা করল। সব কথা ওর মনে থাকে না সেই জন্যেই ও কর গোণে নয় তো সুতোয় গিঁট দেয়। হারা বলল, 'লখার মাকে বলব মাসির দেহ ভাল নয়। আর ?'

'যদি কেউ বলে রাতে কোথা ছিলি…'

'বলব মাসির ওটোনে। এই তো ?'

'এই নেকড়াটা নে হারা। থানকুনো পাতা তুলবি।'

গৌরবী হাঁড়ি-পাতিল নেড়ে চেড়ে ক' 'াল মিয়োনো চালভাজা পেল। হারাকে টোপলা বেঁধে দিল। বলল, 'নে। জল খাস। যশি যদি পারে জানি আমার উঠোন ঘুরে যায়।

হারা চলে গেল। গৌরবী উঠোন ঝাঁট দিল। শুকনো পাতা, কাঠি, শুকনো ডালে জ্বালানির কাজটা চলে। গৌরবীর মনে পড়ে ওর মা বামুনদের গাই বিয়োলে বকনা বাছুর এনে পালত। বাছুর বড় হত। তার খোল, খড়, গুড়, সব খরচ মা করত। গোবর দিয়ে ঘুঁটে দিত, গুল দিত। বড় হয়ে সেই গাই এক বিয়ানি হলে মা গাইটা ফেরত দিত, বাছুরটা মা পেত। বকনা হলে পাল, এঁড়ে হলে যাদের হাল আছে তাদের বেচ।

এ গ্রামে যে মানুষ বলতে নেই। গৌরবীকে কেউ অমন একটা বাছুর পালাতে দেয়! নিজের বলতে একটা ছাগল। একটা বকনা গাই থাকলে কি গৌরবীর আজ এই দশা হয় ?

থলিতে চাল সামান্যই ছিল। চালে, ডুমুরে, মোচার কোলের কচি ফুলটায়, নুনে একসঙ্গে জাউ বসিয়ে দিয়ে গৌরবী ভেবে পেল না এরপর হারা আর ও কেমন করে একবেলা একমুঠো খাবে।

এখন ওর হারার মা-র ওপর রাগ হল। কি বেআক্কেল মানুষ বল, কি অবিবেচক!

'মাগীর সাতকুলে কেউ নেই, আমার ভরসায় ছেলে রেখে চোখ বুজল। এখন জাত বা কেমন করে থাকে, ধর্মের বা কি হয়!'

খুব রাগ হতে লাগল গৌরবীর। কিন্তু অনেক বেলায় হারা যখন এসে বলল, 'মাসি, মেটে আলু আন্না করবে ?' তখন গৌরবীর মুখ হাসিতে ভরে গেল।

'কত বড়টা রে! কোথায় পেলি ?'

'ঘরে ছিল। মা বলেছিল…' হারা কর গুণে গুণে বলল, 'মাসিকে দিস হারা! আর বলেছিল…'

'কি ?'

'মাসির পা ধরে পড়ে থাকিস।'

'বলেছিল !'

গৌরবীর শুকনো বুকে যেন কিসের ঢেউ লাগল। নিবারণ যখন ছোট ছিল, সাবিত্রী যখন হামা টানে, তখন ঘর নিকোতে নিকোতে, বাসন মাজতে মাজতে ওদের কান্না শুনলে বুকের ভেতর এমনি হত বটে।

নিবারণ তো ওকে চায় না। সাবিত্রী এখন নিজের সংসারে ভাত জোটাতে হিমসিম খায়। ওদের ওখানে থাকতে তো গৌরবীর নিজেকে শুধুই এঁটো পাতা মনে হত, মনে হত গত বছরের মনসাপুজোর ঘটটা যেন ! ফেলে দিলেই হয়।

হারার মা ওর কথাই হারাকে বলেছিল। বড় ভাল লাগল গৌরবীর। নিজেকে বড় প্রয়োজনীয় মনে হল হঠাৎ। গৌরবী সামান্য স্নেহমমতায়, মিষ্টি কথায়, আবেগে গলে যেতে পারে। এখন ও নাক টেনে, চোখ মুছে বলল, 'দুঃখী আরেক দুঃখীর মন বুঝে। তাই বলেছিল। নে হারা, মেলা কর্ ! পুকুরে যা।'

বিকেলে যশি এসে উঠোনে বসল। যাওয়ার সময় ছুটে ছুটে যায় যশি। ওদের পুরুষরা কোনদিন ভাত-কাপড দেয় না, যশির বরও দেয় না। ওদের মেয়েরা আশা করে না পুরুষরা ভাত-কাপড় দেবে, যশিও করে না। যশিরা শরীরে খেটে সংসার বেঁধে তোলে। ছেলেপিলেকে জন্তুর মতো জাপটে ভালবাসে আর স্বামীদের খুব তোয়াজ করে ভুলিয়ে রাখে।

যশির নাকটা চাপা কিন্তু মুখখানা বেশ পানপাতার মত হরতনী ছাঁদের। চোখ দুটো সদাই ঘোরে। এদিক থেকে ওদিক। সবাই বলে যশির চোখ এড়িয়ে কেউ যেতে পারে না। হাঁড়ির ভেতর চাল আছে না ধান আছে, যশি একবার মাত্র চেয়ে বলে দিতে পারে।

'কি গো মাসি ! কি বলবে ?'

যশির এই গায়ে পড়ে গা দুলিয়ে কথা বলাটা একেবারে পছন্দ নয় গৌরবীর। তবে এখন গরজ তার।

'তোরে একটা কথা বলব বলে ডেকেছি।'

'বল। দাঁড়াও মাসি ! ও কে, হারা নয় ?'

'ওর কথাই তো বলব।'

'কি ?'

গৌরবী একটু ভীতু হাসল। দলে নিতে হবে যশিকে, নইলে গৌরবী হারার ব্যবস্থা করবে কি করে ?

'ওর মা তো মরে গেল। ছেলেটা এখানেই ঘোরে যশি, দুটা ভাত খায়, উঠানে ঘুমায়।'

'ঘরে দোরে উঠে বসে না তো? দেখ বাবা, ছোঁয়ানেপায় একাক্কার কর না।'

'না না, উঠানে থাকে। ওরই সানকিতে খায়, আমি উপর থেকে ভাত দিই।'

'ওর কেউ নেই?'

'তাই তো তোরে শুধাই যশি, তুই তো যাস শহরে। ওর মতো ছেলেদের কি কোন ব্যবস্থা আছে?'

'আমি কি জানি?'

'থাকার মধ্যে তো ঘরটু'নি শুধু।'

'অঃ! ঘর আবার ওর কি? ঘর বাঁধা তোমার কুটুম ঐ মুকুন্দবাবুর কাছে।'

'তাই নাকি?'

'নয় তো কি?'

'হা ভগবান!'

'এক কাজ করতে পারি।'

'কি?'

'শহরে ছেড়ে দিতে পারি। ভিক্কে করে খাবে।'

'ঐ ছেলে!'

'তবে আর কি? তোমার মাসি ভীমরতি। ভিক্কে করে খাবে খাবে, না খাবে না খাবে, তোমার কি, আমার কি?'

'যশি, সে কথা সত্য, তবে কি!'

যশি জীবনে কখনো কারো কাছে দয়া পায়নি, এখনো পায় না। ট্রেনে একটু বসার জায়গা, চাল বেচা লাভের পয়সা ওকে আঁচড়ে-কামড়ে আদায় করতে হয়। সাত বছর বয়েস থেকে না খেটে একবেলা ভাত পেয়েছে মনে পড়ে না যশির। দয়া-টয়া দেখলে ওর অঙ্গ জ্বলে।

গৌরবীর কথা শুনে ওর সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল। যশি বলল, 'তোমাদের দেশের রীতকানুন জানি না মাসি, তবে মুকুন্দবাবু জানলে পরে তোমায় খেদা করবে।'

'খেদা করবে কি কথা রে? মুকুন্দ আমার কে হয় জানিস?'

'আপনজনা। তাই যেয়ে শাক গুগলি কুড়িয়ে বেড়াও আর একবেলা পোষ্টা ভাত খাও।'

গৌরবী কেঁদে ফেলল। যশি বলল, 'দয়া দেকালে, দু-গাল মুড়ি দিলে তা বুঝি। তোমার নিজের পেট চলে না তুমি যাও অন্যরে ভাল করতে। আমি বলি শোন!

ওরে শহরে ছেড়ে দে আস। বাচে মরে ও বুঝুক গা। শহরে কি ছেলে বাঁচে না গা? বাজারে আমের আঁটি চুষে, পচা কলাটা বেলটা খেয়ে, ফুটপাতরে ঘুমিয়ে অমন, লাখোটা ছেলে বড় হচ্ছে না?'

'আচ্ছা শোন, তা যা হবে, একবার এট্টা বুদ্ধি করি।'

'কি?'

'ধর্ নিবারণের কাছে যাই।'

'সে এখন বাড়িতে চাপাকল বসাচ্ছে, ইলেটিরি নেচ্ছে, তোমার কথা সে শুনবে?'

'তা'লে?'

'মা বলে যদি ভাবত তা'লে কি তোমার এই অবস্থা হয়? তা'লে! তা'লে কি, তা নিজের কপালকে বল গা।'

যশি উঠে দাঁড়াল। বলে গেল, 'খাওয়া-দাওয়া ছোঁয়া নেপা ছিষ্টি কর না মাসি। তোমার ব্যাগ্যতা করি। মুকুন্দবাবুকে তুমি চেন না, আমরা চিনি। দেশের মানুষ, ঘরের মানুষ বলে ছেড়ে দেবে ও? মুকুন্দবাবু এই বাড়িতে মনসাঘট পুজো করল ভাদ্দরে, পাঁঠা কাটল, আমরা সবাই খেয়ে গেলাম। তিনি শুনলে খুব বেজার হবে গো!'

গৌরবীর ভেতরটা ভয়ে শুকিয়ে গেল। গৌরবী যশির হাত ধরে বলল, 'কারেও বলিস না যশি, তোর পা ধরি। আর শোন্, মেটেআলুটা নিয়ে যা।'

যশি চলে গেল।

গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসল গৌরবী। কি করে এখন ও, কোথায় যায়? মুকুন্দ যদি জানতে পারে তবে যদি রাগ করে?

গৌরবী সাত-পাঁচ ভেবে কাপড়খানা কাচতে বসল। নিবারণ যদি একটা বুদ্ধি দেয়। যদি বলে এস, আমার কাছে থাক?

আহা, তেমন ভাগ্য কি হবে না? হারার মাকে যখন ওরা গোর দিল, হারাও একমুঠো মাটি দিল।

গৌরবী কি ছেলের হাতের আগুন পাবে না? ভেবে গৌরবীর চোখ জলে ভরে গেল।

নিবারণের বাড়ি দেখে গৌরবী আর চিনতে পারে না। টিনের চাল, পাকা দেওয়াল, উঠোনে চাপাকল। গৌরবীর ঘরের এখানে-ওখানে খড়ের মুটি গোঁজা। বকফুল আর বাঁজা আমগাছটার পাতা পড়ে পড়ে উঠোন নোংরা হয়। সন্ধ্যে হলে

শেয়াল উঠোন দিয়ে হাঁটে। সেবার শীতকালে তো খাটাশ না বনবেড়াল এসে ঘরে ঢুকেছিল।

এখন ঘর-সংসার সাজাল নিবারণ, তা সে ঘরে মায়ের জায়গা হয় না।

নিবারণের বউ বলল, 'দেখে নজর দিও না মা, নজর দিও না। দুই প্রাণী খেটে-খুটে এ-টুনি দাঁড করিয়েছি।'

'না বাছা, লজর দিইনি।'

'এসেছ বস, চা খাও, জল খাও।'

'দে বউ, একটু চা দে।'

'ছেলের সঙ্গে দেখা কর্। তবে যেন কাঁদতে বস না। বড় রাগী ছেলে তোমার।'

'জানি।'

'আর দেখ!'

বউ আকাশের দিকে মুখ তুলে কি যেন ভাবল। তারপর ছেলেকে বলল, 'পয়সা নিয়ে দোকানে যা। চা পাতা কিনে আন্। ঠাম্মা চা খাবে।'

ছেলে বেরিয়ে যেতে বউ পেটকাপড থেকে দুটো টাকা বের করে গৌরবীকে দিল। বলল, 'ছেলেকে বল না যেন! এ আমার সুপুরি কেটে উপায় করা। এই কাপড়খানা ধর। এমন কাপড় পরে আসতে আছে? যে দেখবে সে বলবে কি? তোমার ছেলের একটা নাম পরিচয় নেই?'

তা বটে।

গৌরবী টাকা নিল, কাপড় নিল। এ কথা তার একবার মনে হল না, মাকে দেখে যদি লজ্জা পায় নিবারণ তবে মাকে যত্ন-আত্তি করে রাখে না কেন?

কিছুক্ষণ পরে গৌরবী কান খাড়া করল। আশ্চর্যের আশ্চর্য। নিবারণের ঘরে রেডিও বাজছে।

'কোত্থেকে এল অ বউ?'

'দোকান থেকে।'

'কত দাম, অ বউ, বল না?'

'জানি না মা, হক না হক দেড় শ টাকা হবে।'

'দে-ড়-শ!'

গৌরবীর মাথা ঘুরে গেল। দেড়-শ টাকা যদি গৌরবী হাতে পায় তবে এখনি তার কপাল ফেরে।

'আমাকে এক-শ টাকা দিবি বউ?'

'কোত্থেকে? গাছ থেকে পেড়ে এনে দেব?'

'তবে একটা গরু কিনি। ঘুঁটে গোবর দিয়ে, দুধ বেচে আমরা দুই প্রাণী বেশ চালিয়ে নেব।'

'দুই প্রাণী?'

'ঐ একটা গরিব ছেলে বউ! মাসি মাসি বলে।'

'তার মা-বাপ নেই?'

'কেউ নেই।'

'কেউ নেই?'

'কেউ নেই রে। বড় অভাগা।'

নিবারণ তো সে কথা শুনেই রেগে গেল।

'ওঃ, মাসি-বোনপো দুধ খাবে আমি গরু কিনে দেব। যাও যাও, মেলা বক না।

'শোন নিবারণ, ছেলেটার কথা শোন…'

'কি কথা?'

'ছেলেটার মা…'

গৌরবী সব বলে গেল। কাঁদতে কাঁদতে, নাক টেনে টেনে।

নিবারণের মুখ অন্ধকার হয়ে গেল। নিবারণ বলল, 'তুমি নইলে এমন শত্রু আর কে হবে?'

'আমি তোর শত্তুর?'

'নয় তো কি? এ কথা প্রচার গেলে তোমার আমার প্রাচিত্তির করতে হবে না?'

'কেন? প্রাচিত্তির কেন? আমি কি তাকে ঘরে রাখছি না হাঁড়িতে খাওয়াচ্ছি? গরিবের গরিব হাবাটা, তার একটা ব্যবস্থা যদি করে দিস তাই বলছি। এতে প্রাচিত্তিরের কথা ওঠে কোত্থেকে?'

'ছোটলোকের সঙ্গে সঙ্গে শাক-পাতা চুরি করে ঐ রকম বুদ্ধি হয়েছে তোমার। প্রাচিত্তির করতে হবে, মেয়েটার বিয়ে হবে না, এ-সব কথা তুমি বোঝ? যাও যাও, মেলা বক না।'

'তোর কাছে আমায় একটু আশ্রয় দে বাবা!'

'ওঃ, আমি জমিদার তাই তোমায় আশ্রয় দেব।' কি একটু ভেবে নিবারণ বলল, 'তবে হ্যাঁ। এখন সমাজে আমার একটু নাম হয়েছে। আমার মা হয়ে ঐ অজো গাঁয়ে পড়ে থাকবে সেটা ভাল দেখায় না বটে!'

'তবে?'

'ও পার্প বিদেয় কর। তারপর ভেবে দেখব। খবর দিও, খবর দিও জানলে?'

'ছেলেটা…'

'বিদেয় কর। এখন আমাদের দেশে গাঁয়ে যুদ্ধ হচ্ছে। অজো গাঁয়ে থাক, জানতে পার না কিছু। রোজ কত লোক এসে এপারে উঠছে। তাদের মধ্যে ছোঁড়াকে ছেড়ে দাও না কেন? বল তো সেখানে রেখে আসি। কাল পরশু।'

'সেখানে কি হবে?'

'ওকে গরমেণ্ট খেতে দেবে, কাপড় দেবে। আমাদের দেশের কথা তোমার মনে পড়ে? আমি তো জ্ঞানে দেখিনি!'

'মনে পড়ে। বউকালে চলে এলাম। দেশ ভাগ তো তার পরে হল রে!'

'সেখানকার মানুষও আসছে কত!'

'ওখানে ওকে ওরা খেতে দেবে?'

'ফেলে তো দিয়ে আসি। তা বাদে পেলে খাবে না পেলে না খাবে।'

'মরে যাবে না?'

'মরলে মরবে। রোজ দিন হেথা-হোথা মানুষ মরছে না? ওর কপালে থাকে মরবে।'

নিবারণের হঠাৎ হাসি পেল। বেশ খানিকটা হেসে নিল নিবারণ। তারপর বলল, 'এখন এস। ওর ব্যবস্থা কর, তা বাদে দেখি এখানে তোমায় আনতে পারি কি না। তোমার আবার নাতি হবে যে!'

'সে জন্যে ওনাকে বলা কেন বাপু? শাশুড়ী নিয়ে ঘর করিনি। তা বলে কি আমার তিন-তিনটে ছেলেমেয়ে হয়নি? তোমার মা ডাকতে সাধ হয়েছে তাই বল! আমার দোহাই দাও কেন?'

'কেন? তোর মা এসে তিন সন্ধ্যে ভাতের থালা মারতে পারে আমার মা পারে না?'

'ও রে আমার মা সোয়াগী ছেলে! আমার মাকে তুইয়ে-তাইয়ে তুমি একুশ টাকা নাওনি? শোধ দিয়েছিলে? সে কথা মনে কর একবার?'

'তবে রে!'

দুজনে ধুন্ধুমার ঝগড়া লেগে গেল। গৌরবী ভয়ে ভয়ে বেরিয়ে এল। বাস-রাস্তায় হারা বসেছিল। হারাকে বলল, 'চ হারা, ঘরে যাই।'

দোকানের সামনে এসে হারা বলল, 'তুমি যাও। আমি কেরাচিনি নে' যাই।'

'পয়সা কোথা পাবি?'

'পয়সা তো আমি দিই না মাসি। আমি ওদের কাঠ এনে দিই, পাতা কুড়িয়ে

দিই, উনি আমায় এটুনি কেরাচিনি লম্ফো জ্বালতে দেয়।'

'আন্!'

গৌরবীর ইচ্ছে হচ্ছিল হারার ওপর রাগ করে কিন্তু এখন ওর মনে হল ছেলেটা ভাল! একটু কেরাচিনি দিয়ে বা কে ওকে সাহায্য করে?

রাতে গৌরবী আর হারা ঘর আর দাওয়ায় শুল। হারাকে তাড়াতে পারলে নিবারণ হয়তো ওকে আশ্রয় দেয় কিন্তু গৌরবীর বুকের ভেতরে কে যেন না না বলতে লাগল। সে কি হারার মা না নিবারণের মা, কে গৌরবীকে মানা করতে লাগল?

ক'দিন বাদে মুকুন্দ এল।

'এ কি কথা শুনছি পিসি!'

'কি কথা?'

'তুমি ঐ হারাটাকে আশ্রয় দিয়েছ?'

'আশ্রয় আর কি! ও একা, আমিও একা, সন্ধ্যেবেলা ঐ উঠোনে পড়ে থাকে।'

'না পিসি। একথা ভাল নয়। এখন দেখ যেখানে খুনজখম, সেখানে জমির দাম নেই। আমার এ ভিটেটা পালবাবুদের দেব। ওরা পার্টি করে, খুঁটির জোর আছে। ওরা এখানে গুদোম করবে।'

'কিসের?'

'তাতে তোমার কি? এখন পালবাবুরা একথা শুনলে খুব রাগ করবে। ওদের পুজো আছ্‌া আছে।'

'তবে কি হবে মুকুন্দ?'

'নিবারণ তো ভাল কথা বলেছে। ছেলেটাকে বিদেয় কর, নিজের ঘরে গিয়ে ওঠ। বউ তো তোমার মন্দ নয়।'

'বউ কেন মন্দ হবে। আমার ভাগ্য মন্দ বাবা, কপালটা খারাপ।'

'তা দেখ, যা পার কর। তবে ও ছোঁড়াকে যদি বিদায় না কর আমার ভিটে ছেড়ে দাও।'

'ছেড়ে দেব? অ বাপ মুকুন্দ! ছেড়ে আমি কোথা যাব?'

'তা আমি কি জানি?'

মুকুন্দ জুতো মশমশিয়ে চলে গেল।

গৌরবী হারাকে দেখে পাগলের মতো তেড়ে গেল।

'মর্ মর্ মর্! তোর জন্য আমার এত দুর্ভোগ। তোর জন্য আমাকে সবাই কুকুরতাড়া করে। মর্ তুই। যেখানে ইচ্ছে বিদায় হ।'

হারা ভয়ে পালিয়ে গেল।

পালিয়ে গিয়ে হারা নিজেদের ঘরে বসে রইল। বসে বসে মা-র জন্যে কাঁদল। কেঁদে কেঁদে যখন হারা ঘুমোল তখন বিকেল হয়ে গেছে। ঘুমের মধ্যে মা যেন তার কাছে যাওয়া-আসা করতে লাগল। যেন কে বলল চোখ খুললেই হারা দেখবে মা রাঁধতে বসেছে, সব ঠিক আছে।

হারা চোখ খুলল। নিমনিমে অন্ধকার, কে ওকে গায়ে হাত দিয়ে ঠেলছে আর ঠেলছে। মা না কি? মা তো নেই। মা মরে গেছে। তবে কে?

'মাসি গো!' হারা ভয়ে কেঁদে উঠল।

'ওঠ্ হারা, আমি মাসি।'

'মাসি?'

'হ্যাঁ। চল্ আমরা চলে যাব।'

'কোথা?'

'শওরে।'

'শওরে যে তুমি যাও না, তুমি হাঁটতে পার না যে?'

'পারব হারা। শোন্, আমরা শওরে যাব। সেখানে কেউ কারো কোন কথা জানতে চায় না। কেউ কারে চিনে না।'

'সেথা আমরা কোথা থাকব মাসি?'

'ফুটপাতরে।'

'কি খাব?'

'ভিক্ষা করব। কেউ তোর পরিচয় জানবে না, আমার পরিচয় জানবে না।'

'ভিক্কে করব?'

'হ্যাঁ রে। পথে পথে ভিক্ষা করব, পথে বসে রাঁধব, ফুটে শোব, কাপড়নেতা গেরিমাটিতে রঙ করলে ময়লা হয় না। যশির কাছে আমি সব জেনে নিয়েছি।'

'চল।'

গৌরবী আর হারা অন্ধকারে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গেল। শহরে গৌরবী আর হারার সমাজ অনেক বড়। সমুদ্রের মতো। সেখানে একবার মিশে যেতে পারলে আর কোন ভয় থাকে না।

এক চড়কে গোপালীর বড় মেয়েটা হারিয়ে গেল। তার দু'বছর বাদে রথের মেলায় হারাল খোঁড়া ছেলেটা।

গোপালীর ছেলেমেয়ে ওর কাছে থাকে না। গোপালী বাড়ি বাড়ি কাজ করে। ভোর পাঁচটায় বারমাস বেরুনো, বেলা আড়াইটের আগে ঘরে ফেরার সময় হয় না। গোপালী থাকে ওর মা-বোনের সঙ্গে। রান্নাবান্না ওর বিকেলে হয়। দুপুরে ঘরে এসে ও জলঢালা ভাত খায়।

তিনটে না বাজতে আবার বেরোয় কাজে। সন্ধ্যের পর বাজার থেকে মাছ কিনে আনে। যে মাছই কিনুক, গোপালী বলে মাছ চিংড়ি।

ও গোপালী কি রাঁধলে বাছা?

মাছ চিংড়ি আর কুমড়োর ঝাল মা। সড়া সড়া ডাঁটাগুলো রেখেছিনু তাই দিয়ে পোস্ত চচ্চড়ি আর ভাত হল।

গোপালী তুমি রাতে ভাত খাও?

হ্যাঁ মা। উটি আমি চিবুতে পারি নে। ঐ ভাতের লেশা যে দুজ্জয় লেশা মা। উই ঝন্তি তো....।

গোপালীর ভাতের নেশা, ওর বরেরও ভাতের নেশা। বরের নাম উপীন্দ। উপীন্দ গ্রামে থাকে, ছেলেপিলেকে কাছে রাখে। মাসের প্রথম হপ্তায় এসে ছোট-পাট করে গোপালীর কাছ থেকে টাকা নিয়ে যায়।

উপীন্দের রঙ মাজামাজা। গলায় একগাছা কন্ঠি আর কাঁধে একখানা চাদর ওর সর্বদা থাকে। গোপালীর চেহারায় খড়ি ওড়ে, চুল পাটের দড়ির মতো, দাঁত উঁচু, গাল ভাঙা। গোপালীর গলা পাড়ার সবাই শুনতে পায়, উপীন্দের গলা কেউ শোনেনি।

গোপালীর স্বামীভাগ্য বড় ভাল। বড় ঠাণ্ডা গলা উপীন্দের। বড় মোলায়েম মেজাজ। সবগুলো টাকা ওর হাতে তুলে দিতে গোপালী গলা তুলে চেঁচায়। উপীন্দ মিটিমিটি হাসে আর নিঃশ্বাস ফেলে বলে—গতরে ঝি খেটে খেটে বউ, তোর ম্যাজাজ যেমন লঙ্কাপোড়া হয়েছে! খালি জ্বলতেছিস্ আর চিল্লে মরতেছিস।

উপীন্দ মরে গেলেও কুটোটি ভেঙে দু'খানা করে না। বড় ভাল ঘরের ছেলে উপীন্দ। ওরা মজিলপুরের মাহিষ্য।

গোপালী জাতে কৈবর্ত, যাকে বলে ক্যাওট। তাও কি ভাল কৈবর্ত? জলচল? যাদের বাসন বাটনা দেশঘরে বাবুরা নেয়? না। গোপালীরা যজ্ঞির ক্যাওট—ক্যাওড়ার মধ্যে অন্ত্যজ।

ও গোপালী, যজ্ঞি ক্যাওট কিরে?

কি জানি মা। সেই নাকি সত্যযুগে কোথায় যজ্ঞি হয়েছিল। তাতে আমাদের বাপদাদারা বোধহয় বিল ভাগাড় থেকে যেয়েছিল। যজ্ঞিতে তো জান, খেতে বসে পাতা পেড়ে? বাপদাদাকে শুধোলে তোমরা কোথায় বসবে গো? তা তেনারা আর কি জানে বল? বামুনরাই কে বুদ্ধি দিলে ক্যাওটদের মধ্যে বসে খাগা বাপ সকল! আজ হতে তোরা যজ্ঞি ক্যাওট হলি গো!

গোপালী সেই যজ্ঞি ক্যাওটদের মেয়ে। মা বোনের সঙ্গে ঝি খাটতে খাটতে ও উপীন্দের নজরে পড়েছিল। দুজনে ভাবসাব হল, এবার বিয়ে হলে হয়। তখন উপীন্দ সতেজে বললে:

বিয়ের কথা কে বলে রে? মাহিষ্য কখনো ক্যাওটকে বিয়ে করে?

উপীন্দের কাকা গোপালীর কানে সোনার পাশা, হাতে পালিশ পাত চুড়ি, গলায় চিকচিকে হার দেখেছিল।

সে মিহি গলায় বললে, বিয়ে কর বাপ, উ-র সঙ্গে যেমন মন বসেছে তখন বিয়ে কর।

কিন্তু বাপ উ-কে কবুল খেতে হবে।

কি কবুল খাবে গো উ?

তুমি উ-কে ভাত দেবা না। জেত খুয়াচ্ছ, জ্ঞেতিরা আর কখুনও দোর খুলে চৌকি পেতে বলবে না উপীন্দ বস্।

তা আর বলে?

উপীন্দ দোহার দিয়েছিল। উপীন্দ আর উপীন্দের কাকাকে খুব ভদ্রলোক-ভদ্রলোক মনে হচ্ছিল। তাই গোপালীর মা-বোনের জানতে চাইতে সাহস হয়নি যে চৌকি পেতে বসবার মতো গেরস্ত আত্মীয়স্বজন উপীন্দের আছে কি নেই। ওদের কেবলই মনে হচ্ছিল যে গোপালী গায়ে গতরে অসুরের মতো খাটে। খেটে খেটে যে নিজের গয়না গড়িয়েছে, যে গোপালীকে ওরা নিজে দাঁতী বলে খোঁটা দেয়, সেই গোপালীকে উপীন্দ ধন্য করে দিচ্ছে।

ওরা বলেছিল, দাঁতী, আজী হও মা। বড় নিন্দে অটে যেয়েছে সর্বত্তর। বড় ঢি ঢি পড়ে যেয়েছে। তুমি আজী হও মা! উপীন্দর মতো চ্যায়রা আর কান্তি কুথা পাবে বল?

গোপালী রাজী হয়েছিল। একখানা কাগজে টিপছাপ দিয়ে কবুল করেছিল সারাজীবন উপীন্দকে পুষবে। ছেলেমেয়ে হলে তাদের পুষবে যতদিন বাঁচবে ততদিন।

সেই কাগজখানাকে গোপালী এখন বিষম ভয় পায়। উপীন্দ তাকে আজ বারো বছর ধরে ভয় দেখাচ্ছে সেই কাগজখানার জোরে সে গোপালীকে জেল খাটাতে পারে। বারো বছরে এক যুগ। এক যুগ ধরে গোপালী ঐ একটা কথাই শুনছে। বারো বছরে তিনটে মরা, আর ছটা জ্যান্ত, নয়টা ছেলেমেয়েকে সংসারে আনবার পরিশ্রমে গোপালীর বুক ধড়ফড় করে, মাথা কেবলি ঘোরে। শরীর ভাঙছে বলেই হয়তো উপীন্দের ভয় ধরানো কথাগুলোকেও আরো বেশী বিশ্বাস করে।

হ্যাঁ! জেলে অমন দিলেই হল?

গোপালীকে অন্য ঝি-খাটা মেয়েরা সব সময় বলে।

কে জানে বোন? জেলে গেলে আর কি বাঁচব? সিথা না কি ভাত মোটে দেয় না।

ভাত না খেয়ে কি মানুষ বাঁচে না? আমরা উটি খাই না?

গোপালী ঘাড় নাড়ে। এমন একটা জীবনের কথা ভাবতেই পারে না যে জীবনে বিকেলে গরম ভাতের সফেন গন্ধ, সকালে ভিজে ভাতের সোঁদা গন্ধ নেই। যেমন গোপালী, তেমনি উপীন্দ। দেশের যে অবস্থা হোক, ধান চাল পাঁচ টাকা হোক বা পাঁচসিকে, ভাত ওরা খাবেই।

দুজ্জয় লেশা মা!

গোপালী নিঃশ্বাস ফেলে বলে। ছেলেমেয়ে ছয়টা আছে কিন্তু তারা উপীন্দের কাছে থাকে। শহরের বাতাস খারাপ, গোপালীর স্বভাব মন্দ, মুখ আল্‌গা, উপীন্দ তাই ছেলেমেয়েদের নিয়ে গাঁয়ে থাকে। শুধু শীতকালে মাঝে মাঝে খেজুর গাছ কাটে আর কলসী বাঁধে উপীন্দ, নইলে সম্বৎসর অন্য কোন কাজ করে না।

ও গোপালী, তোর বর কি কাজ করে?

বসে থাকে মা!

শুধু বসে থাকে?

না গো মা, আন্না করে, ছেলেমেয়ে খাওয়ায়। নাওয়ায়, চুল ছেনে (আঁচড়ে) দেয়। আমি য্যামন মাছের মা! ছেলেমেয়ের সঙ্গে সম্পক্ক নিই। উনি সে অকম লয় গো মা। মায়া মমতাও বেস্তর।

বসে বসে খায় তো?

তা আর খাবেনি? কাগজ অয়েছে মা কাগজে ছাপ দিনু, সি জোরেই উনি

খাচ্ছে পরছে। মনে মনে যে দুক্কু আসে না তা লয়। কেন, গাছ কাটলে, অস বিচলে যা পেলে তাই দে নিজে মিষ্টি মোণ্ডা খেলে। ছেলে মেয়েকে দিলে! আমার কথা মনে এলনি? ভাবলে দুক্কু লাগে না?

গোপালী, উপীন্দ বড় চালাক বুঝলি? তুই হলি বোকা।

সে আর বলতে মা? বল্ নিগুর্নো মনিষ্য মা! বসে বসে খাওয়া ছাড়া আর গুণ নি! তবে কি জান? উনি কেত্তন বড় ভাল গায়। 'হরি কোথা গেলে গো' বলে যতক্ষণ গলা ছেড়ে দেয় ত্যাতক্ষণে বুক কাঁপে মা, চোখে জল আসে। উনার গানের কদর কত যদি তা দেখ মা!

তুমি বারো মাস এখানে?

আর মা! অক্ত দিয়ে গড়া সন্তানগুলোকে কাছে পাই না। মাঝে মাঝে বুকের ভেতরটা য্যামন শেয়াল আঁচড়ে মরে গো মা! আমি এক মহাপাপী গো মা।

গোপালী সোনার মতন করে পরের বাড়ির বাসন মাজে। পরের ঘরের মেঝে দালান মুছে চক্‌চকে করে। বাঁধা কাজের ওপরে এর বাড়ির গুল দেয়, ওর বাড়ির ছেলেকে ট্যাঁকে করে কান্না ভোলায়। উপীন্দ ছেলেমেয়েকে নিয়ে থাকে। মাঝে মাঝে ছেলেমেয়ে কলকাতায় আসে কিন্তু গোপালী নিজের হাজা পা, উকুনে মাথা, ময়লা বিছানার লজ্জায় ওদের কাছে খুব কুণ্ঠিত হয়ে থাকে। যেন ওরা উপীন্দের মতো আরেক সৌভাগ্যস্বর্গের বাসিন্দা। গোপালীর চেয়ে উঁচুজাতের মানুষ।

তা আর হবে না? হাজার হলেও বাপ হল মাইষ্য, আমি হনু ক্যাওটের মেয়ে? আমাকে উ-দের কাছেও নিনু (নত) হয়ে অইতে হবে বৈকি! ঝার ঝা নেকন! গোপালী নিজের মনকে অথবা মনের ব্যথাকে প্রবোধ দেয়।

এইভাবে চলে যাচ্ছিল দিন। মেয়েটা বড়, একটু হাবাগোবাও বটে। এগারো বছর হলেও বুদ্ধি তেমন পাকা নয়। দেখতে সুন্দর, স্বাস্থ্যও ভাল। গোপালী ভাবছিল মেয়েটাকে কাছে এনে রাখবে। মেয়ে ওর কাজে সাহায্য করবে। উপীন্দ হয়তো বললেই খেঁকিয়ে উঠবে, কিন্তু মেয়ে থাকলে গোপালী আর দুটো কাজ ধরতে পারে। আরো চল্লিশটা টাকা আসে।

উপীন্দ ওর কথা চোখ সরু করে শুনল আর গুনগুনিয়ে গান ভাঁজল মিহিগলায়। তারপর সতেজে বলল, কেন? মেয়ে কেন কাজ করবে? মেয়ের কাজ করবার কথা? তোর কাজ করবার কথা লয়?

আ মরণ! বলি আমার গতরে কি দিন দিন ক্ষ্যামতা বাড়তেছে? একা মানুষ একশত পাঁচ টাকা উপায় করি। সাড়ে তিনকুড়ি টাকা তুই নিয়ে যাস্ না?

লোব না কেন? কবুল খেয়েছিস মনে নি?

দেশে ঘরে সবাই উটি খায়, উনির মুখে উটি ওচে না! উনির'ও ভাত চাই দু'বেলা।

উপীন্দ আশ্চর্য হয়ে গোপালীর মুখের দিকে চাইল। তারপর মাথা চুলকে বলল, বিড়িটা-আসটা খাই না, পান-তামাক'ও কেউ দিলে তো খেলাম, আমার তো ঐ একই লেশা বউ! ভাত পাব না একমুটো মনে করলি ক্যামন বুক কেঁপে যায়। তুই বউ! উটি খেলে পারিস। কাজের শরীর তোর, ঝনঝনে থাকে।

গোপালী এর উত্তরে পাড়া কাঁপিয়ে উপীন্দকে বকাঝকা করছিল। উপীন্দ কিছু বলেনি, গুটি গুটি বাস-রাস্তার দিকে রওনা দিয়েছিল।

তার পরই বড় মেয়েটা চড়কের মেলায় হারিয়ে গেল। বরাবর দেশে চড়ক দেখে ওরা, এবার কি মনে করে উপীন্দ সবাইকে রেখে একা বাতাসীকে নিয়ে স্টেশনের ধারে চড়ক দেখতে এসেছিল। স্টেশনের পাশেই মেলা বসে। কয়েকদিন মানুষে মানুষে থই থই করে মাঠ। বুঝি জুয়ার আড্ডা ধরা পড়ে, অথবা বেআইনী মদের দোকান। তখন পুলিস ছুটোছুটি করে। সঙ্গে সঙ্গে মানুষও ছুটোছুটি করে, বেজায় হুলুস্থুল বেধে যায়।

হয়তো সেই রকম গণ্ডগোলেই হাত ছিটকে বাতাসী কোথায় হারিয়ে গেল। উপীন্দ তো ছেলেমেয়ে অন্ত প্রাণ। মেয়েকে খুঁজে খুঁজে পাগল হয়ে ও গোপালীকে খবর দিতে গেল।

ও বউ, আমি খুঁড়ে মরব! ও বউ, যতক্ষণ বাতাসীকে চেইছিলি কেন বা আমি দিইনি গো! তা'লে তো সে ঘরে অইত গো! এ আমি কি করে এলাম বল গো!

অনুতাপে অনুশোচনায় এতই কাঁদল উপীন্দ। এতবার দড়িকলসী, কেরাসিন-দেশালাই, সেঁকোবিষ-ফলিডল, বাসের চাকা-ট্রেনের চাকার খোঁজ করল যে গোপালী তো আর ভয়ে বাঁচে না।

বাবুদের কাছে যেয়ে শুধাব?

গোপালী চিরকালই বাবুদের উপর ভরসা রাখে। হারানো মেয়ের খোঁজ করবার নানা পথ বাবুরাই বলেও দিল ওকে।

তুই যা হয় কর্ বউ! আমার হাত-পা সেঁইদে যেয়েছে।

গোপালী প্রথমটা বুকের উপর কিলচড় মেরে মেরে ঘোষণা করেছিল যে পৃথিবী তন্ন তন্ন করে খুঁজে, পাতালে সেঁধিয়ে বা সমুদ্রের তলায় গিয়েও ও মেয়ের খোঁজ পেতে চেষ্টা করবে। কেন না গোপালীর কাছে সযত্নে লুকনো একুশটি টাকা ছিল।

একুশটি টাকা উপে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গোপালীর সাহস ভরসা উপে গেল। গণককে হাত দেখানো ছাড়া আর কিছুই করা হল না গোপালীর। তবে হ্যাঁ, বাবুরা

রেডিওকে বর্লে দিয়েছিল অথবা লালবাজারকে। একদিন রেডিওতে নিরুদ্দিষ্টা বাতাসী দাসীর নাম শোনা গেল।

বাতাসীর খোঁজ পাওয়া গেল না।

উপীন্দ বলল, এডিওতে বলা মানে কি সোজা কথা বউ? তুই মেয়েছেলে হলি কি হয়। জগজ্জোড়া পেচার হল, এর থি বেশী আর আমাদের কি হবে তাই বল্ দি'কি?

উপীন্দকে সামলাতে গিয়েই বুঝি গোপালীর আর বাতাসীর জন্যে শোক করা হল না। মেয়েটার অবোধ শান্ত মুখটা মনে করে করে শুধু বালিশ ভেজাল গোপালী। আর মনের কোথায় একটা আশ্চর্য বিস্ময় ভেসে থাকল। রেডিওতে বলেছিল? কত লোক শুনেছিল বাতাসী কোথায় গেল? সে কি রেডিও শুনতে পেয়েছিল? শুনতে পেলে হয়তো বাপের কাছে পালিয়ে আসত যেমন করে হোক। ওরা তো মাকে চেনে না, বাপকে চেনে। গোপালী তো মাছের মা। মাছের মা ডুবজলে ডিম ফোটায় ফুটজলে ছানাদের ছেড়ে দেয় বাপের জিম্মায়। দিয়ে শ্যাওলায় ডুব মারে।

গোপালীর মা মেয়েকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে বলল:

বুঝি বা মরে ঝরে যেয়েছে উ? নইলে কি আর আসত না? হাঁসের মতো উড়াল দিয়ে আসত, জানলি?

না মা, বাতাসী মরেনি। উ-র জন্ম হতে গণকে গুনেছিল। বলেছিল উর পেরমাই অ্যানেক।

শুধু গোপালীর খরদড় বোন মাথা নেড়ে ঝেঁকে বলল, আমার বিশ্বাস লয় জেমাই দাদা বাতাসীকে হারিয়ে এয়েছে।

কেন? বিশ্বাস লয় কেন?

জানি না।

ঠোঁট উলটে বোন দিদির মাথায় তেল দিতে লাগল। আজ কতদিন দিদি নায় না খায় না। মাথায় তেল দিয়ে নাইলে, গরম ভাত খেলে দিদি ক্রমে ক্রমে মেয়ের শোক ভুলবে। মাথায় জল আর পেটে ভাতের ওপর গোপালীর অগাধ বিশ্বাস।

গোপালী ভুলে গেল না হয়তো, কিন্তু বুক বেঁধে উঠে দাঁড়াল ঠিকই। মনিব-বাড়ি গিয়ে দাঁড়াতে গিন্নী বললেন, কাজ করতে পারবে বাছা? এমন অশান্তি হয়ে গেল?

আর মা! মেয়ে সন্তান তো? সেই যে বলে মেয়ের নাম ফেলি—যমকে দিলেও গেলি—জামাইকে দিলেও গেলি।

বলতে বলতে গোপালীর বুক ভেসে গেল। যম নয়, জামাই নয়, কে ওর

মেয়েকে নিয়ে গেল !

বুঝি মেয়ের দুঃখ ভুলতেই গোপালী আরো একটা কাজ নিলে। কুড়ি টাকা, পঁচিশ টাকা, তিরিশ টাকা এ পাড়ায় ঠিকে ঝি-র মাইনে। আরো রোজগার বাড়ল ওর, আর বাড়ল উপীন্দর খাঁই।

বড় কষ্ট দেশে ঘরে ধান চালের। যার ক্ষেত আছে তার তবু যেমন তেমন, কিন্তু যার মাটি নেই সে কি করে ? দেশের ধান, দেশের চাল, যেন মন্তরে উড়ে যায়। উপীন্দর জোরাজোরিতে গোপালী অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

সব যদি আক্কসের পেটে দেবা তো আমি কি শুক্কে মরব ?

বউ, বড় খিদে !

কেন, ঘরে আন্না কর না ?

ওরা খেয়ে দেয় সব !

ভাত থেকে ফ্যান ঝরাও কেন, অা ? আমার বুনাই যেয়ে দেখে এসেছে ? ফ্যান অইলে ভাত বাড়ে জান না ?

ফ্যান ভাতে উ-দের দিই বউ ! আমি খেতে পারি না।

গোপালী ভুরু কুঁচকে বসে রইল। ধান চালের সন্ধান তো জানে না গোপালী ? গোপালী তো শুধু পশুর মতো খাটতে জানে, টাকা আনতে জানে।

দেখ মাইস্তের বেটা, এটা তোমার ভুল হয়ে গেয়েছে।

কি ভুল হল বউ ?

এই যে ভাতের দুর্জয় লেশা ? দেশে ঘরে মানুষ অত খায় না, দেকান ? মানুষ উপবাসী থাকে পেট শুকিয়ে, লইলে কি পারে ?

উপীন্দ অবাক হয়ে গোপালীর দিক চেয়ে রইল। তারপর বলল—তোর কপালে দুক্ক আছে বউ। ভাত খোঁটা দিবি যদি ততক্ষণ ছেলেমেয়েদের খালের জলে নিক্ষেপ করে আমি বেরিয়ে যাব।

ঠিকানা রেখে যেও। উদ্দিশ করে টাকা দিতে যাব। লয় তো আবার কোথা গিয়ে বিয়ে বসবে তুমি ?

গোপালীর কথাগুলো নরম নরম বলেই বোধহয় উপীন্দর মনে ঘা লাগল বেশী। এই প্রথম ও চিনি নিলে না রেশানের, সুজি আছে না কি জিগ্যেস করল না। এই প্রথম ও গোপালী যা হাত পেতে দিলে তাই চুপ করে ট্যাঁকে গুঁজে রওনা দিলে। নইলে প্রতিবার গামছার কোণে কোণে উপীন্দ সুজি, চিনি, পাটালি, কম জিনিস বেঁধে বেঁধে নেয় না। এই প্রথম ও গোপালীকে সেই কাগজখানার জোরে জেল খাটাবার ভয় দেখালে না।

তারপর, রথযাত্রার সময়ে ওর খোঁড়া ছেলেটাকে হারিয়ে এল উপীন্দ। দেশ থেকে মানুষ প্রতিদিন ট্রেনে চড়ে কলা-শাক-মুলো বেচতে আসে। ওরাই খবর দেয় নেয়। গোপালীর বোনাইও সেই কাজই করে। সে-ই খবর এনে দিলে।

তোমার খোঁড়াটা মেলায় খোয়া গেল গো দিদি।

যেন কাঠকুটো লোহা টিনের জিনিস একটা। যেন কাঁধ থেকে গামছা কেড়ে নিয়েছে কেউ। নইলে এমন করে কেউ দুঃসংবাদ দেয়?

গোপালী তো হাতের গোবর নেতা মাটিতে ফেলে ডুকরে কেঁদে উঠল। খোঁড়া বটে। জন্ম থেকেই খোঁড়া। কিন্তু ছেলে তো? পুত্রসন্তান। সাত বছরের খোঁড়া ছেলেকে মেলায় কে নিয়েছিল?

বোনাই আজকালকার ছেলে। খরদড় বোনের খরদড় বর। বেচে মূলো বেগুন। পরে ফুলপ্যাণ্ট। গলায় আবার রুমালও বাঁধে। সেই রুমাল ঘুরিয়ে বাতাস খেয়ে ও বললে, ছেলের বাপ নিয়ে গেছল। খোঁড়া তো? তাই বললে, চল্ বাপ। কাজিতলায় মাটির ঘোড়া মেনে আসি গা।

কাজিতলায় মাটির ঘোড়া মানত করলে খোঁড়ার পা হয়। মাটির সরায় এক আঁজলা ধান দিলে দুঃখ কষ্ট দূর হয়। কাজিতলায় শোলার ঝুমঝুমি লাল নেকড়ায় বেঁধে ফেলে রাখলে মৃতবৎসার সন্তান বাঁচে।

কিন্তু সে তো চত্তির মাসে গৌর?

গোপালী কাঁপতে কাঁপতে বলল, চৈত্র মাসে যে মানত করবার, সেই মানত কে রথের দিনে করে? উপীন্দর কি মাথাটা খারাপ হয়ে গেল? না এ গোপালীর কপালের দোষ। মাহিষ্যের ছেলের জাত যদি যজ্ঞিক্যাওটের মেয়ে নষ্ট করে তাহলে হয়তো তার এইরকম খোয়ারই হয়।

গৌর গোপালীর দিকে চেয়ে চেয়ে দেখল। বউকে গৌরও ভালবাসে। আর এই গোপালী যে গৌরের বউকে বুকে করে আগলে রাখে, চোখে চোখে পাহারা দেয় তা গৌর জানে। বোধহয়, গৌরের পক্ষে যতটা সম্ভব ততটুকু মায়া মমতা ও গোপালীকে করে। চেয়ে চেয়ে দেখে বলল:

চত্তির মাসে, তাই নয়? আমি খোঁড়াকে ফিরিয়ে আনব দিদি। যাও, এট্টু চা করে ফেল দিনি?

চা খাবে বললে তো বেইরে যাও কোথা গৌর?

দু' চারটে জোয়ান ছেলের সন্ধানে যাই দিদি। ভয় নি। খোঁড়ারে তুমি পাবা। তাতে সন্দ ক'রো না।

গোপালী এবার সোজা লম্বা হয়ে মেঝেতে শুয়ে পড়ল। আর উঠবে না ও,

আর নাইবে না, খাবে না, যতক্ষণ না গৌর আসে। তারপর, গৌরকে নিয়ে গিয়ে ছেলেমেয়েগুলোকে এখানে নিয়ে আসবে। আর কখনো ওদের চোখের থেকে হারাবে না। উপীন্দও এখানে এসে থাকুক। কাজ করে না? তাতে কি? এই লঙ্কার মাঠের বস্তিতে অন্তত দশটা ঝি আছে যারা বরকে, জোয়ান ছেলেকে বসিয়ে খাওয়ায়। গোপালীও খাওয়াবে।

গোপালীর খরদড় বোন শুধু বলল হারিয়ে যেয়েছে না হাতী! দেখ যেয়ে এ তোমার কার কীর্তি?

কার কীর্তি?

যে কেত্তন গায় তার। জেমাইদাদার।

বলে বোন, গোপালীর দুঃখের সময়ে সাবান মেখে নাইতে গেল। সাবান মাখলে গায়ে সুগন্ধ ওঠে, ওর বড় ভাল লাগে।

তারপর কি হইচই, কি চেঁচামেচি, লঙ্কার মাঠ—মনোহর পুকুর সব যেন একেবারে একসঙ্গে গোপালীর উঠোনে ভেঙে পড়ল। কলিকালেও যে কথা কেউ ভাবেনি তাই হয়েছে। খোঁড়া ফিরে এসেছে গৌরের কোলে চড়ে। উপীন্দর ছেলে-মেয়েগুলোও এসেছে। উপীন্দকেও ওরা টানতে টানতে নিয়ে এসেছে। গামছা-জোড়া করে উপীন্দর হাত দু'খানা বেঁধে ওরা গোপালীর পায়ের কাছে উপীন্দকে বসিয়ে দিল।

কি হয়েছে গৌর?

তোমার বরকে শুধাও। ছেলেমেয়ে রবাটের বল না থালাবাসন যে গইড়ে গেলে হারাবে, পুকুরে সাঁদালে খোয়া যাবে? আজ দু'বছর ধরে আমার মনে সন্দ। দেশেও ফুস্থর ফুস্থর গুজুর গুজুর খুব। তোমাব মনে বেথা লাগবে তাই কিছু বলিনি দিদি। এবার দেশ গাঁয়ের মানুষ তো উনার পেছু পেছু যেয়েছিল। তাই না ধরা পড়ল?

কি বল গৌর আমি তো এখুনো বোকা হয়ে অইছি!

তোমার বর বাতাসীকে পশ্চিমাদের কাছে বিচে দিয়েছিল। খোঁড়াটাকে নিয়ে যেয়েছিল, বিচে দিয়েছিল কাদের কাছে জান? ভিখমাঙাদের কাছে। ওরা খোঁড়াকে দিয়ে ভিক্ষে করাত, দূর দেশে নিয়ে যেত।

বিচে দিয়েছে? আমার বাতাসীকে? আমার খোঁড়াকে?

মারের চোটে আজকাল ভগবান শায়েস্তা হয় দিদি। মার দিতে এক ঘা, তখুনি কবুল গেল বাতাসীকে পাঁচকুড়ি টাকায় বিচেছে, খোঁড়াকে বিচেছে তিন-কুড়িতে।

তিনকুড়িতে ?

হ্যাঁ গো দিদি। বিচে কি করেছে জান ? খালি চালের দোকানে হাট গেছে যে একসঙ্গে একমন চাল কিনছে।

ছেলে বিচে ভাত খাবা ?

গোপালী উপীন্দকে মারতে আরম্ভ করল। মারতে মারতে, গাল দিতে দিতে, যতক্ষণ না গোপালীও অজ্ঞান হয়ে গেল ততক্ষণ ওকে কেউ সরাতে পারল না। উপীন্দ শুধু কাঁদতেই লাগল। গোপালীর বোন শুধু বললে—এ বাদে আর থানা-পুলিস কর না বাবু। উ-কে তাড়িয়ে দাও না ? খুব মার খেয়েছে গো !

গোপালী যে উপীন্দকে তাড়িয়ে দেবে, আর ঢুকতে দেবে না ঘরে, তাতে কারো সন্দেহ রইল না। গোপালীর মা-বোন তো পরস্পর বললে এর পরেও যদি গোপালী ওর সঙ্গে সম্পর্ক রাখে তাহলে ওদের কথা গোপালীর ভুলে যেতে হবে।

ওর মনিব বাড়ির প্রতিটি গিন্নী-বউ তাই বললেন। ওরা সবাই ভদ্রলোক, সবাই লেখাপড়া জানা মানুষ।

কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিল গোপালী। অনেক দূরে ঘর নিয়ে উঠে গেল ও, মা-বোনের সঙ্গে সমপক্ক তুলে দিয়েই গেল।

ও গোপালী ! একি করলে বাছা ? সেই বরকে নিয়ে, ছেলেমেয়ে নিয়ে বাসা করলে ?

করলাম মা !

কি করে করলে গোপালী ? ঐ স্বামীর মুখ দেখতে প্রবৃত্তি হল ?

না মা ! মুখ কি আর দেখতে ইচ্ছে যায় ? উ ভাত আঁধে, আমি দুটো খাই। উ একদিকে মুখ ঘুইরে ঘুমোয়। আমি উল্টোবাগে মুখ ঘুইরে থাকি। কি যে বল মা। উ মুখ আরো দেখতে সাধ যায় ?

ওকে আবার ঘরে তুললে কেন গোপালী ?

বোন তাই বলতেছে, বোনাই তাই বলতেছে, কিন্তুক মা ! উকে যখন বললাম এমন নিরশংস কাজ কেন করিছিলে ? উ কি বললে জান ?

কেঁদে বলল বউ ! ভাতের লেশা, দুজ্জয় লেশা ! চারটাকা পালি চাল, পাঁচ-টাকা পালি চাল ওরা খায় না আমি খাই বল্ ? ই কথা বললে যখন, আমি আর কিছু বলতে পারলাম না।

এটা কি একটা জবাব হল গোপালী ? তোমার স্বামী আসলে শয়তান, ওকে পুলিসে দেওয়া উচিত !

গোপালী ভয়ে ভয়ে চোখ তুলে দেখল, গিন্নীমা ওর দিকেই চেয়ে আছেন। ওঁর

পেছনে খোলা আলমারী, বুঝি পরিষ্কার করছিলেন। মাটির কাছ থেকে ছাদ অব্দি উঁচু, ভারী, ইস্পাতের ঝকঝকে আলমারী। তাতে শুধু তাকের পর তাক, চালের টিনের পর টিন। কোন চালটার নাম বাঁশমোতি, কোনটার নাম গঙ্গাজলী, এখনো কোন অলৌকিক উপায়ে এ বাড়ির লোকেরা নিরামিষ, মাছ, দুধের সঙ্গে রকম রকম চালের ভাত খায়। সম্ভবত ওদের দত্যিদানা পোষা আছে। দেশের অবস্থা যেমনই হোক, দত্যিরা অন্ধকারে এসে চাল যোগান দিয়ে চলে যায়। ওঁরা বাছাই করা চালের ভাত একেক চামচ তুলে খান। ওঁদের রান্নাঘরের নালায় 'ম ম' করে দামী চালের ফ্যানের সুবাস।

গোপালী মাথা নাড়ল। আস্তে আস্তে বলল—না গো মা! ভাতের লেশা বড় খারাপ লেশা। মানুষকে অমানুষ করে দেয়। উ-র কুন দোষ নি গো। পেটের দোষ আর আমার কপালের দোষ। এট্টু তেঁতুল দিন!

হাত পেতে তেঁতুল নিল গোপালী। তেঁতুল নিয়ে ও এখন বাসন মাজবে। মেজে মেজে বাসনগুলোকে সোনা করে ফেলবে। বাতাসী এমনি বাসন মাজতে শিখেছিল। বাসন মাজতে মাজতে গোপালীর চোখ জলে ভরে গেল। বাতাসী তুই কোথায়? উপীন্দ এত নিষ্ঠুর কেমন করে হল? কি দুর্জয় ভাতের লেশা, গোপালীর মনে হল বুঝি মদও মানুষকে এমন অমানুষ করে না।—

যমুনাবতীর মা

বড় আদরের নাম, কিন্তু মেয়েটা একেবারে ফালতু। ও না জন্মালেও চলত, পৃথিবীতে কোথাও এসে যেত না কারো। মেয়েটা অবশ্য তা জানে না। সবে দু-বছর বয়স ওর, পৃথিবীতে আসতে পেরেছে বলে ও মহা খুশি।

বাবা ওষুধের দোকানে বোতল ধোয়। মা শহরের দোকানে দোকানে ধূপকাঠি বেচে। সংসারে ওরাও ফালতু, এই মানব-সংসারে। কেননা ওর বাবা-মাকেও সমাজ বা সংসারের কোন প্রয়োজন আছে কি না বোঝা যায় না।

মেয়েটা ফালতু, বাবা-মার অবস্থা সরল অঙ্কের বন্ধনী চিহ্নের মতো। বন্ধনী চিহ্নগুলো ফেলতে ফেলতে না গেলে সরল অঙ্ক মেলে না।

যমুনাবতী রোগা, গায়ের রঙ মেটে, চুলগুলো পাতলা আর কোঁকড়া, কোমরে একটা পয়সা বাঁধা। ওর বাবা রোগা, ভীতু, হাতে একটা মাদুলি। মা আরো রোগা, আরো ভীতু, দু-হাতে দুটো মাদুলি।

দেখেই বোঝা যায় একসময় ওদের প্রয়োজন থাকলেও এখন, এই সব অঙ্ক মিলে যাবার সময়, ওরা ফালতু। এখন ওদের ফেলে দেওয়া দরকার।

ওরা আছে বলেই ফারাক্কার জল হুগলীতে আসছে না, সি. এম. ডি. এ. শহরটা সুন্দর করতে পারছে না, প্রতিটি গ্রামে বিদ্যুৎ জ্বলে উঠছে না।

ওদের মতো কয়েক লক্ষ মানুষকে এখনি ফেলে দেওয়া দরকার, তা হলে এই দেশ, এই শহর সুন্দর হবে।

শত শত সিদ্ধান্ত আর লক্ষ লক্ষ প্রতিশ্রুতি রাখা যাবে। ওরা সার্থকতার পথে একটা অবাঞ্ছিত জঞ্জাল।

ওর বাপ-মা সে কথা জানে না। তাই ওরা মেয়েটাকে খুব ভালোবাসে। বোধহয় নিজেদেরও ভালোবাসে।

কে যেন মাকে বলেছে, 'বাঃ, বেশ নাম তো?'

মা অপ্রতিভ হেসেছে।

'বেশ কবিতা কবিতা নাম। কে রাখলে?'

'ওর মাসি রেখেচে।'

ওর মা অবশ্য বলেনি ওই নামটা ওদের ঠিকে ঝি রাখালীর দেওয়া। রাখালী

যখন মেয়ের মাকে দিদি বলে তখন তো ও মাসিই হল বাপু।

ওর জন্ম হওয়া ইস্তক রাখালী এ বাড়িতে। যমুনাবতীর মা ঠিক দুপুরে যখন বাড়ি ফেরে তখনি শোনে রাখালী বিস্বরে গাইছে—

যমুনাবতী সরস্বতী ভায়ে বোনে ভাগ্যবতী
বকুল গাছে সোঁদাল ফুলটি টাপুর-টুপুর করে॥

ওই রাখালীই একদিন বলেছিল, 'ওকে যমুনাবতী বল না গো?'

তা যমুনাবতী নামই রইল।

যমুনাবতীর মা সকালে উঠে কোনমতে মেয়েটাকে একটু বার্লিতে দুধের গুঁড়োতে জ্বাল দিয়ে খাইয়ে দেয়। তারপর গত রাতের বাসি রুটি নিজে দুখানা খায়, মেয়ের বাপকে দুখানা দেয়। রাখালীর জন্যে চারখানা রুটি রাখতে হয়। মেয়ের মা বেরোয় সাতটায়। বাপ বেরোয় নটায়। রাখালী যত তাড়াতাড়ি পারে ঠিকে কাজ ক-টা সেরে এসে যমুনাবতীকে দেখে! এইটুকু করে বলে ওকে দুটো টাকা বেশি দিতে হয়।

তাই তো যমুনাবতীর মার লক্ষীর ভাঁড়ে মোটে পয়সা জমে না।

জমে না বলেই ও আরেকটা কাজ করে।

রাখালীর সহযোগিতায়।

এ বাড়ি ও বাড়ি থেকে রাখালী পুরনো কাগজ কিনে আনে। মেয়ের মা রাত জেগে বসে বসে ঠোঙা তৈরী করে। রাখালী সেগুলো লালার দোকানে দিয়ে আসে। পয়সার ভাগ রাখালীও নেয়।

পয়সা জমে জমে এবার আট টাকা হল। যমুনাবতীর মা ভাবল এবার পুতুলটা কিনবে।

সন্ধ্যেবেলা মেয়েকে নিয়ে মা বাজার করতে গিয়েছিল। সন্ধ্যেবেলা বাজারের পেছনের নোংরা নোংরা রাস্তায় হাঁটলে কম দামে ফাটা ডিমটা, একদিকে পচ-ধরা আলু, কানা বেগুনটা মেলে।

আর কাচের বাইরে থেকে দোকান দেখা যায়। খেলনার দোকানটা এই বাজারেরই মোড়ে। সেদিন হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ একটা পুতুলের দিকে আঙুল তুলে মেয়ে বলল, 'নেব।'

পুতুলটার গাল লাল, ঠোঁট লাল, চুল সোনালি। উজ্জ্বল আলোর নিচে পুতুলটার চুল থেকে সোনা ঝলকাচ্ছে। দাম ন টাকা ষাট পয়সা। বাড়ি এসেই মা ভাঁড় ভেঙে দেখেছিল। তখন মোটে ছ টাকা জমেছিল।

সেই সময় যমুনাবতীর মা একটা দুঃসাহসী স্বপ্ন দেখেছিল। ওর ভাঁড়ে টাকা জমেছে। ও ওই পুতুলটাই যমুনাবতীকে কিনে দিয়েছে। মেয়ের বাপ বলছে, 'সোংসারে ও টাকাটা একটা বল ভরসা। তুমি পুতুল কিনলে তা দিয়ে ?'

'পুঁতুল কিনলুম।'

খুব তেজের সঙ্গে জবাব দিচ্ছে যমুনাবতীর মা। আরো কত কথা স্বপ্নেই মনে হচ্ছে ওর। এই দোরে দোরে ঘুরে ধূপকাঠি বিক্রি করা, এই কষ্ট, এ কেন বাপু ? তুমি একটা যোগ্য মানুষ নও, সে জন্যেই তো ?

কিন্তু স্বপ্নের মধ্যেও ও সত্যিকথাগুলো লোকটাকে বলতে পারছে না।

লোকটা এমন ভীতু, রোগা, মার-খাওয়া।

জেগে ভেবেছে ওই পুতুলটাই কিনবে। ঠোঙা বেচা পয়সায় কিনবে। সেই-জন্যেই ও যেতে আসতে মেয়েকে বলেছে, 'ওই দেক মা। আর ক দিন যাক, কিনে দোব।'

কিন্তু একদিন মেয়েটার জ্বর হয়েছে। জ্বর হয়েছে, জ্বর সহজে ছাড়েনি। বড দুর্বল মেয়েটা, বড় রোগা হয়ে গেছে। ডাক্তার বলেছে, 'কি খাওয়ান ?'

'বার্লিক দিই, দুটো ভাত, একটু রুটি।'

'বার্লি খেলে মেয়ে ভালো থাকে ? ভালো জিনিস খাওয়ান।'

'কি দোব ?'

ডাক্তার নামটা বলেছে। শুনে যমুনাবতীর বাবা মুখ কালো করে বাড়ি ফিরে গিয়েছে। মা বলেছে, 'কি দিতে বলল গো ?'

'সেই যে ? সিনেমায় গ্যাকনি ? এক কৌটো জিনিসে তেইশ রকম ভিটামিন থাকে ?'

'তার দাম কত গা ?'

'চোদ্দ টাকা।'

'চোদ্দ টাকা !'

যমুনাবতীর মা একটুক্ষণ কি ভেবেছে। তারপর লক্ষ্মীর ভাঁড়টা ভেঙে পয়সাগুলো এনে স্বামীর সামনে রেখেছে। বলেছে, 'আটটা টাকা আছে। বাকি ছ-টা টাকা যোগাড় করতে পারবে না ?'

ওর বাবা পয়সাগুলো নিয়েছে। কিন্তু ওর চোখের কোলে জল চিকচিক করেছে।

তারপর মেয়ের জ্বর ছাড়লে যমুনাবতীর মা একদিন দেখেছে দোকানের কাচের ভেতর পুতুলটা নেই। দেখে ও বড় স্বস্তি পেয়েছে। এখনো পুতুলটা থাকলে ওর

মনে কষ্ট হত। যতদিন পুতুলটা কিনবে বলে জানত, ততদিন ও মনে মনে পুতুলটাকে আদর করত, কোলে নিত। পুতুলটা কখন যেন ওর মেয়ে হয়ে যেত। সুন্দর, ফর্সা, সোনালি চুল একটা যমুনাবতী। সেই সঙ্গে স্বপ্নে ও নিজেও সুন্দর হয়ে যেত। যমুনাবতীর বাপও। সুখী, সুন্দর, সম্ভ্রান্ত। মা, বাবা দুজন সুন্দর না হলে কি মেয়ে সুন্দর হয়?

আবারও পয়সা জমাতে লাগল। এবার শুধু ঠোঙাবেচা পয়সা নয়। এবার রাখালী ওকে কাঁচা সুপুরি এনে দিল। বলল, 'কুচোতে সুবিদে। তুমি সরু করে কুচোও দি' নি? আমি যেয়ে দোকানে দিয়ে আসব।'

যমুনাবতীর মা এখন সুপুরিও কুচোয়, ঠোঙাও তৈরী করে। এখন ও নিজেই দোকানে একটা লাল জামা দেখে রেখেছে। জামাটার দাম বারো টাকা। একটা কিছু কিনব বলে রোখ করলে তবে যমুনাবতীর মা কুপি জেলে বসে বসে ঠোঙা তৈরী করতে পারে। সুপুরি কুচোতে পারে। নইলে শরীর আর চলে না। পিঠ ভেঙে পড়ে। বুক কনকন করে। চোখের সামনে রঙীন রঙীন ধোঁয়া দেখে।

এখন ওর চেহারা আরো রোগা। আরো জীর্ণ আর ক্লান্ত দেখায়। ফুটপাথে সকল জাতের ভিড়ের ভেতর দিয়ে ও যখন হেঁটে যায় তখন ওকে দেখেই বোঝা যায় ওর মতো কত লক্ষ মানুষ এখনো আছে বলেই খাদ্যে দেশ স্বয়ম্ভর হতে পারছে না, ক্লাস এইট অবধি শিক্ষা অবৈতনিক হচ্ছে না, রেশনে চাল বাড়ছে না।

এখন যমুনাবতীর মা জেগে জেগে একটা দুঃসাহসী স্বপ্ন দেখে। এই শহরে ওরা ফালতু, অবাঞ্ছিত নয়। শহরের ভিড়ে সবাই যখন ট্যাক্সি চড়ে, তখন ওরা তিনজন পা টেনে টেনে হাঁটে না। ওরাও ট্যাক্সি চড়ে। ওরাও আলোর নিচ দিয়ে হাঁটে। এই স্বপ্নটায় যমুনাবতীর পরনে লাল জামাটা থাকে। ওর মা-বাবার গায়ে কি সুন্দর জামাকাপড় ঝলমল করে। সব দোকানে কেনা। ফুটপাথের আধা অন্ধকার থেকে দেড় টাকা—সাড়ে তিন টাকা—আড়াই টাকার নিলামে কেনা জামা কাপড় নয়।

ভাঁড়ের পয়সা জমে জমে এবার ন টাকা হয়।

কিন্তু এবার যমুনাবতীর অসুখটা আরো গুরুতর হয়। আবার ওরা ডাক্তারের কাছে যায়।

এখন জানা যায় ওর ফুসফুসে জোর নেই, ওর লিভারটা খারাপ। ওর হাড়ের ভেতর অব্দি ঠিক মতো মজ্জা তৈরি হচ্ছে না।

বাবা বলে, 'একটা টনিক খাওয়াব?'

'খাওয়াতে পারেন।'

ডাক্তার খসখস করে টনিকের নাম লিখে দেয়। এবার ভাঁড়টা ভাঙবার কথা

ওর বাবারই আগে মনে হয়। টনিকটা কেনা হয় এগারো টাকা দিয়ে। যমুনাবতীর মার অনেক কথাই মনে হয়। ও একটা কথাও বলে না। শুধু যে ওর স্বপ্নেই লোকটা ভীতু আর রোগা আর নিরীহ তা তো নয়। সত্যিই যে লোকটা ভীতু আর রোগা আর নিরীহ।

এখন যমুনাবতীর মারও নিজেদের তিনজনকে একটু একটু ফালতু বলে মনে হয়।

ও শুধু বলে, 'হ্যাঁ গো? মেয়ে ভালো হবে তো?'

'দেখা যাক।'

'তুমি অমন করে বলচ কেন? ডাক্তার কি বললে?'

'বললে…।'

'কি?'

'ওর কি কি দরকার তা জানো? ওর মতো বাচ্চাদের সকাল থেকে রাত অব্দি দুধ, ডিম, মাখন, মাছ, দই, আপেল, কলা, মাংস, সব্জি, আরো কত কি খাওয়া উচিত। তা না খেলে…'

'কি হয়?'

'শরীরের পুষ্টি হয় না। ওর হয়নি। কোলে নিলে বোঝো না ওর ওজন কত কম? ওর চোখ দেখে বোঝো না ও কত নির্জীব?'

'এখন খাওয়ালে ও সেরে ওঠে না?'

'কোত্থেকে খাওয়াবে? নাও, পাগলামো করো কেন?'

রাখালী মুখ অন্ধকার করে বলে, 'অমন নানা নিধি খাওয়ালে যদি শরীল সারত তাইলে আর বাবুদের ছেলেগুলো অমন হটক্কারে অসুখে পড়ত না। নাও! এবলা কাজটা ঝপ করে সেরে নাও দিকিনি। আমি অমনি যেয়ে গঙ্গায় এট্টা ডুব দে' মায়ের খাঁড়া ধোয়া জল এনে দিই। তাই খাইয়ে দাও। মা বাপ রোগা রোগা, মেয়ে কি থুমথুমে মোটা হবে?'

রাখালীই কিন্তু কালীঘাট থেকে অমনি একটা ছোট্ট টক আপেল নিয়ে আসে। দেখে মেয়েটা কি হাসে! ও কি মনে করে মাসি ওর সঙ্গে ঠাট্টা করছে?

রাখালী ওকে খেলা দেয় আর স্বরহীন, কর্কশ গলায় গান গায়—

যমুনাবতী সরস্বতী ভায়ে বোনে ভাগ্যবতী॥

বাড়ি ফিরতে ফিরতে ওই গানটা শুনলেই যমুনাবতীর মার মনে হয় ওর বিশ্ব-সংসার ঠিক আছে।

এখন যমুনাবতীর বাবা, ওর মা, ওর জন্যে একটা ফল, একটা সন্দেশ, মাঝে-

মধ্যে আনে। মেয়েটা যত দেখে তত খিলখিলিয়ে হাসে। ও কি ভাবে মা বাবা ওর সঙ্গে ঠাট্টা করছে?

এখন ওর মা আর একটা পুতুল, একটা জামার কথা ভাবে না। এখন ও বাজারসুদ্ধ ফলপাকুড়ের কথা ভাবে। এখন ও ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে না, জেগেও না। এখন ও বলে, 'ভালো সামিগ্রী তুমিও খাওনি, ও পেটে রইতে আমিও খাইনি। তাইতে সব শরীরটা এমন হয়ে গেল?'

এখন যেন ওর সব কেড়েকুড়ে খেতে আর খাওয়াতে ইচ্ছে করে। কেন ওর হাতে টাকা আসে না? টাকা থাকে না? যদি নাই থাকে তাহলে বাজারে কেন এত সোনালি লাল ফল, উজ্জ্বল মরকত সবুজ তরকারি, রুপোলি মাছ, তরতাজা মাংস? এত চাল, এত পথ্য, এত বেবিফুড, একটা ক্যাডবেরি চকোলেটে এক গেলাস দুধের গুণ? আমুল মাখন নিয়ে শিশুদের কাড়াকাড়ির ছবি?

দেয়ালে, লাইটপোস্টে এত ছবি, এত কথা? সুখী পশ্চিমবঙ্গ গড়ে দেব। যুগ-স্রষ্ট তুমি! সমাজবাদের পথে দ্রুত অগ্রসর হওয়া? গরীবি হটাবার হুমকি?

ও বুঝতে পারে না ও আছে বলে, ওর মতো কয়েক লক্ষ মানুষ আজো ক্ষেতে, খামারে, পথে ফুটপাথে, রেলের পাশে আছে বলে এইসব কাজগুলো করা যাচ্ছে না।

কিছুতে সুন্দর হচ্ছে না এই নগরী। সার্থক হচ্ছে না প্রত্যহের সিদ্ধান্ত।

ও বুঝতে পারে না ওর চোখের চাউনি কি রকম বদলে যাচ্ছে আজকাল। আজকাল ওর চোখে রাগ থাকে, হিংসে থাকে, প্রশ্ন থাকে। আর তাই দেখেই ওর মালিক ওকে প্রশ্ন করে, 'কি হইল আপনার?'

'মনটা ভালো নেই, মেয়েটার অসুক।'

'কি অইছে?'

'জানি না। নানা নিধি জিনিস খেতে বলেচে।'

'অ!'

মালিক কিছুক্ষণ কান চুলকোয়। তারপর বলে, 'কি খাইতে বলে?'

'নানা নিধি। হাতে পয়সা নেইকো, তাই…'

'ধূপ বিক্রির কমিশন পান না?'

'পাই। তাতে চলে না।'

ওর গলাটা রুক্ষ। মনিব অবাক হয়। তবে বহুদিন অবধি যমুনাবতীর মার গলাটা মিয়োনো ছিল, চোখ ছিল কাতর, করুণ, ভিখিরির চোখ। সেই চোখ দুটো মনে করেই মনিব দশটা টাকা দেয়। বলে, 'আমিও আপনাদের মতোই। ছা পুষা।'

নোটটা যমুনাবতীর মা লক্ষ্মীর ভাঁড়ে রেখে দেয়। এখন ও ঠিক করে কিছুতে টাকাটা ভাঙবে না। ঠোঙা বানিয়ে, সুপুরি কুচিয়ে ও অনেক পয়সা করে ফেলবে। তারপর সেই পয়সা দিয়ে ওরা তিনজন দুধ, ডিম, মাছ রোজ খাবে। বারুইপুরের বেগুন, তারকেশ্বরের আলু, চন্দননগরের কলা, ক্যানিঙের মাছ, সব খাবে। ওদের শরীর ফিরে যাবে।

তখন ওদের হেঁটে যেতে দেখলেই বোঝা যাবে ওরা ফালতু নয়। ওদের ফেলে দিয়ে ভোটের আগের প্রতিশ্রুতি, ভোটের পরের সিদ্ধান্ত পূর্ণ করবার দরকার নেই। ওরা থাকলেও সব করতে পার তোমরা। এই শহরকে সি. এম. ডি. এ. সুন্দর করে তুলতে পারে। মাটির নিচে রেললাইন বসতে বাধা থাকে না কিছু। সবাই চাকরি পেয়ে যেতে পারে, চাষীরা জমি। পুজোর আগে গ্রাম বাংলা ছেড়ে শহরের ফুট-পাথে জঞ্জালের মতো জমে থাকতে হয় না কারুকে।

যমুনাবতীরা থাকলেও এর সব কিছু হতে পারে।

এই সাত-পাঁচ ভেবেই ওর মা টাকাটা রেখে দেয়।

কিন্তু একদিন ওর বিশ্বসংসার তছনছ হয়ে যায়।

যেদিন রাখালী আর পরিচিত ছড়াটা গায় না, যেদিন এই প্রথম ওরা ডাক্তারের কাছে যায় না, ওদের বাড়িতেই ডাক্তার আসে। যেদিন পরিচয় অপরিচয় ভুলে ওদের উঠোনেই অন্য ঘরের ভাড়াটেরা এসে দাঁড়ায়। যেদিন রাখালীর আর্ত, দীর্ঘ, অসভ্য কান্নার শব্দে আশপাশের ভদ্র ভদ্র বাড়ির সভ্য-সভ্য সকালটা নষ্ট হয়ে যায়।

যেদিন ওরা দুজন ঝুঁকে পড়ে শুধু বলে, অ যমুনাবতী, একবারটি চাও মা! একবারটি হাসো?

কিন্তু ক দিনের ডেঙুজ্বরের তাপে রাঙা মুখে যমুনাবতী শুয়েই থাকে, চোখ বুজেই থাকে। যেদিন ওষুধ ওষুধ গন্ধমাখা ঠোঁট দুটো ও একবার ফাঁক করে না, হাসে না।

তারপর অনেক, অনেকক্ষণ বাদে ওরা হেঁটে হেঁটে ঘাটে যায়। যমুনাবতী আজ বাবার কোলে থাকে। মা, রাখালী, রাখালীর বোনপো পাশে পাশে হাঁটে।

রাখালীর বোনপো বলে, 'কাঠে অ্যানেক খরচ গো মাসি! তার চে…'

যমুনাবতী রাঙা রাঙা চোখে অবাক হয়ে ঝকঝকে রুপোলি দরজাটা দেখে। দেখে দেখে ওর চোখে পলক পড়ে না। কত কত অ্যালুমিনিআম ওতে আছে গো? ও বলে, 'কত দিতে হয় কানাই?'

'দশ টাকা। সে ধরো ওতে, আর…'

এখন যমুনাবতীর মা ওর বাবাকে বলে, 'যেয়ে নিয়ে এসো ভাঁড় ভেঙে। দশটা টাকাই রয়েচে।'

যমুনাবতীর বাবা চলে যায়। যমুনাবতীর মা বসে থাকে। এখন ওর চোখ আগেকার মতো মিয়োনো ভীতু-ভীতু নয়। এখন ওর চোখে প্রশ্ন নেই, রাগ নেই, হিংসে নেই। ওর চোখ কান্নায় ফোলা, লাল জবা, বিস্মিত, অস্বস্তিকর ভয়-জাগানো। এখন ওর চোখে বিস্ময়, অনন্ত অপার বিস্ময়। এখন ও বুঝতে পেরেছে ওকে, ওর মতো মানুষগুলোকে ফেলে দিতে না পারলে এ শহরের, এ দেশের মুক্তি নেই। সকলের, সব প্রতিশ্রুতির পথে ওরা বাধা, জঞ্জাল।

ওর চোখের বিস্ময় দেখে বোঝা যায় ও ভাবছে তাই যদি হবে তবে কেন এখনো ওকে টিকিয়ে রাখা? দেওয়ালের শতোত্তর সহস্র নামের দিকে ও ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে। ফেলে দেওয়া তা যায়! ওই তো প্রমাণ রয়েছে।

এখন ওকে আর ফালতু মনে হয় না, দরকারীও মনে হয় না।

অসম্ভব অচেনা অচেনা, ভয়াবহ দেখায় ওকে, কেন না এ মহাতীর্থে, এই সকালে, এখনি, ও নিজের বিষয়ে, নিজের মতো লোকদের বিষয় সব কথা জেনে গেল।

এখন মনে হয় ওকে, ওর মতো মানুষগুলোকে ফেলে দিতে না পারলে এ শহর, এ জীবন, এ দেশ, কিছুই সুন্দর হবে না। ওরা আছে বলেই সকলের কাজের পথে এত বাধা। মনে হয় ওর মতো মানুষগুলোর জন্যে এখনি কোন, জরুরি ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। এত বৈজ্ঞানিক, এত পরিকল্পনা, এত গ্যাস, এত চেম্বার, ব্যবস্থা কি হয় না?

আজীর

'নামে তুমি পাতন হে, তায় আজীরের* বংশ। তুমারে আমি মিঞা দিব নাই হে!'

একথা বলে পাতনকে চৈত্রের দুপুরে বের করে দিল সজনলাল। সজনলালের বাড়িঘর বলতে লালমাটির টোঙাঘর।

টোঙাঘরের নিচের খোঁডলে ছাগল থাকে, ওপরে মানুষ। চাল বলতে তাল-পাতার টোপ চাল।

সজনলাল সেই টোঙাঘরের দরজায় বসে গামছা ঘুরিয়ে বাতাস খেতে খেতে বলল, 'তুমি যাও হে পাতন।'

পাতন সজনে গাছের ছায়ায় কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ভীরু মিনতিতে বলল, 'আমি আর কার ঠেঙে যাব বল?'

'তা আমি জানি?'

'মোরে কেও মিঞা দেয় না যি!'

'দিবে কেন?'

'কেন দিবে না বল?'

সজনলাল কিছুক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে রইল। ওর বউ ভুবনদাসী ছাগলের খোঁড়ল থেকে মুখ বের করে বলল, 'কিছু বুঝ না হে তুমি! ডাঙ পিচাশ বট! ই ত্যাতপ্পর তাতে মানুষকে বের করে দেয়? দেখ না, মাথায় তাতে লাগরের বুদ্ধি হরে গেছে? লাও, উকে ঘরে বসাও। তুমি ঘরে উঠ গো পাতন। ঠাণ্ডা হও। সম্ঝে হল্যে ঘর যাবে।'

ভুবনদাসীর মনটা বড় নরম। ও পাতনের মতো নিরীহ মানুষের দুঃখ দেখতে পারে না। তা ছাড়া ওই পাতন, ওর শুঁড়ি মনিবের কাছ থেকে চুরি করে এনে ওকে এক নম্বর খাওয়ায় মাসে একবার। সজনলাল কি! মানুষ? মেয়ে বিয়ে দিবি না, না দিলি। তা বলে এই তাতে মানুষকে বের করে দেয়?

পাতন কিন্তু গুটিগুটি ভুবনদাসীর খোঁড়লে এসে ঢুকল। ভুবনদাসীর কাশের

---

* আজীর: অতি অল্প অর্থের জন্য আত্মবিক্রয়কারী

রোগ। কাশিতে ছিট ছিট রক্ত বেরোয়, রাতভোর জ্বরে শোষে ভুবনদাসী।

তাই পাকুড়ঠাকুরের থান থেকে মাদুলি এনে পরেছে ভুবনদাসী। রামছাগলের বাতাস ভাল। ভুবনদাসী একটা দেড়ে বোকা পাঁঠা আর তিনটি ছাগলের নাদির পাশে চাটাই পেতে শোয়। ভাল থাকে শরীরটা।

সেই চাটাইয়ের এক কোণে বসল পাতন।

চাটাইয়ের অন্যদিকে শুয়ে ছিল ভুনি। সজনলালের চোদ্দ বছরের ডাগর মেয়ে।

পাতন নিশ্বাস ফেলল। বয়স হয়ে গেল কত। চুলে পাক ধরে গেল। ভুনিকে যদি সজনলাল বিয়ে দিত ওর সঙ্গে! পাতনের সংসার হত।

'জেবনটা, বুঝলে ভুনির মা, সোমসার না হলে বেরথা যায়। না কি বল?'

'আজীর বংশে মিঞা দিয়ে আমার লাভ?'

'মনিব মা বলে, সোমসার কর পাতন।'

'তা তুমি কেনে আজীরের মিঞা দেখ না?'

'আর আজীর কুথা?'

'তা দেখ পাতন, উ আজীরপাট্টা মনিব ছেড়ে দিবে? বলে দেখেছ?'

'না। দিবে না।'

'তবে তুমার জেবন বেরথা যাবে।'

'বড় কষ্ট ভুনির মা!'

'জানি।'

ভুবনদাসী নিশ্বাস ফেলল। সংসার করা মানে পরণে ত্যানা, স্ত্রী পুরুষে একবেলা ভাত জুটবে না, যে যখন ক্ষেতে খাটাবে, তখন অন্ন পাবে। নইলে উপোস, বারো মাস উপোস।

সেইজন্যেই সংসার করা দরকার। স্ত্রী-পুরুষের দরকার পরস্পরের গায়ের তাপের। ভাঙা টোপচালের নীচে কঙ্কালের মতো দু-চারটে শিশুর। নইলে কি নিয়ে থাকে ভুবনদাসীর মতো, পাতনের মতো মানুষরা?

প্রত্যহ অন্নের আশা কে করে? ভুবনদাসীরা করে না। ওরা জানে এ পৃথিবীতে কিছু মানুষ রোজ খায়, কেউ একবেলা, কেউ মাঝেমধ্যে।

ওরা তৃতীয় দলে। ভাত কে চায়? ভাত কে পায় রোজ? শশীবালা আমানি বেচে, আমানি খাও। শরীরে তাগদ থাকে, বাসরাস্তায় গিয়ে ভাতের হোটেল থেকে ফেন চেয়ে খাও। নইলে জঙ্গলে যাও। জঙ্গলবাবুদের পাহারা এড়িয়ে কন্দ খোঁড়, বাঁশের কচিপাতা সেদ্ধ করে খাও।

জীবন এইরকমই। সে জীবনে বউ বড় দরকার। ভুবনদাসী তা জানে। তাই ও বলল, 'ই দেশ ছেড়ে ভিনদেশে যেতে পার? ভিন গাঁয়ে? যিখানে ক্যাও তুমারে চিনে না? সিথা গেলে বউ পাও।'

'যাব কুথাকে? মনিব পুলুস দিয়ে আনা করাবে।'

'সিবার আনা করছিল বটেক।'

'আবার আনা করাবে। যিথা যাই, এ ভোবন সিঁচে আবার আনা করাবে গো! আজীরের কেও নাই।'

'বুল না হে! তুমার কথা শুনে মোর বুক ফাটে।'

'বড় কষ্ট গো!'

'লাও! ই কষ্টের উপায় তুমার হাতে নাই।'

'না। মনিবের পা ধরে কেন্দ্যেছি কত। বল্যেছি, আজীরপাট্টা দেন মাশায়, মোরে খালাস দেন।'

'উ বা কি করে বল?'

'তাই বলে মনিব। বলে তুর পিত্তিপুরুষকে মোর পিত্তিপুরুষ কিনেছিল, সি কি আমি নিদান করতে পারি? তাল্লে পিত্তিপুরুষের কোধ হবে বিষম।'

'লাও! তবে আর কি করবে বল?'

'কিছু না। বড় দুঃখ আমার হে! বেথা বুঝ, তাই বললাম।'

'ই কি? উঠ কেন? যাও কুথা?'

'যাই। কবিরাজ শওরে যাবে, তা মনিব মার তরে তেল লিয়ে যাই।'

'কি তেল গো?'

'মাথার তেল। মনিব মার মাথার ব্যামো ভুনির মা! উ তেল দিলে মাথে ভাল।'

'মনিব মা তুমায় স্তেঁহ করে বেস্তর।'

'তা করে। কুনঅ সামগগি মোরে না দিয়ে খায় না। খরা বল, বরা বল, মাংস আমি আনব, উনি আঁদবে। তা মোর তরে আগে সাপোটে আখবে।'

'খুব খাও, তাই না?'

'খু—ব!'

'নিত্য ভাত খাও?'

'বিয়েনে খাব, দুপুরে খাব, সাঁঝে খাব। তা বাদে মুড়ি খাব, পিঁয়াজ খাব, গুড় খাব। খাই খুব।'

'বস্তর দেয় না কেন?'

'দিবে, এবার দিবে।'

'ভাল আছ হে, ভাতের সুখে।'

'কিন্তু মনে বড় বেথা যি।'

'মনিব বলে না কিছু?'

'মনিব শালোমালো বলে, গেণ্ডাই-মেণ্ডাই করে! বলে যা শালা, বউ ধরে আন, বিয়া কর। তা আমি বলি মাশায়, আজীরকে কেও মিঞা দেয় না যি! উ বলে বলবি তিন সম্ঝে ভাত দুব, বছরে দুখানা বস্তর। তাতে বউ মিলে না?'

ভুবনদাসী কি ভাবল। তারপর বলল, 'হোথা যেয়েছিলে?'

'কুথা গো?'

'শোঁশানতলা? মায়ের কাছে?'

'না।'

'উনির পা ধরে পড়্ গা। উনি দেবাংশী মানুষ। জানলে উনি জানবে।'

'উনিকে ভয় করে যি!'

'কেন?'

'মোরে রাতে যেতে বলে যি!'

'তা যাবে।'

'ভয় করে।'

'কেন?'

'রাতে গেলে যদি…'

'যেতে বলে, দেবভাবে বলে। মানুষভাব উনির নাই। ভয় কি তুমার?'

'যদি মোরে বাণ মেরে এথে দেয় বরা খরা করে?'

'না। তুমার ভয় লাই হে। যেয়ে দেখ।'

'উনি নিদান দিবে?'

'দিতে পারে। পারলে উনি পারে।'

'দেখি!'

'তুমি বড় অভাগা হে! আজীর হয়াছিল তুমার পিত্তিপুরুষ। তুমি তুমার মালিক লও। তুমার মালিক উ মাতং শুঁড়ি। তুমার দুঃখে মোর বুক ফাটে।'

পাতন একবার সতৃষ্ণ চোখে ঘুমন্ত ভুনির দিকে চাইল। বলল, 'চুরি করে, পাতকী করে কত মদ, চাল, গুড় খাওয়াছি গো! মিঞাটা দিল না ভুনির বাপ।'

'আজীর যি।'

'তা দেখ, যেয়ে দেখি হোথা!'

'হ্যাঁ। যেয়ে পা ধরে পড়বে। আর দেখ, উনি কি বলে মোরে বলে যেও।'

পাতন উঠল। তালপাতার ছাতাটি মাথায় দিয়ে ও বেরিয়ে এসে হাঁটতে থাকল। এখন কবিরাজবাড়ি যাবে, তেল নেবে।

মনিব মা বন্ধ্যা। তায় যুবতী। শরীরে নানা রোগ তার। পাতনকে ছাড়া তার একটি দিন চলে না। পাতন পা টিপে দেবে। মাথা টিপে দেবে। উঠোনে মূর্ছা গেলে পাতন তাকে পাঁজাকোলা করে ঘরে তুলবে। আর কেউ তাকে ছুঁলে মনিব মা অজ্ঞান অবস্থাতেও টের পাবে। চেঁচাতে থাকবে।

পাতনের মনিব মাতঙ্গ শুঁড়ি বলে, যাস কুথা? মনিব মার কাছে থাকবি। তু গোলাম, ঘরের গোলাম। উর কাছে থাক, আঁসগুলান দেখ, গরুগোয়াল কাড়্।'

বলে, 'তু মোর সাথে হারামি করবি না কখুনো।'

পাতনও জানে সে কথা। মনিব মাকে পা টিপে দিলে, মাথা টিপে দিলে, পাঁজাকোলা করে তুললে, ওর রক্ত চঞ্চল হয়। চামড়ায় চড়কতলার আগুন জ্বলে।

চড়কের রাতে ভক্ত্যারা গনগনে কাঠকয়লার আংরা আগুনের ওপর দিয়ে হাঁটে। পাতনও হেঁটেছে। পাতন যখন পাশে দাঁড়িয়ে দেখেছে, আগুনের আঁচে শরীর পুড়ে গেছে ওর।

আবার ভক্ত্যা হলে সেই আগুনই তখন ভোরবেলার শেতল বেলেমাটির পথ।

সেই আগুন পাতনের শরীরে মনিব মা জ্বালায়। পাতন মনে মনে ভক্তি এনে সে আগুনকে শীতল করে নেয়। মনকে বলে, 'উনি মনিব মা গো! উকে মাত্তি-ভাবে দেখতে হবে। কুনঅ পাপ ভাবতে নাই।'

ও আজীর, বংশানুক্রমে ক্রীতদাস।

কবিরাজবাড়ি থেকে তেল নিল পাতন। তারপর এগিয়ে এসে বসল দীঘির ধারে। নামে রাজার দীঘি। জল এখন তলাঙ্কি। চৈত্রে এই, বৈশাখে দীঘির বুক ফুটিফাটা হবে।

তখন গাঁয়ের পাঁচজন এসে দীঘির বুক খুঁড়ে রেখে যাবে সন্ধেবেলা। রাতভোর সেই গর্তে চুঁয়ে চুঁয়ে জল জমবে। ভোর না হতে নিলে পরে জল পাবে না কেউ।

অগ্নিবর্ণ ধোঁয়ার মতো তাতে জল শুকিয়ে যাবে।

তখন সবাই যাবে চার মাইল দূরে ব্লক আপিসে। সেখানে কুয়ো শুকোয় না। কুয়োতে জল মেলে।

যাবে মাস্টারবাবুর বাড়ি।

এ জেলাটা অনাবৃষ্টি আর খরা দুর্ভিক্ষের জেলা। বছরের পর বছর সরকার

রিলিফের টাকা দেবে।

সেই রিলিফের টাকা নেন মাস্টারবাবু। এ অঞ্চলের পাঁচখানা গ্রামের রিলিফের টাকা উনি বছর বছর নেন, জানা কথা। যেটা নিয়ম দাঁড়িয়ে যায়, সেটাকেই মেনে নেয় পাতনরা। কখনো কেউ বলে না, 'কেনে? রিলিফের টাকা মোদের লেগে, মোরা পাই না কেনে? ধান কুথা যায়? বীজ কুথা যায়?'

রিলিফের টাকা থেকে মাস্টারবাবু বাড়ির চারদিকে পুকুর কাটিয়ে, কুয়ো খুঁড়ে আবাদ করেছেন। ধানভানা কল, শহরে বাড়ি, একখানা বাস, কি করেননি?

জল উনি মানুষকে দেন। খাওয়ার জল, রান্নার জল। তবে স্নান করতে দেন না কাউকে।

পাতনের মনিবেরও দুটো কুয়ো বাড়িতে। রাতেভিতে জল পাহারা দেওয়া পাতনের একটা বড় কাজ। বড় পাপী মানুষগুলো। রাতে জল হেন জিনিস চুরি করে।

যতদিন না সময়মত খরা নামছে, ততদিন রাজার দীঘিতে জল থাকে তলায়।

পাতন দীঘির ধারে বসল। অশ্বত্থ গাছের ছায়ায়। মা যদি বেঁচে থাকত, তাহলে ওকে চৈত্রমাসের সন্ধেবেলায় অশ্বত্থগাছের ছায়ায় বসতে দিত না কখনো। এ সময়ে প্রেতিনীরা তৃষিত আকাঙ্ক্ষায় আকাশে অলক্ষ্য আঁচল উড়িয়ে ফেরে। সে আঁচলের বাতাস লাগলে মানুষের মরণ হবেই হবে। অবধারিত সত্য।

পাতন শুনেছে ওর পিতামহরা সাত ভাই ছিল। তারা সকলেই আজীর। সকলেই কাজ করত মনিবের পিতামহের কাছে। মনিবের পিতামহ শুঁড়িখানায় টাকা করেছিল, আবার ধানজমি করেছিল বিস্তর। এখানে নয়, দশখানা গাঁ পেরিয়ে, বাঁধের ধারে।

আজীররা সাত ভাই সেখানেই থাকত। চাষবাস করত, ধান বয়ে আনত মনিবের গোলায়।

তাদের একজনের বিয়ে ঠিক হয়েছিল। বিয়ের বর, হলুদ ছোপানো ধুতি পরে বাঁধের জলে স্নান করে উঠে চৈত্রমাসের সাঁঝবেলা অশ্বত্থ গাছের নিচে বসে।

সেই যে বসল, আর সে ওঠেনি। সবাই যখন খবর পেয়ে ছুটে এল, তখন শূন্য থেকে খলখলিয়ে হেসে প্রেতিনী বলেছিল, 'কাঁচা ছেলা আমার গাছের নিচে চত্তিরে সাঁঝে বসল কেনে? না ছ্যামায় বসব। তা আঁচল দিয়ে ছ্যায়া দিতে ঢলে পড়ল। চিনির পুতুল!'

সে সব আজীরদের বংশ নেই। পাতনের পিতামহের বংশ না থাকলে পাতন জন্মাত না। জন্মটা এত দুঃখে কাটত না তার। বড় কষ্ট তার মনে।

প্রেতলোকে বসে সেইসব আজীররা বংশজের হাতে পিণ্ড চায়, জল চায়। পাতন জানে সব। কিছুই করতে পারছে না ও।

আজীর। ওকে কেউ মেয়ে দিতে চায় না। যে কোন কাঙালী, গরিব, ভিখিরিরও বিয়ে হয়, ওর হবে না। ওর পূর্বপুরুষ ওকে এইরকম ভীষণ শাস্তি দিয়ে গিয়েছে।

॥ ২ ॥

সে অনেকদিনের কথা। এই খরা-আকালের দেশে সেবার যে খরা হয়েছিল, সে নাকি অসম্ভব খরা। ঘাস পাতা, খেতের শস্য তো বটেই, জঙ্গলের বড় বড় গাছও নাকি শুকিয়ে জ্বলে যায়।

আকালে খরায় যা হয়, মানুষ ঘর ছাড়তে শুরু করে।

পাতনের পিতৃপুরুষের জোতজমি ছিল না। বড় গরিব ওরা, গ্রামের একান্তে বাস। এমনিতেই তখনকার দিনেই ওরা একমুঠো ভাত খেত কি খেত না, খরার সময়ে আরো কষ্টে পড়ল স্বামী-স্ত্রী।

ওরা শুনেছিল আজীরিপাট্টা লিখিয়ে কারা যেন এ সময়ে মানুষ কিনে নেয়। ওরা তাই,

—'আমাদের কিনবে গো? মোরা স্তিপুরুষ, ‍য্যামন রাখবে, ত্যামন থাকব, শুধু দু মুঠ ভাত চাই।'

ডেকে ডেকে গৃহস্থদের দোরে দোরে ফিরছিল। তখন এই মাতঙ্গ শুঁড়ির পূর্বপুরুষের জাঁকের সংসার, খেত-খামার। ওদের এমন করে ঘুরতে দেখে ও ডেকে আনে।

বাড়িতেই রাখে ওদের, ভাতজল দেয়, পরনে কাপড়। তারপর একদিন আকাল ফুরোয়। আকাশ থেকে ইন্দ্ররাজার হাতিটা শুঁড় থেকে জল ঝরায় ঝমঝমিয়ে। আবার খাল, পুকুর, কুয়ো ভরে ওঠে। চারদিক ঢেকে যায় সবুজে। তারপর আসে আমন ধানের মাস, কার্তিক। সেই সময়ে পাতনের পিতৃপুরুষ বলেছিল,

—'আমরা বাড়ি যাই মাশায়।'

মাতঙ্গের পূর্বপুরুষ বলেছিল, 'বাড়ি যাই! ঘরে এখন আছে কি? খাবে কি?'

—'কিছু নাই।'

—'এসেছিলে নিজকে বিচে দেবে বলে।'

—'কে কিনে মাশায় ?'

—'ধর যদি আমি কিনি ?'

—'তাহলে ত বেঁচে যাই।'

—'বল ত পাট্টা লিখাই, সাক্ষী ডাকি।'

—'ডাকেন। শুধা দেখেন—'

—'কি ?'

—'মোরা স্তিপুরুষে বান্দা হব। মোদের সন্তান ?'

—'সেও বান্দা হবে।'

—'তার বংশ ?'

—'সবারে কিনে নিব।'

—'মাশায় তুমার বড় দয়া হে! তবে ত আর ভাতের চিন্তা রইবে না কারো।'

দু হাত তুলে পাতনের পূর্বপুরুষ আনন্দ করেছিল। যেন হাতে চাঁদ পেয়েছে। যেন পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্রকে অনন্তকাল দুধেভাতে থাকবার ব্যবস্থা করে দিয়ে যাচ্ছে। মাতঙ্গের পূর্বপুরুষ তুলট কাগজ এনেছিল, হীরেকষের কালি, খাগের কলম। পাট্টা লিখেছিল বংশীধর পতিতুণ্ড। সাক্ষী হয়েছিল গ্রামের পাঁচজন।

পাট্টা লেখা হয়েছিল।

'মহামহিম শ্রীযুক্ত রাবণ শুঁড়ি মহাশয় বরাবরেষু লিখিতং গোলক কুড়া ওলদ চেতন কুড়া সাকিনা মৌজে মামুদচক মামুলে পরগণা অযোধ্যা সরকার বাজুহায় কস্য মুনিস্য আজীরি পাট্টাপত্রমিদম্ কার্যঞ্চ আগে আমি আর আমার স্ত্রী গৈরবী নাম্নি দাসী এই দুইজন কহত সালিতে ভবিষ্যৎ বংশসহসামিল অন্নোপহতী ও কর্জোপহতি ক্রমে নগদ পণ তিন রূপেয়া পাইয়া তোমার স্থানে স্বেচ্ছাপূর্বক বিক্রয় হইলাম—ইতি তাং ১১ কার্তিক সন ১১০১ বাঙ্গালা মোতাবেক ১৫ সহর রবি-নৌয়ন সন ৩৯ জলুষ।'

শ্রীমতি গৈরবীনাম্নি দাসী

কস্যাঃ

সম্মতিঃ

শ্রীগোলক কুড়া
কস্য
ছাপ সহি।

পাট্টার ওপরে দশমাষ ওজনের রূপোর টাকার মোহর ছিল। পাট্টার নিচে পাঁচজন সাক্ষীর ছাপসই ছিল। অন্য কাঙালীরা বলেছিল 'ই কি করলি গোলক ?

বংশটা শুঁড়ির পায়ে বাঁধা দিলি ? আজীর হলি ?'

গোলক কুড়া বলেছিল, 'আজীরের অন্নচিন্তা থাকে না হে। তু শালোরা বুঝিস কি ? ই কালদেশে আবার খরা হবে, আকাল হবে। মোদের আর চিন্তা থাকে না কুনঅ। ই আমি কপাল বেন্ধে কাজ করলাম।'

—'ধুর শালো! আজীর হলি!'

সেই থেকে পাতনরা এই বাড়ির গোলাম। দিন এল, দিন গেল। সেই যে পাট্টা, তার আর নড়চড় হল না কিছু। তিনটে টাকা দিয়ে মাতঙ্গের পূর্বপুরুষ আজীরের বর্তমান ও অনাগত ভবিষ্যৎ কিনে নিল।

এমন অমোঘ সে পাট্টা, যে তার আর নড়চড় হয় না। মাতঙ্গ বলে, 'তড়পাস কেন ? যা না। যেয়ে দেখ না কাছারিতে। মানুষ জমি কিনে, পুকুর কিনে, সে পাট্টা সময় গেলে নষ্ট হয় না। মানুষ কিনা পাট্টা নষ্ট হয় ?'

পাতন একবার পালিয়ে গিয়েছিল।

তখন পাতনের বয়সকাল। সবে তিন সাল খেউরি হচ্ছে। মাথায় দু মণ ধানী-বস্তা নিয়ে ও স্বচ্ছন্দে দু-ক্রোশ পথ হেঁটে যায়।

সেই সময়ে ভরতুপুরে এক নির্লজ্জ বেদেনী রাজার দীঘিতে স্নান করে ওকে দেখিয়ে দেখিয়ে কাপড় ছেড়ে পরেছিল। হাতছানি দিয়ে মস্করা করেছিল।

পাতন বলেছিল, 'হা রে! তুরা ত জাতগোত্তর মানিস না। আমায় বিয়া করবি ?'

—'ধুর। বেদের জাত লই মোরা ?'

—'বিয়া করলে তোকে টাকা দিব।'

—'পাবি কুথা ?'

—'যিথা হয়।'

বেদেনী হেসে আর বাঁচে নি। এ সব কথাবার্তার পরদিন ও পাতনের মনিব-বাড়ি গিয়ে উঠেছিল। বাঁশের ও বেতের ঝুড়ি, কাঠের চিরুনি, পলার মালার সওদা নিয়ে। ডুগডুগি বাজিয়ে গান গেয়ে গেয়ে ঢুকেছিল বাড়িতে।

তখন মাতঙ্গের প্রথম বউ বেঁচে। এ বউটা তখন আসেনি। বেদেনী সেই মনিব মাকে বলেছিল,

—'ই যি মোরে বিয়া করতে বলে গো।'

—'কারে ? তোরে ?'

—'লয়ত কি মোর পিসিকে ? দাঁতীটাকে ?'

—'উ আজীর।'

—'কিনে লিয়েছ ?'

—'উরে নয়, উর পিত্তিপুরুষরে।'

—'তাতে উ গোলাম হল ?'

—'হল না ? উ কেন, উর বংশ হলে সেও মোদের গোলাম হবে। পাট্টা লিখা আছে।'

—'তবে ত লাগর, হল না।'

বেদিনী পাতনকে হেসে হেসে বলেছিল। পাতনের চিবুকটা ধরে বলেছিল, বেশ লাগর গো ! মনে ধরেছিল খুব।'

—'তবে বিয়া কর ?'

—'ধুর।'

বেদেনী চলে গিয়েছিল। পরে গ্রাম ছেড়ে যাবার সময়ে বলেছিল, 'গোলামি ছড়ে আয়। বেদে হ।'

—'কেমন করে ?'

—'জাতধম্মো তেগে আয়। মোর সাথে থাকবি।'

পাতন বোঝেনি বেদেনী ঠাট্টা করছে। ও ভেবেছিল বেদেনী ঠিকই বলেছে।

জাতধর্ম ছেড়ে বেদে হলে মন্দ কি ? দেশে দেশে যাওয়া যায় ডুগডুগি বাজিয়ে। আর মনিবের জোড়ালাথি খেতে হয় না পেটে।

পাতন পালিয়েছিল।

পাতনকে ধরে নিয়ে এসেছিল মাতঙ্গ।

মাতঙ্গ পাতনকে উঠোনে হাত-পা বেঁধে নারকোলদড়ির চাবুক দিয়ে নির্মমভাবে মেরেছিল। 'মহাপাপী বেটা ! তু পালালে তুর পিত্তিপুরুষের মুখ পোড়ে না ? তু জানিস না তু আজীর ?'

—'বেদে হলে উ মোরে বিয়া করে গো ! মোর সোমসার হয়। মোর পিত্তি-পুরুষ জল পায়।'

—'জেতছাড়ার জল ল্যায় পিত্তিপুরুষ ?'

—'ল্যায় গো।'

পাতন কেঁদেছিল। ওর কান্না দেখে মাতঙ্গ মনে কষ্ট পেয়েছিল। আহা, বড় কষ্ট পাচ্ছে ছেঁলেটা। কিন্তু ও যদি জাত দিয়ে বেদে হয়, চলে যায় দেশান্তরে, তাহলে মাতঙ্গের সংসারের কাজগুলো করে কে ?

মাতঙ্গ বলেছিল, 'তুকে দেখে মনটা মোর কুকাইছে বাপু ! কিন্তুক আমি বা কি করি বল ? তুমার পিত্তিপুরুষে আমার পিত্তিপুরুষে কথা। আজীরপাট্টায়

পাঁচটা সাক্ষীর ছাপ। ই কি মোর সাধ্য লাকচ করি?'

—'আমি বা কি করি গো?'

পাতন মুখ তুলে জিগ্যেস করেছিল। পরে, মাতঙ্গের হুকুমে পাতনের গায়ে পাকামদ মালিশ করে দিয়েছিল বেচন, শুঁড়িখানার চাকর। বেচনের দুটো বউ। একপাল ছেলেমেয়ে। ও যেতেই চায় না ঘরে। ওর ঘরে দুই সতীনে মারামারি আর কোঁদল লেগেই থাকে।

বেচন মদ মালিশ করতে করতে বলেছিল, 'তুকে দেখে আমি রিষ করি, পাতন কত ভাল আছে। হ্যারে! কুন সুখে সোমসার চাস? মোর কথা শুন, সোমসারে কুনঅ সুখ নাই।'

পাতন বেচনের কথা কানে নেয়নি। বলেছিল, 'ই গাঁয়ে কুন বেটাছেলেটা পরিবারকে ভাত দেয়? মিঞারা গোবরঘসি করে, কাঠ গুড়ায়, ধান কাড়ে, ধান ভানে, পেটের ভাত তুলে। আমি সব দিতাম বেচন। কিন্তুক আজীররে কেও মিঞা দিবে না হে।'

—'সেই কথা!'

—'তা দেখ, আগে আগে আমার পিত্তিপুরুষরা মিঞা পেত কুথা? কুথা যেয়ে সোমসার করত?'

—'ত্যাতক্ষণ দিনকাল অন্যরকম ছিল হে! পেটে ভাত, পরনে বস্তর, ই দেখে মিঞা দিত।'

—'আখুন দেয় না কেনে?'

—'আখুন কাঙাল ভিখারী কেও কারো গোলাম হতে চায় না হে! গোলাম রইতে চায় না। জীবনভোর, বংশ ধরে সবে গোলাম রইবে, পেটভাতে রঙ্গবস্তরে খাটবে, হাতে একটা টাকা মাইনে পাবে না, ই দেখে মিঞা দেয় কেউ?'

—'মোর কপাল।'

—'তু এক কাজ কর না কেনে?' বেচনের ভেতরে একটা ছিঁচকে মানুষ বাস করে। সে অসম্ভব সব দুঃসাহসিক কাজ করবে বলে তড়পায়, কিন্তু মুখে কিছু বলে না। বেচন বলল, 'তু মনিবের ঘরের সকল আধিসাঁধি জানিস। তু সিন্ধুক খুলে পাট্টাটা চুরি কর্, যেমুন সিন্ধুক খুলবি, ট্যাকার গেঁজেটা নিবি। তা বাদে চল্ তোতে মোতে ভিনদেশে যেয়ে দোকান দেই গা।'

—'বাপো রে! মোর সাহস,নাই।'

—'তবে মর গা।'

তারপর মাঝে মাঝে পাতনের মনে হয়েছে, কি হয় যদি চুরি করে পাট্টাখানা?

যদি চুরি করে ছিঁড়ে ফেলে কাগজটা? সে কাগজ সে জীবনে দেখেনি। শুধু জানে তার সেই মরণকাঠি আছে মনিবের সিন্ধুকে। মনিব যে চৌকিতে শোয়, তার মাথার কাছে দেওয়ালে গাঁথা সিন্ধুক। সিন্ধুকের মুখে বড় কুলুপ। কুলুপের চাবি মনিবের কোমরে থাকে।

ভাবতে গেলেই ভয় হয়েছে তার। মনে হয়েছে কি করে ও চাবি নেবে, কুলুপ খুলবে? পাতন বড় ভীরু, বড় দুর্বল। আজীর খায়, দায়, থাকে। আজীর পয়সা পায় না কি? আজীরের কি ঘর আছে, না সংসার, না আলাদা কোন সত্তা? মনিবের ঘর তার ঘর। মনিবের সত্তা তোমারও সত্তা। তোমার দেহটাও তোমার নিজের নয়। প্রাণ-মন-হৃদয় কিছুই তোমার নিজের নয়।

পাতন তাই পাট্টা চুরি করেনি।

সেই মনিব মা মরে গেল নিঃসন্তান। নতুন মনিব মা এল। মনিব মার শরীর বড় তাজা, দাঁতগুলি সাদা, চুল বড় কালো।

মনিব মা মাতঙ্গ শুঁড়ির মেয়ের বয়সী হবে। বড় জ্বালা মনিব মার শরীরে।

বিয়ের আগে মনিব হবু শ্বশুরবাড়িতে এক ঝালি গয়না, একটা চেলির কাপড়, একটা মাছ এই পাতনকে দিয়ে পাঠিয়েছিল।

বরের বয়সের কথা মনে করে বিয়ের কনের সর্বাঙ্গ বুঝি জ্বলছিল। তাই ঝালি নিয়ে কনের মা বলেছিল,

'পর মা, গয়না পর! সোনার পশ্শে অঙ্গ শেতল হবে।'

গয়নার স্পর্শে মনিব মার অঙ্গ শীতল হয়নি। জেঁওচ ফল হাতে নিয়ে কত বারব্রত করেছে মনিব মা, কোল জুড়ে ধিয়াপুতা আসেনি। মনিব মা এখন নেমন্তন্ন নেয় না। বলে, 'বাঁঝারে সবে মন্দ দেখে। জেঁওচ মরুঞ্চে সকল পোয়াতি খায় মাছের মাথা, সুখা দই। মোর বেলা হেলন-ফেলন। আমি যাই না লোকের বাড়ি গো!'

মনিব মা মাটির মেঝেতে গড়াগড়ি খায় আদুল গায়ে। হক না হক, ভরা বর্ষায় পুকুরের জলে গিয়ে অঙ্গ ডুবিয়ে বসে থাকে। মনিবের সামনে সাজে না গোজে না। মনিব ঘরে না থাকলে সর্ব অঙ্গ সোনায় রূপোয় সাজিয়ে বলে, 'কেমন দেখায় রে মোকে?'

পাতন বলে, 'ভাল।'

—'তুর সি বেদেনী হতে ভাল? সজনলালের মিঞা হতে ভাল?'

—'হা দেখ মনিব মা, তুমারে আমি মাত্তিভাবে দেখি গো। আমি তোমার ছেলা।'

মনিব মা নিশ্বাস ফেলে। বলে, 'তু গোলাম পাতন, আমিও। সোনাদানা হাতে ছানব, টাকা নিব, ই কারণে বাপ মোরে শুঁড়ির গোলাম করে দিয়াছে না কি বল ?'

—'চুপ চুপ ! কে বা শুনে ?'

মনিব মা পাতনকে ভালবাসে। দুঃখী জানে দুঃখীর ব্যথা। মনিব মা আগে আগে পাতনের বিয়ের কথা শুনলে জ্বলে উঠত। বলত, 'আ রে আমার শখের গোলাম। তু বিয়া করবি, বউ লিয়ে সুহাগ করবি, সে কপাল তুর ? বংশ আজীর না তুই ? বিয়া হলে কি হবে ? চার পা বেরাবে ? আঁটকুড়া শুঁড়ি মরবে, তার ভায়ের বংশ শোরের পাল আসবে তার ঠেঙে। তুর ছেলা তাদের গোলাম খাটবে ?'

কিন্তু এখন মনিব মা অন্য কথা বলে। 'যা পাতন ! মিঞা দেখ একটা। দেখ, আঁটকুড়ার ঘর করে করে মোর রঙ্গে নানা ওগ ধরে যেয়েছে। কবে বা মরি আমি ! মনে বড় বেথা পাতন। ই দেহ কুনঅ কাজে নিল না ভগমান। না দিল সুখ, না দিল ধিয়াপুতা। তা দেখ, আমি গেলে তুরে দেখতে কেও লাই। তু মিঞা দেখ। বিয়া কর।'

—'আজীররে কেও মিঞা দেয় না হে মনিব মা।'

ভুবনদাসীর সঙ্গে কথা বলে পাতন মনে মনে কি ভাবল। তারপর ঘরে এসে গোয়ালে সাঁজাল দিল, গাইগরুকে খড়জল। মাহিন্দাররা খেত থেকে আসবে। তাদের জন্যে বড় হাঁড়িতে ভাত রাঁধতে পারে না মনিব মা।

পাতন ভাত রাঁধল। মনিব মা রাঁধল ডিংলার টক, ঝিঙেপোস্ত। এই দিয়ে মাহিন্দাররা খাবে। তারপর বুনো খরার মাংস রাঁধল তাদের স্বামী স্ত্রী আর পাতনের জন্যে।

মাহিন্দাররা খেল। পাতনকে ভাত দিল মনিব মা। চৈত্রের তাতে পাতনের অঙ্গ জ্বলছিল। পাতন স্নান করে এল কুয়োতলা থেকে।

ভাত খেতে খেতে পাতন বলল, 'মা গো ! ভুবনদাসী, ভুনির মা বলে শোঁশানতলা যাও। শোঁশানতলার মা নিদান দিবে।'

—'তাই যা পাতন !'

—'যদি নিদান দেয়, তবে সোমসার হয়।'

—'হয় পাতন। হা দেখ, তুর বিয়া হলে ইবার ভাল মিঞা আনবি। খু—ব ভাল মিঞা।'

—'পাব কুথা?'

—'আমার মতো মিঞা? এমন্নুনি দলমলে যৈবন?'

—'তুমার মতো?'

মনিব মাকে মাতৃভাবে দেখতে হয়, অন্য চোখে দেখতে নেই। কিন্তু পাতনের মা ছিল শীর্ণ, পিঠকুঁজো।

মনিব মা ভরা যুবতী, এই দলমলে যৌবন তার। চুল খুলে দিলে হাঁটুর নিচে পড়ে, চোখ উজ্জ্বল, দাঁতগুলি সাদা ঝকঝকে। শরীরের প্রতিটি রেখা নিখুঁত। সব যেন পাথর কুঁদে তৈরি। বয়সকাল বৃথা গেলে বুঝি যৌবন ওইরকম অচঞ্চল হয়, মাঝেমাঝে চোখ জ্বলে হিংস্রতায়। এখন যেমন জ্বলছে।

—'আমার মতো।'

—'কুথা পাব?'

—'খুঁজবি।'

—'তুমাকে মনিব কত সোনাদানা দিয়া আনল গো।'

—'তুকে আমি দুব সোনাদানা।'

—'হাই গো!'

—'দুব রে! তু তবু একটা ছেলার সামিল। কার তরে এথে যাব বল? উ খালভরার গুষ্টির লেগে?'

—'ডর লাগে গো, ভয় খাই।'

—'আর শুন—'

—'কি?'

—'মিঞা বাছা কর। তা বাদে তোরে আমি সি পাট্টা চুরি করে লিয়ে দিব। লিয়ে পালাস তু।'

—'নিয্যস?'

—'নিয্যস।'

—'ভুলবে না?'

—'না পাতন। তু জানিস না উ খালভরার কাছে আমি গোলাম। ই জীবনে মোর মুক্তি লাই। উয়ার ফাঁদ কেটে তু পালালে তাথেও মোর মনে শান্তি। তোরে পাট্টা দিব আমি।'

—'তুমাকে ধরবে যি?'

—'মোকে? উর সাধ্য কি?'

—'পাপ হবে যি তুমার?'

—গঙ্গায় চ্যান করে লিব। সব পাপ গঙ্গায় হরে।'

—'গঙ্গা ই দেশে নাই।'

—'তু মোরে লিয়ে যাবি। যাবি না? তুর লেগে আমি পাট্টা চুরি করব, গয়না দুব তুর বউরে। তু নিয়ে যাবি?'

পাতনের মনে অসম্ভব দুরাশা। বড় লোভ হচ্ছে তার। পাপপুণ্যের হিসেব চোখ থেকে মুছে যাচ্ছে। 'তবে আর শোঁশানে যাই কেনে? মিঞা দেখি?'

—'দেখ গা।'

—'মনিব মা, আজীরিপাট্টা ছিঁড়ে ফেললে, গয়না দিলে, উ সজনলাল ভুনির সঙ্গে বিয়া দিবে।'

—'ভুনি রুগাভুগাটা।'

—'খেলেমাখলে তুমার মতো হবে গো।'

—'দেখ তবে।'

॥ ৩ ॥

সজনলাল বলল, 'গয়না তু পাবি কুথা।'

—'মনিব মা দিবে।'

—'নিয্যস?'

—'নিয্যস।'

তখন সজনলাল আর ভুবনদাসী পাতনকে ঘরে এনে বসাল। বলল, 'তবে আর কথা কি? আজীরিপাট্টা না থাকলে তু গোলাম থাকিস না। ট্যাকা দিবে মনিব মা?'

—'মোর আছে পাঁচ কুড়ি।'

—'পেলি কুথা?'

—'য্যাতক্ষণ যা দেয় মনিব মা, সব আমি এখেছি না? তা বারো বছরে পাঁচ কুড়ি টাকা হয়েছে মোর।'

—'সি ট্যাকা লিয়ে করবি কি?'

—'তুমার সমন্ধীর দেশে যাবু। জমি লিব, চাষ খাটব। ধারে লিব জমি। ধান হতে ধার শুধব।'

সজনলাল আর ভুবনদাসী এ ওর দিকে চাইল। বলল, 'কবে পাবি গয়না ?'

—'সি আমি সামলে দুব, বলব তুমায় সময় হলে।'

—'মনিব মা কি বলে ?'

—'সি সান্ধানে আছে। সময় হলে কাজ হবে গো।'

ভুবনদাসী নিশ্বাস ফেলল। পাতন যদি আজীর না থাকে, ভুনির অঙ্গে সোনা দিতে পারে, তাহলে আর আপত্তি কিসের ? পাতনের চুলে পাক ধরলেও শরীরে শক্তি আছে, নীরোগ শরীর ওর। চেহারাও ভাল। না, ভুনির সুখ হবে।

ভুবনদাসী বলল, 'লে, টুকচে মদ খা।'

সজনলাল বলল, 'কারেও বলিস না যেন ?'

—'না, কারে বলি ?'

—'কে কানভাঙাভাঙি করে দিবে !'

—'বলব না গো !'

—'যাস কুথা ?'

—'গোলক শার বাড়ি। মনিব মা কাপড় কিনবে।'

—'উ মনিব মা তোরে লজর ত দেয় না পাতন ?'

—'না না। উ মোরে ছেলাভাবে দেখে, আমি উরে মাত্তিভাবে দেখি।'

—'মাত্তিভাবে দেখলে পরে ভাল। তু ত ভামপানা আছিস, বুঝিস না কিছু !'

—'বুঝি গো, সব বুঝি। দেখ, আমার মনিব মার রঙ্গে নানা ওগ ধরে যেয়েছে।'

—'ত্যাতো খায়, তবু ওগ ? ত্যাতো ভোগে থাকে, তবু ওগ ?'

—'ওগে উনার রঙ্গ জরজর। বলে বাঁচবে নাই গো।'

—'হাঃ! তুরে বলদ পেয়ে বলেছে।'

ভুবনদাসী বলল, 'তা কেন ? ওগ সুখী মানুষকে ধরে না ? তাল্লে নবীন জোতদার মরল কেনে ? কবিরাজমাশায়ের বুনটা ? কি দলমলে শরীল গো ! কে বলে পাচ ছেলার মা ! কবিরাজমাশায় এলে দিলে। তা বাদে নালকি করে আসপাতালে নে গেল, তবু ত বাঁচল না হে।'

পাতন বলল, 'মনিব মা বলে বাঁচব না পাতন। আমি গেলে তুকে দেখতে কেও লাই। মিত্যু জেনে সি মাহাপাতকী করবে বলেছে।'

মেয়ে ঠিক হল, মেয়ের বাপ মা রাজী হল। কিন্তু মনিব মা আর উপযুক্ত সময় পায় না।

পাতন বলে, 'মনিব মা, দেরী হলে মিঞাটাকে আর আখবে নি ঘরে। সামাজে কথা উঠে যেয়েছে কত।'

—'মেয়ের বাপ মা কি বলে?'

—'উরা বলে বিয়ার ফুল ঝিঙাফুল। যে সম্‌ঝেয় ফুটবে, সেই সম্‌ঝে বিয়া। তা সামাজ শুনে না।'

—'র পাতন, জল নামুক। এখুন শুঁড়ি আটটা বাজতে ঘরে আসে। জল নামলে তবে তিনি বিলম্ব করে। তিনি ঘরে না অ'তে কাজ হাসিল করতে হবে গো।'

—'দেখ তুমি।'

মনিব মার রোগ এদিকে বেড়ে চলে। কথায় কথায় আজকাল মনিব মা মূর্ছা যায়। এই প্রথম বৈশাখে মনিব মা ঠাকুরথানে বলি পাঠাল না, পূজো দিল না ঘণ্টেশ্বরীর মন্দিরে। মনিবকে বলল, 'মোর দেহ ভাল দিশে না গো! সতীনের ছ্যামা দেখি দিনেরাতে। মোর বুঝি দিন নাই গো। তুমাকে আবার সোমসার করতে হবে।'

মনিব বলে, 'বাঁজা বলে এত ওগ তুর। দেখ না, কবিরাজ বলে ছেলা তুর হবে মাতাং। ছেলা হলে তুর বউয়ের ওগ যাবে।'

মনিব মা চেঁচিয়ে কাঁদে। বলে, 'আমি বাঁজা, তু আঁটকুড়া। কার লেগে ট্যাকা এনে সিন্ধুকে ভর? খাবে কে? তুর জ্ঞাতগুষ্টি?'

মনিব মার অঙ্গে জ্বালা উঠে যায়। সে কুয়োতলার মাটি গায়ে মাখে, হক না-হক জল ঢালে মাথায়। বিড়বিড় করে বলে, 'পাতন রে! তু বিনা মোর কেও লাই। আমি বিনা তুর কেও লাই, তুকে আমি দিশা করে দিব।'

পাতন মনে ভক্তিভাব এনে মনিব মার মাথা টেপে, পা টেপে। মাথায় বাতাস করে।

এবার খরা বড় বেশি। মানুষ ভেবেছিল জল হবে না। শ্মশানতলার ভৈরবী পঞ্চতপা হোম করল সাতদিন ধরে। গ্রামের মানুষ সেখানে ভিড় করে রইল।

জল চেয়ে চেয়ে মানুষ কত ক্রিয়াকাণ্ডই যে করল। গ্রামের পাঁচজন একত্র হয়ে পাঁচবাড়ির মেয়েকে দিয়ে রাজারদীঘির মরা বুকে কাড়া ডাকাল। বলির পাঁঠার রক্ত চৌচির মাটির বুকে নিমেষে শুষল, জল হল না।

আকাশ ধূমলবর্ণ। রাতেও আকাশে অন্ধকার নামে না। জল, জল বলে হাহাকার উঠে গেল। গ্রামের সবচেয়ে নষ্ট মেয়ে পুন্নশশীকে শ্মশানতলার মা বললেন, 'যা বলি তাই কর্‌।'

গ্রামের সবাই অমাবস্যার রাতে দোরগোড়ায় দুধে জলে একবাটি রেখে দোর দিল।

পূন্নশশী উদোম হয়ে মাথায় বীজধানের সরা নিয়ে দোরে দোরে ঘুরে সেই দুধ জল নিল, ভাঁড়ে ঢালল। তারপর রাজারদীঘির বুকে সেই বীজধান আর দুধ জল ঢালল। কাঁপতে কাঁপতে পূন্নশশী ফিরে গেল ঘরে।

তারপর জল এল।

আকাশ কালো করে মেঘ এল জ্যৈষ্ঠের শেষে। ইঁদরাজার হাতির শুঁড়ে এত জলও ছিল!

ভরে উঠল রাজারদীঘি। কুয়োতে জল, খালখন্দে জল। বৃষ্টি নামলে আর ধরে না। আর তেমনি কি ঝড়! সরকারী জঙ্গলে শালগাছ মাতামাতি জুড়ল। গ্রামের ঘরে ঘরে চাল উড়ে গেল, মানুষের বড় কষ্ট।

এমনি এক ঝড়-বাদলের মাতাল রাতে, মনিব মার সময় হল। মহাপাতকী করল ও।

—'পাতন! পাতন রে! উঠে বস।' মনিব মা গোয়ালঘরে এসে পাতনকে ডেকে তুলল। বলল, 'চল মোর সাথে।'

—'কুথা?'

'চল্ তু। তুর মনিব ঘরে লাই। আজ আসবে না উ।' পাতনের কানের কাছে মুখ এনেছে মনিব মা। মনিব মার গায়ে আশ্চর্য সব গন্ধ। যেন অঙ্গ দিয়ে পাকিমদ চুঁয়ে পড়ছে।

—'আসবে না?'

—'না রে ভাম! তু ত্যাতক্ষণ ঘুমে অচেতন। বেচন বলে গেল মনিব যেয়ে আজ নবীনের ছেলার ঘরে জুটেছে। সেথা পূন্নশশী লাচতেছে, আমোদ খুব।'

—'তুমি লিয়েছ সব?'

—'সব রে, সব!'

মনিব মার গায়ে একটা চাদর। চোখ যেন জ্বলছে। মনিব মা বলল, 'আয় তু!'

—'কুথা যাব?'

—'বলব সব। তুর লেগে মাহাপাতকী হলাম! চাবি সরালাম দুপুরে। এখন তু কত কথা শুধাস পাতন? যদি এসে পড়ে? তুকে মোকে জীয়ন্তে কাটবে।'

—'চল তবে।'

—'বেরিয়ে তুকে দিব সব। তুর পাট্টা, গয়না। তু নিয়ে চলে যাবি। আমি এসে যেমুনকে তেমুন নিদ যাব সব সুমলে এথে। বলব পাতন চুরি করেছে গো।'

—'আর আমি ?'

—'তু যেয়ে জঙ্গলের পথ ধরে পলাবি। পরে যেয়ে তুর সঙ্গে গঙ্গা চ্যান করব।'

—'চল তবে।'

আকাশে কড়াকাবাজ বাজে। এই মেঘ, এই বৃষ্টি, এই অন্ধকার, সব যেন উন্মত্ত ব্যাধ। সকলের লক্ষ্য দুটি পশু। পশু দুটি দৌড়চ্ছে।

দৌড়তে দৌড়তে পাতন আর মনিব মা গ্রামের সীমানা ছাড়াল, পৌঁছে গেল দুবোইবাবার মাঠে। বাবা বড় জাগ্রত। তাঁর থান একটি পাকুড় গাছের নিচে। বছরে একদিন তাঁর পুজো হয় ধুমধামে। অন্য সময়ে বেচনের কাকা লখিন্দর বাবাকে ফুল জল দিয়ে যায়। শিলীভূত দুবোইবাবার অঙ্গধোওয়া দুধ জল খেলে সাপেকাটা মরা রুগী বেঁচে ওঠে।

মাঠটি বড় মন্দ জায়গা।

গ্রামের চারদিক, দশকোণ, চৌমাথা, তেমাথা, দীঘি, খেত, সব নানা রকম দেবদেবীদের হাতে। সে ঢেলাইচণ্ডী, দণ্ডেশ্বরী, ধর্মঠাকুর, বুড়নবাবার বাতাসে প্রেতিনীরা স্বস্তি পায় না। এই দুবোইবাবার মাঠে তারা চৈত্রের দুপুরে, জ্যোৎস্না-হসিত শারদ নিশীথে, এমনি ধারা আষাঢ়ে রাতে নাচে, হাসে, গান করে, মুখে আগুন নিয়ে ছোটে শেয়ালের রূপ ধরে। মরা গাছের ডাল হয়ে পড়ে থাকে। মানুষ পা দিলে মানুষকে নিয়ে শূন্যে তুলে আছাড় মারে।

এ মাঠের বুক জোড়া শুধু পাথর আর পাথর। অগণিত বছর ধরে এই গণ্ড-শিলাগুলির চারপাশে কাঁকর মাটি জমে জমে সব পাথুরে হয়ে গিয়েছে। পাথরের মাঝে মাঝে বর্ষা পড়লে ঘাস জন্মায়। অন্য সময়ে সব হা হা করে রুক্ষ অনুর্বরতার বিফল ক্ষোভে।

এখানে এসে মনিব মা বলল, 'টুকুন দাঁড়া পাতন ! দম নি।'

দুজনে মুখোমুখি দাঁড়াল। মনিব মা হাঁপাচ্ছে। মনিব মা এখন এই পাথর-গুলোর মতই প্রাগৈতিহাসিক, অন্ধকার রহস্যময়।

—'দাও মোকে পাট্টা।'

গা থেকে চাদর খুলে ফেলল মনিব মা। ছুঁড়ে ফেলে দিল।

—'মোর গয়না…' পাতনের কথা মুখে থেমে গেল। সর্বাঙ্গে গয়না পরেছে মনিব মা। বিদ্যুতের ঘন ঘন আলোতে পাতন দেখল নাকে বেশর, গলায় হাঁসুলি, হাতে বালা, ওপর হাতে জশম, কোমরে রূপোর গোট। দেখল মনিব মার গায়ে কাপড় ভিজে লেপটে আছে।

—'স—ব লিয়ে এসেছি।' মনিব মা গেঁজে বের করল একটা। বড় চেনা

গেঁজে গো। এ গেঁজের খাপে পরতে পরতে মদবেচা টাকা।

—'কি করবে ?'

চলে যাচ্ছে। মন থেকে ভক্তিভাব চলে যাচ্ছে। মনিব মা এখন আগুন, উত্তপ্ত কুলকাঠের আংরা। ভক্ত্যা হয়ে সে আগুন ভক্তিভরে মাড়িয়ে যেতে পারে যদি, তবে পাতনের গা পোড়ে না। কিন্তু পাতন তা পারছে না। মনে মনে যত চেষ্টা করুক, ও শুধু দর্শক হয়ে যাচ্ছে। ভক্ত্যা হতে পারছে না। অঙ্গ পুড়ে যাচ্ছে পাতনের।

—'কি করবে ?' পাতন আবার জিজ্ঞেস করল।

—'তুর সাথে যাব।'

—'মোর সাথে !'

—'মোর মত দলমলে মিঞা তু পাবি কুথা পাতন ? মোরা চলে যাব, যেয়ে যেথা হয় থাকব। চল পাতন, জঙ্গল পেরায়ে আরো পথ, তা বাদে বাসরাস্তা, তা বাদে টিসন। টেনে চেপে যাব মোরা।'

—'দাও।'

—'কি ?'

—'মোর পাট্টা ? মোর আজীরিপাট্টা ?'

—'পাট্টা লাই পাতন।'

—'কি বল ?'

—'পাট্টা লাই। আমি সব দেখেছি হাঁচুড়ে নামিয়ে, হাঁটকেছি কত। পাট্টা থাকে কখুনো ? কবেকার কাগজ ? ই দেখ, তু বিশ্বাস যাবি না, ই গামছায় বান্ধা ছিল, লিয়ে এসেছি, দেখ্ ত, সব ছিঁড়া গুঁড়া ধুলাটা রে !'

—'মিছা কথা ! পাট্টা তুমার সিন্দুকে, মোরে মারা করাবে বলে এথে এসেছ তুমি !'

—'পাতন রে ! মোর কথা শুন্ !'

—'মাহাপাতকী করলে যদি, তবে মোর পাট্টা !'

পাতন কথা শেষ না করতে মনিব মা দলমলে যৌবন নিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে। কিন্তু পাতনের বুকে এখন শত শত ক্রুদ্ধ মাতঙ্গের হিংস্র আক্রোশ। সে ঠেলে ফেলে দিতে চায় মনিব মাকে। মনিব মা ওকে জড়িয়ে ধরে ঠেলতে থাকে। তার শরীরেও এখন অমিত শক্তি।

পাতন ওকে ছাড়িয়ে দেয় গলার দুপাশে টিপে, ঝাঁকুনি দিয়ে। সে ঝাঁকুনিতে মনিব মার গলাটা পেছন দিকে উল্টে যায়, ঘাড় ভেঙে মাথা ঝুলে পড়ে পাশে,

পাতন চেয়ে দেখে না। মনিব মাকে ফেলে দেয় ও।

পাতন ফিরতি পথে দৌড়য়। চাই, তার আজীরিপাট্টা চাই! তারপর ও ফিরে আসবে ডুবোইবাবার মাঠে। গেঁজেটা নেবে, গয়না নেবে কেড়ে। তারপর ওই মহাপাতকী মনিব মাকে ফেলে রেখে পাতন পালাবে।

মুক্ত মানুষের জন্যে পৃথিবীটা পড়ে আছে। সে পৃথিবীতে অনেক অনাবাদী শস্যভূমি, অনেক মেয়ে দলমলে যৌবন নিয়ে পাতনের, শুধু পাতনের জন্যে অপেক্ষা করছে। সে পৃথিবীতে ওকে পৌঁছতেই হবে।

পুন্নশশীর নাচ তেমন জমেনি। মাতঙ্গ শুঁড়ি তাই ঘরে ফিরে এসেছিল তাড়াতাড়ি। সিন্ধুকভাঙা দেখে ও শোরগোল তুলে মানুষ ডেকেছিল। ওর ঘরে তখন অনেক মানুষ।

পাতনকে ওরা ধরে ফেলল। আজীরিপাট্টার কথা শুনে মাতঙ্গ বুক চাপড়ে কেঁদে উঠল।

কাঁদল ডুবোইবাবার মাঠে দাঁড়িয়ে। মনিব মার মৃতদেহের সামনে দাঁড়িয়ে।

মনিব মা মিথ্যা বলেনি। সে পাট্টা ছিল না, কোথাও ছিল না। পাট্টার অবশেষ ওই জীর্ণ ধুলোটুকু একটা গামছায় মোড়া ছিল। মাতঙ্গ নিজেও সে পাট্টা দেখেনি। তার বাবাও দেখেনি। তুপুরুষ আগেই তুলট কাগজ কালের প্রকোপে জীর্ণ হয়ে নষ্ট হয়ে যায়।

পাতনকে ওরা হাতকড়া দিয়ে নিয়ে গেল থানায়।

মাদার ইণ্ডিয়া

মাদার ইণ্ডিয়ার বয়স আশি, রং তামাটে কালো, চুল কোঁকড়া, ছোট ছোট, সাদা। মুখের প্রত্যেকটি রেখা ফাটা ফাটা, যেন গঙ্গার জল সরে যেতে কাদার ওপর দিয়ে লক্ষ লক্ষ কেঁচো চলে গেছে। ঘোলাটে চোখ দুটি মৃত নক্ষত্রের মতো। যেন দুটি নক্ষত্র কবে মরে গেছে, পৃথিবী সে খবর রাখে না বলে মনে করে তারা দ্যুতিমান। শতচ্ছিন্ন একটি ডুংরি শরীরে দুফেত্তা দিয়ে পিঠের দিকে কাঁধের কাছে গেরো দেওয়া।

ওর নাম মাদার ইণ্ডিয়া। সেই কত বছর আগে যখন কি একটা সিনেমার ছবি দেওয়ালে দেখা যেত, যখন ছেলেদের দুঃখে ও ফুটপাথে বসে রাত নেই দিন নেই কাঁদত আর কাঁদত, তখন সিধু বলেছিল, তুই মাসি মাদার ইণ্ডিয়া। সিধু ওকে এই ফুটপাথে জায়গা দিয়েছিল। কলকাতার ফুটপাথে বাঁধা জায়গা পাওয়া বড় ভাগ্যের কথা। বছর বছর যারা দক্ষিণ থেকে আসে, তাদের তেমন জায়গা মেলে না।

তারা আজ এখানে, কাল ওখানে ভেসে ভেসে বেড়ায়। ও জায়গা পেয়েছিল সিধুর কল্যাণে। সিধু বলেছিল, আমি ওকে মাসি বলেছি, ও থাকবে। সিধু নেই, সিধু মরে গেছে। যাবার আগে ওকে নিজের প্যাকিং বাক্সের কাঠ আর চটের ছাউনিটা দিয়ে গেছে।

সিধু ওর পেটের ছেলে নয়। কিন্তু পেটের ছেলেরা ওকে যা যা দেয়নি, পর হয়ে সিধু তা দিয়ে গেছে।

ঘরটুকু, জায়গাটুকু, নামটুকু।

ভাতের ব্যবস্থাও করে দিয়েছিল সিধু। ও নিজে রাখতে পারেনি। সিধুর মতো চার-পাঁচজন ভিখিরি কাঙালীর জন্যে ও রান্না করত। বেলায় বাজার ঝেঁটিয়ে কপির পাতা, পালং পাতা, পাঁঠার মলনাড়ি নিয়ে আসত ও। তিনখানা ইট পেতে উনোন জ্বেলে তাই দিয়ে অমৃত রেঁধে দিত কাঙালীদের। সামনের বাড়ির গিন্নি ওর কাছ থেকে ভিক্ষের চাল কিনে নিতেন। আশ্রিত পরিজনদের সেই চাল রেঁধে দিতেন। তিনি জানতেন না, তাঁর ঝি ওকে নুন লঙ্কা হলুদ দিত। ঝির কোমরব্যথা ও ঝেড়ে দিত মাঝে মধ্যে।

তখন পেটভাতটা উঠে আসত। এখন বহুদিন ওঠে না। নতুন দিনের নতুন নতুন কাঙালী এখন ওর প্রতিবেশী। ওদের ভাত রাঁধে ফুল্লরা।

এখন ও গুলঘসি দেয়। কাঠগোলা থেকে কাঠের ঘেঁষ আনতে কোমর পিঠ ব্যথায় ভেঙে পড়ে। মাটি দিয়ে ঘেঁষ মেখে ও বড় বড় গুল দেয়। এখনো এ পাড়ায় ঘরে ঘরে কয়লার রান্না। ঘুঁটের চেয়ে কাঠের গুলে ধোঁয়া কম হয়।

গুল শুকোতে দিয়ে ও প্যাকিং বাক্সের সিংহাসনে বসে পাহারা দেয়। দেহটা খিদের আঁচে জ্বলে গেছে। ঘন দগ্ধ বনস্পতি। সেই সুদূর চিরতরে হারিয়ে যাওয়া শৈশবে ও ওর বাউলি বাবার সঙ্গে বনবিবির পুজো দিতে যেত। তিনখানা মাঠ, দুটো খাল পেরিয়ে। বাজে পোড়া একটা অশ্বত্থ গাছ ও বছর বছর দেখত। বছর বছর বর্ষার জল পেলে পোড়া গাছের গোড়া থেকে কচি পাতা মুখে নিয়ে নতুন কচি ডাল বেরোত। তাতের দিনে সে পাতা শুকিয়ে যেত।

বাবা বলত, বট-অশ্বত্থ দেবাংশী গাছ। তাই মরেও মরে না, এ এক আশ্চায্য কথা।

ওর শরীর সেই গাছের মতো জ্বলে গেছে। খিদের আগুনে। কিন্তু স্মৃতির জল পড়লে আজও বিগত, চিরতরে ফেলে আসা জীবনের কত কথার অঙ্কুর মাথা তোলে।

স্মৃতিতে ডুবে গেলে ওর মুখের রেখাগুলি ডুবে যায়, শান্ত হয়। ও জানেও না ওকে দেখলে তখন জরতী মনসা-বুড়ির কথা মনে হয়। যেন খিদে-তেষ্টা-বার্ধক্য-দারিদ্র্যে জরজর কোনো মনসা শুধু দুটি পেটের ভাত, এক আঁজলা মাথার তেল, লজ্জাহর একখানা কানির জন্যে পুজোপ্রার্থী হয়ে বসে আছে। কেউ যাকে বোঝে না, সবাই যাকে দূর হ চেংমুড়ি কানি, অলপাইয়া, অশুভটা বলে তাড়িয়ে দেয়। তাড়িয়ে দেয়—শুধু তাড়িয়ে দেয় বলে যার দুটি ভাতের কাঙালপনা ঘোচে না।

এখন ওর চেহারা পাথর দেখায়। ঘোলাটে চোখ দুটিতে শুকনো কান্না ঠেলে উঠে আসে। তিন তিনটে ছেলে ছিল তার, সবাই ওর কাছ থেকে হারিয়ে গেছে। কারা—কোন শ্রেষ্ঠতর শক্তি তাদের টেনে নিয়ে গেল ও আজও জানে না।

সে কি আজকের কথা? যেন কত কত যুগ হয়ে গেল শশী ধাড়া আর তার বউ পাতুলের অন্য লোকদের সঙ্গে মান্নাবাবুদের জমি হাসিল করে আবাদী করতে আবাদে গিয়েছিল। শশী ধাড়ার বউ আগে যায়নি। ওর বাউলি বাপ যেতে দেয়নি। বলেছিল, কচিকাঁচা নে সেথা যায় কেউ? তা ছাড়া ওতে অধর্ম।

কেন? অধর্ম কেন?

জাননি?

জামাইয়ের মুখের দিকে করমচার মতো লাল, শিয়ড়চাঁদা সাপের মতো ক্রুদ্ধ দুটি চোখ তুলে ধরে গগন বাউলি বলেছিল এগারো বছর ধরে যারা অন্যত্তর ওদের জমি চাষ করে, তাদের উচ্ছেদ করে নাই গোলবদন মান্না? বারো বছরে দখল জন্মে তাই

এগারো বছরে কোঁকে লাথি। তারা এ জমি হাসিলে অগগে অধিকারী নয়? তারা তোমাদের ছেড়ে দিবে?

শশী ধাড়া মাথা নেড়ে অসহায় হেসে চুপ করে গিয়েছিল। কিন্তু নিজের জেদ ছাড়েনি। বলেছিল, মোদের উচ্ছেদ করতে লারবে গো। মোদের পিছনে বাবুরা আছে।

কিন্তু শশীর কথা ফলেনি। অনাবাদী বন্যভূমি বড হিংস্র, যুধ্যমান, আক্রোশক। সে ভূমি যারা একবার হাসিল করে চাষ করেছে, তারপর উচ্ছিন্ন হয়েছে, তাদের ক্রোধ অতি ভয়ংকর। তাদের সঙ্গে আর অরণ্যের, বাদার, নোনাগাঙের সঙ্গে শশীদের দীর্ঘদিন লড়তে হয়। তারপর দীর্ঘায়িত এক রক্তোৎসব সাঙ্গ হলে বাতাসে আমনের গন্ধ ছড়াতে শুরু করেছিল। উচ্ছিন্ন মানুষদের মতোই উচ্ছিন্ন অরণ্যও হার মেনে পিছু হঠে সরে গিয়েছিল।

সে সব কথা ওর মনে পড়ে। ওর মনের উপর দিয়ে কে যেন শশী ধাড়া আর শশী ধাড়ার বউয়ের জীবনকথার পট খুলে ধরে আর টেনে সরিয়ে নিয়ে যায়। শশীর ঘরসংসার হয়েছিল, তিনটে কলবলে ছেলে। দেখে দেখে গগন বাউলি বলেছিল, এগারো বছরে তুলে দিবে বাপ। তুমি যেয়ে মোর ঘরে বস।

সত্যি সত্যি শশীদের যখন উচ্ছেদ করে দেয়, তখন গগন বাউলি বেঁচে নেই।

অনাবাদী বন্যভূমি হাসিল করে আবাদী করে তুলে, এগারো বছরে উচ্ছেদ হয়ে গেলে চিরকাল শশীরা লড়ে। এবারও লড়েছিল। হেঁসো বনাম বন্দুকের লড়াইয়ে চিরকাল শশীরা মরে। এবারও মরেছিল। শশীর বউও মরিয়া হয়ে হাতে হেঁসো নিয়ে বেরিয়েছিল। তারপর ও হাজতে যায়। হাজত থেকে বেরিয়ে যখন শাশুড়ির কাছে যায়, শাশুড়ি বলেছিল, আমার ছেলে নি। তোর বড়টাও বাপের সঙ্গে গেল, হেথা অইতে পাত্তিস। কিন্তুক তুই অইলে যন্তন্না বেস্তর। পুলুস পাছু ছাড়বে না।

তখনি শশী ধাড়ার বউ বুঝতে পারে ওকে কোটালে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, এ হল মাতলায় ষাঁডাষাঁডির কোটাল। কোটালের টানে নদী সমুদ্রে হারায়। এ কোটাল ওকে ভাসিয়ে বৃহৎ পৃথিবীতে নিয়ে এসে ফেলে দিয়ে গেল। শশীদের লড়াইটা থেমেও থামেনি। তাই পুলিস হন্যে হয়ে পাপীতাপীদের খুঁজে ফিরছিল। তাই হারান সামন্ত বলেছিল, একো জায়গা না কি দুনিয়ায়? আর জায়গা নি? চল্ আতের আঁধারে পালাই।

ওরা অনেকে এসেছিল। কলকাতার বুড়ি ছুঁয়ে কত কত জায়গায় যে নিয়ে ওদের গিয়েছিল গ্রাম্য বৃদ্ধ হারাণ। কত জায়গায় শশী ধাড়ার বউ ডাঙা জমি হাসিল করেছিল, কত লক্ষ্মীমন্তের ধানখেতে ওর হাতে রোয়া ধানে আমন ফলে-

ছিল, কতদিন পিঠ নিচু করে, শুধু পিঠ নিচু করে ভীষণ আক্রোশে ও শুধু ধান রুইত। কত আষাঢ়ের বিপত্তারিণী ব্রতের দিনে, কত শ্রাবণের লোটনষষ্ঠী ব্রতের দিনে, দুরন্ত ক্রোধে, ঝরোঝরো জলে ধানচারা নেড়ে দিত শশী ধাড়ার বউ। পউষে পউষলক্ষ্মী ব্রতের হিমেল বাতাসে সোনালী ধান কেটে তুলে দিত পরের উঠোনে, সব এখন গ্রামীণ পটুয়ার হাতে আঁকা অবহেলিত, অবমানিত পটের ছবির মতো অস্পষ্ট চলমান ছবির মিছিল হয়ে গেছে।

কত কতবার এগারো বছর না হতেই নতুন খেতমজুর আসতে ওরা উদ্বিগ্ন হয়েছে তাও মনে পড়ে না। তবে শশী ধাড়ার বউয়ের বিগত জীবনের, বার বার উচ্ছিন্ন হবার কথা মনে করতে গেলে মনে পড়ে সুদূর ও প্রাচীন শৈশবের কথা। বাউলি বাপ বনবিবি পুজো করতে যাচ্ছে। সঙ্গে মা-মরা একটা কালো মেয়ে। নৌকো চলেছে খাল বেয়ে, জলে গরান গাছের সবুজ ছায়া। মেয়েটা দেখছে জল-ফড়িং আশ্রয় খুঁজে যে পাতাটায় বসে, যে ভাসমান চলমান পাতায়, সেটাই পিছলে ভেসে সরে যাচ্ছে। মনে পড়ে জলের সোঁদা এঁশো গন্ধ, বাপরে গায়ের তেল-তামাকের গন্ধ।

আর মনে পড়ে ভাতের গন্ধ। ভাতের গন্ধের লোভ বড় অমানুষ বড় লক্ষ্মীছাড়া করে ফেলেছিল শশী ধাড়ার বউকে। শশী ধাড়া সেই যে বলেছিল, আমি যাই। তুই হেঁসো ছাড়িস না বউ, ওদের অসাধ্য কিছু নি!

শশী সেই সে হেঁসোটা ওর হাতে দিয়ে বড় ছেলেকে নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। শশীর বউ হেঁসোটা আর ছাড়েনি। হাজতে যাবার আগে শাশুড়ির গোলপাতার চালে গুঁজে রেখে যায়। বেরিয়ে এসেই নিয়েছিল।

সেই হেঁসোটা পেটকাপড়ে, সঙ্গে দুটো উঠতি ছেলে নিয়ে শেষ বার উচ্ছেদ হওয়ার পর শশী ধাড়ার বউ মেদিনীপুর থেকে কলকাতা এসেছিল। মিছিল করবি চল্ বলে ওদের এনেছিল বাবুরা। তখন হারাণ বলেছিল ই খুব ভাল বাবু। অকম অকম ফেলাগ নে অকম অকম মিছিল করবি। উটি খেতে পাবি, পয়সা পাবি।

মিছিল কি বারাবুরে হয়?

শশী ধাড়ার বউ ধমকে উঠেছিল। মিছিল রোজ হয়নি, রুটি রোজ আসেনি, কিন্তু ও ছেলেদের কথামত দেশে ফিরতেও রাজী হয়নি। বলেছিল, যে থুথু ফেলিছি, তা তুলে খাব? সেথা তোদের আছে কি?

হেথা কে আছে, কি আছে?

আর ভেসে বেড়াতে পারিনি রে! হেথা থাকব।

কি খাবি মা?

য্যামন জুটবে।

ছেলেরা আর কিছু বলেনি। মার ওপর ওদের অসীম নির্ভর। শশী ধাড়ার বউ ছেলেদের মানুষ করেছিল ক্ষুধিত ও হিংস্র ভালবাসায়। ওর নাড়ীর বন্ধনে একদা যেমন, ওর ভালবাসার পাকেও এখন ওরা তেমনিই বন্দী ছিল। এত বড় ছেলেদের মার ওপর এত নির্ভরতা, এমন ভাসমান জীবনে কমই থাকে। শশীর বউ বলেছিল, তা বাদে—

কি, মা?

মরলে তোরা মোকে গঙ্গা দিবি। হেথা গঙ্গার দেশ।

তখনো ওরা এই ফুটপাথেরই এক কোণে থাকত। সিধু ওদের থাকতে বলেনি, নিজের ছাউনিতে আশ্রয়ও দেয়নি, আবার তাড়িয়েও দেয়নি। অন্য কাঙালীদের বলেছিল, দোখনো। এরা বারাবুরে নয়। টেমপোরারি। চলে যাবে।

সেখান থেকে বেহালা বাজার। শশীর বউ দোকানে মশলা ঝাড়ত। ছেলেরা কাঠ-গোলায় কাঠ চেলা করত। সেখান থেকেই একদিন মাইক দিয়ে ডেকে কারা যেন ছেলেদের নিয়ে গিয়েছিল। মেজ ছেলে ছুটতে ছুটতে এসে ওর হাতে ছ-টা টাকা দিয়ে গিয়েছিল। বলেছিল, খাগু নে খুব গণ্ডগোল হতেছে মা! তাই পালে পালে অসচ্ছল মানুষ আসতেছে কোতা কোতা হতে। আমরাও যেতেছি।

শশীর বউ বলেছিল, হাংনামা জবর পাকলে পাইলে এস, অ বাপ হাংনামায় থেকনি।

তাই থাকি?

ছেলেরা ওর কাছ থেকে চিরতরে হারিয়ে যাবার সেই এক পটের ছবি। মা দাঁড়িয়ে আছে বাস-রাস্তায়, ছেলেরা হেসে ওর দিকে মাথা নেড়ে চলে যাচ্ছে। পথে কাতারে কাতারে লোক।

তারপর সন্ধ্যে হতে না হতে সব যেন চুপ, বোবায় ধরা, যেন শশী ধাড়ারা মরে যাবার পর পুলিসের চোখ এড়াতে বনে লুকিয়ে থাকার সময়কার মতো নিঃশব্দ, যন্ত্রণাময়, জন্মবোবা মেয়ের গর্ভযন্ত্রণার মতো প্রাণান্তিক, মূক।

রাতে কারা বিশৃঙ্খলে ফিরতে লাগল ছুটে ছুটে। কারা খবর আনল কোথায় গুলি চলেছে, চাষীরা পথ চিনত না বলে কোথা কোথা ছুটে গেছে, কোথায় গাড়ি করে লাশ সরিয়ে ফেলা হচ্ছে বলে চতুর্দিকে ঘেরাও। নেড়ী কুকুর ছাড়া আর কোন জীবন্ত প্রাণী বুটপরা পায়ের বেড়া পেরিয়ে ঢুকতে পারছে না। খুব গণ্ড-গোল।

সকলের মতো শশীর বউ প্রথমে ভয় পায়নি। ও ছেলেদের নিয়ে নিজেও

হাঙ্গামায় পড়েছে। উদ্যত লাঠি বা ধাবমান বুট এড়িয়ে পালাতে হয়েছে ওকেও রাঢ়ে-গৌড়ে। ওর ছেলেরা পালাতে জানত।

কিন্তু ছেলেরা আর ফেরেনি। ও নিজে কি হেঁটে যায়নি সেই সব জায়গায়? কিন্তু সেখানে তো শুধু আকাশ ফুটো করে লাল লাল দালান-বাড়ির পাঁচিল। নিরাপদ ধাড়া, লখিন্দর ধাড়ার খবর সেখানে কেউ দিতে পারেনি।

বাবুরা, তোমরা সকলে ফিরলে, মোর নিরাপদ, মোর লখিন্দ কোথা অইল?

ওর এ কথার জবাবও কেউ দিতে পারেনি। তখন শশী ধাড়ার বউয়ের মতো অন্যদের নিয়ে বাবুরা আরেক মিছিল করতে চেয়েছে। কিন্তু সে মিছিলে হাঁটতে হাঁটতেই শশী ধাড়ার বউ সরে গিয়েছিল। দলের সবাই যে পথে চলেছে, সে পথ ছেড়ে অ নিরাপদো! অ লখিন্দো! কমনে গেলি হারামজাদারা? এই বলে, বুক চাপড়ে ও পথে পথে টাউর খেতে শুরু করে।

পটের ছবিতে সব পলায়মান, ছুটন্ত, মারীচী ক্ষিপ্রতায় সচল। শশী ধাড়ার বউ টাউর খেয়ে, ক্লান্ত-ডানা গুবরে পোকা যেমন চড়া আলোয় বিহ্বল হয়ে কান্নিক মেরে ঘোরে তেমনি করে ঘোরে এ শহরের ফুটে, পথে, ময়দানে। কখনো বিয়েবাড়ির বাইরে ভোজের এঁটো খেতে তৎপর, কখনো বাতাসকে প্রশ্ন, ছেলে দুটো গেল কোথা?

বুঝি মরে গেছে একথা যে বলেছ, তাকেই শশী ধাড়ার বউ বলেছে, হেঁসো দে ফেড়ে ফেলে দেব। তখন অবশ্য ওর অজানতে বহুদিন ওর হাত থেকে হেঁসো খসে পড়ে গিয়েছিল। শশী ধাড়ার বউয়ের তখন মনের অবস্থা রক্তমাখা কাদার মতো ঘোলাটে। কিন্তু 'মরে গেছে' এ কথা কানে গেলেই ও চমকে ওঠে। বাউলি বাপ বলত মত্তে না দেকলে মরেছে বলে মানি না। সেথা সন্দো আছে, সেথা এই মন্তর-পড়া কানি ঘরের বাতায় বেঁধে থুই। য্যাতদিন কানি থাকে, ত্যাতদিন আশ।

সেই সময় একদিন, ঘুরতে ঘুরতে শশী ধাড়ার বউ আবার সিধুদের ফুটপাথে ফিরে এসেছিল। সিধু ওকে চিনতে পেরেছিল। বলেছিল, তোমার এমন দশা?

ভুরু কুঁচকে শশী ধাড়ার বউ বলেছিল, কেমন দশা?

এমন! ছেলেরা কোথা?

পাইলেছে।

সিধুই ওকে আশ্রয় দেয়। শশী ধাড়ার বউ তখন স্বচ্ছন্দে ভিক্ষে চেয়ে বেড়ায়। ওর পেট-আঁচলে পয়সা ছিল। পয়সা ও সিধুকে দিয়ে দেয়। কেন দেয়, তা ও নিজেও জানে না। ওর তখনকার সব আচরণের ব্যাখ্যা পরে ও নিজেই করে উঠতে পারেনি। তারপর, হাইড্র্যান্টের জলে স্নান করে, পেটে দুটি খেয়ে, একদিন ও

সহসা স্বস্থ হল। আবার ফিরে এল সম্যক জ্ঞানে। কিন্তু মাঝের অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় ও যেমন হেঁসো, হাঁড়ি পাতিল, মাথার চিরুনি, গামছাখানা পথে পথে ফেলে এসেছে তেমনি, স্বভাবের সেই দুর্জয় রাগ, দুরন্ত আক্রোশ, অবাধ্য জেদও কোথাও ফেলে দিয়ে থাকবে।

সিধু বলল, শোক তাপে মাগী ভোঁ মেরে অয়েছে।

অন্য কাঙালীরা বলল, তোর ত্যাত মায়া ?

সিধু বিড়ি টেনে বলল, এক কতা, একন ও টেমপোরারি নয়। বারাবুরে কাঙালী। বারাবুরে কাঙালীকে বারাবুরেরা ঠাঁই দিতে হবে। যে ফুটপাতরের যে নিয়ম।

তুই জানিস !

তা ভেন্ন উনি থাকলে মোদের সম্‌সারটুকু থ্যাকে।

অন্য কাঙালীরা বড় নিশ্চিন্ত হল। হ্যাঁ, কাঁথা-কানি-চট-কাগজ-পিসবোর্ডের চটি —হাঁড়ি-পাতিল টিনের মগ-তোলা উনুন-কেরোসিন কাঠের বাক্স—ওদের সংসারও দিনে দিনে কম ভারি হয় না।

বড় নিশ্চিন্ত হল ওরা। সিধু ওকে ঠাঁই দিচ্ছে স্বার্থপর বুদ্ধিতে এ কি কম আশ্বাসের কথা ? যদি হৃদয় করুণায় বিগলিত হয়েছে বলে সিধু ওকে ঠাঁই দিত, তা হলে সিধুকে ওরা বিশ্বাস করত কি করে ?

সিধু আবার বিড়ি টেনে বলল, চ্যায়রা খানা দেখেছিস ? একেবারে মাদার ইণ্ডিয়ার মেকাপ।

সিধুই বলল, নুলোটা রাদত। তুমি যদি রাদ তবে ও বেরুতে পারে বেশি বেশি।

ভিখিরিদের রান্না একবার। কয়েক দিনেই শশী ধাড়ার বউ সে রান্না রাঁধতে শিখল। ভিক্ষের চাল সামনের বাড়িতে বেচে ভিখিরিদের পয়সা দেবার ভার ও নিজে নিয়ে নিল। কয়েক দিনেই বাজার ঝেঁটিয়ে ও পচা টমেটো, কপি পাতা, মূলো শাক, আধপচা আলু, পাঁঠার মল নাড়ী আনতে শিখল। একদিন, সিধু মরে যেতে ও যখন গুঁড়ি মেরে সিধুর চটের ঘরে ঢুকল, কেউ মানা করল না। ওর অধিকার আছে কি না সে প্রশ্ন তুলল না।

কেননা ততদিনে আদি গঙ্গার পাড় বাঁধা হয়ে গেছে. রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ি করছে সি. এম. ডি এ দেওয়ালের শ্লোগান ও শ্মশানের দেওয়ালের নাম মুছে গেছে। অনেক অনেক দিন কেটে গেছে।

ঘরে ঢুকে ও একখানা বাখারির গায়ে দুটো ন্যাকড়া বাঁধল।

নতুন ঘরে ঢুকলি, পুজো দিবি না ? হুলো বলল। বলল, আমরা মিষ্টি খাব না ?

ও কথা বলেনি। বাউলি বাপ বলত, য্যাতক্ষণ আশ থাকবে, কানি খুলবি না। কানিটুকু জেয়নকাটি। হটককারে একদিন মরা বলে যারে জান, সে ফিরে আসবে ?

নেকড়া বেঁধে ও বলল, যে খুলবে তারে আমি শেষ করে দেব।

কেন ? ওতে কি আছে ?

মোর ছেলেদের জেবন।

তারা আর আসে ?

আসবে। মোরে গঙ্গাসই করবে।

গুল শুকোতে বসে ও শশী ধাড়ার বউয়ের জীবনটা রোজ পরিক্রমা করে। যেন ওর মনটা সূর্য। শশী ধাড়ার বউয়ের জীবনাকাশে সে সূর্যকে ঘুরে আসতেই হবে। কিন্তু এখন ও বোঝে জীবন শেষ হচ্ছে। সে সূর্যের দ্যুতি রোজ রোজ ম্লান হচ্ছে। সে সূর্য তাপ হারাচ্ছে।

এখন ওর প্রতিবেশী নতুন কাঙালীরা। তারা ফিরে আসে সন্ধ্যায়। তখন ফুল্লরা রাঁধে। সারাদিন ফুল্লরা বাস-স্টপে ঘোরে। মাঝে মধ্যে ওর কাছে এসে ওষুধ চায়। মেয়েটা নষ্ট, নোংরা। ও মেয়ে-কাঙালীদের দেখতে পারে না। কিন্তু ওই ফুল্লরাই, ও উলঙ্গ হয়ে হাইড্র্যাণ্টের জলে স্নান করার পর, ওকে ডুংরিটা পরিয়ে দেয়, ঘাড়ে বেঁধে দেয় গেরো।

আজ গুলগুলো ঝুড়িতে তুলে ও বলল, অ ফুল্লরা, মোক্ষদাকে ডেকে গুল নে যেতে বল।

তুমি যাবে নি ?

না রে, শরীলটায় দিচ্ছে না।

সি কি। ওদের বাড়ি না যজ্জি হচ্ছে ?

যজ্জি তুই খে গে যা।

ফুল্লরা ভারি অবাক হল। ও যে যে বাড়িতে গুল দেয়, সে সে বাড়িতে বিয়ে-শ্রাদ্ধ-পইতে-অন্নপ্রাশেন ওর একখানা পাত বাঁধা। সেই অবাধ নিমন্ত্রণে ও যাবে না ?

ফুল্লরা বলল, কাঁপতেছ কেন ?

ঠাণ্ডা না বড্ড ?

ঠাণ্ডা কোতা ? দেখি ?

জ্বর নেই, তবু শরীর কাঁপছে। ও বলল, নয় তুই দে আয়, পয়সা নিস গুনে গুনে।

সাবু বাতসা খাবে ?

ধুস।

ও ঝাঁপ ফেলে দিল ঘরে। শুয়ে পড়ল কুঁকড়ে। চট এতটুকু ফাঁক করে পথের দিকে চেয়ে রইল। মনের ভেতর যেন নোনা খালের জল বইছে। গরান পাতা খসে খসে পড়ছে সে জলে। ও যেন আজ একটা পাতায় বসতে চাইছে বার বার। কিন্তু যে পাতাটায় বসতে যায়, সেটাই সরে সরে যায়।

কত পাতায় যে বসতে চাইছে ওর মন। শশী ধাড়ার সেই বেরিয়ে যাবার আগেকার উত্তেজিত, আরক্ত মুখ একটা পাতা। সে পাতাটা সরে গেল। বাউলি বাপ বলছে, কানিটুকু খুলিস না মা, তোর কাকা বাঘের মুখ থেকে নিয্যস ফিরবে। সে পাতাটাও সরে গেল। নোনা খালে এত স্রোত। মুর্শিদাবাদে সাঁওতাল দাওয়ালরা ধান কাটবে, ও ছেলেদের নিয়ে পালাতে পালাতে জ্বলন্ত নুড়ো সাঁওতালদের ঝোপড়িতে গুঁজে দিচ্ছে। কিন্তু ছেলেরা যে এখন বলছে, খেতে দেবে, টাকা দেবে, সোমত্তে হতে ফিরে আসব। এই পাতাটা স্রোত উপেক্ষা করে ঘুরে ঘুরে আসছে আর আসছে, আবার চলে যাচ্ছে। ও গালাগালি দিয়ে বলল, ফিরে না এলে মোর গঙ্গা হয় না জানিস, মনে আখিস।

চমকে জেগে উঠল ও। সে কি, সেকথা তো ও বলেনি ছেলেদের ? ও তো বলেছিল, হাংনামা জবর পাকলে পাইলে এস বাপ। অ বাপ, হাংনামায় থেকনি।

ও বলল, অ ফুল্লরা ডিবরিটা জ্বেলে দে।

ফুল্লরা ডিবরি জ্বেলে দিয়ে গেল।

সেই যে শুল ও বিছানা পেতে, আর উঠল না। পরদিন বেলা হল, রোদ উঠল। ফুল্লরা সারারাত ফষ্টিনষ্টি করে গঙ্গা নাইতে যাবার আগে চটটা তুলে বলল, অ মাসি. আজও দেহ সুবিদে নয় না কি ?

তারপর ও নিচু হতেই সব বুঝল।

ফুটপাতের কাঙালীরা, ঠিকে ঝি-রা মাথা নাড়ানাড়ি করল। সিধু বলত মাদার ইণ্ডিয়া। কিন্তু নিজ্জস কেন ভাগ্যিমানী গেরোমানী ঘরের মানুষ ছিল। পড়ল আর নিশ্চুপেমরল নেকড়া-বাঁধা বাঁখারির দিকে শীর্ণ আঙুল ছড়িয়ে, এমন মরা তো ভিখিরি কাঙালী মরে না ? বড়লোকরা এমন হঠাৎ মরে। মাসি বড় ঘরের মেয়ে ছিল।

ওর শবযাত্রায় পুলিস গাড়ি আনল। সরকারী ব্যবস্থায় ওর সৎকার হল। গাড়িতে ডোমরা ওকে তোলার আগে ফুল্লরা আর অন্য কাঙালীরাই ওকে ধরাধরি করে তুলে দিল।

ফুল্লরা বলল, কোতা নে যেয়ে জ্বালাবে হ্যাঁ গো ?

কাঙালীরা বল্ল, কেন শুদোচ্ছিস ?

মাগী অ্যাত গঙ্গা পেতে চেইছিল, ছেলেরা নিঁউদ্দিশ. তা ওরা কি শোঁশানে ওরে গঙ্গা দেবে ?

কাঙালীরা বলল, ধুস, গঙ্গার দেশে হলেই কি সকলে গঙ্গা পায় ?

ফুল্লরার মাসির জন্যে সহসা বড় কষ্ট হল। কাঁদতে গিয়ে ফুল্লরা দেখতে পেল না গাড়িটা চলে যাচ্ছে, মাদার ইণ্ডিয়ার পা দুটো খোলা দরজার ফাঁকে চিতিয়ে আছে, বিনা মৃতাচারে ছাই হবার জন্যে বেওয়ারিশ মড়া হয়ে চলে যাচ্ছে ও। আর মাদার ইণ্ডিয়া দেখতে পেল না ওর শোকে কেমন বিবশ হয়ে কয়েকটি কাঙালী ও এক বহুসেবিকা ফুটপাথে বসে কর্মবিরতি ও অশৌচ পালন করছে।

১। শুক্রবার ৪ঠা জুন পদ্মমণি কলকাতা পৌঁছে যায়। সঙ্গে ছিল ওর বর, দেওর, চার ছেলে, তিন মেয়ে। এতগুলো লোক নিয়ে আজকাল কেউ দিদির বাড়ি এসে ওঠে না, দিদি যে-কালে ঠিকে কাজ করে খায়। কিন্তু পদ্মমণির বর হঠাৎ আবাদের ওপারে বোনের সম্পত্তি পেয়েছে। গাঁ-বসতি তুলে সেখানে চলে যাবার আগে পদ্মমণি জেদ ধরল একবার তারামণিকে দেখতে কলকাতা আসবে। কলকাতা আসা কম খরচান্ত ব্যাপার নয়, এ কথা বলতে গিয়ে ওর বর মুখ শুনল।

আমার ছাগলের দুধ-বেচা টাকায় আসব যাব।

তাই ওর বর কিছুই বলল না। ওর দেওর বলল, এই দিনকালে দশটা মানুষ কোথা গিয়ে ওঠে? কী খাওয়াবে শুনি তোমার দিদি?

পদ্মমণি বলেছিল, সে গম্যি আমার আছে।

পদ্মমণি বালিগঞ্জ স্টেশনে নেমেছিল। সেখান থেকে লেকের রেল-বস্তি অব্দি হেঁটেই এসেছিল। অবিশ্বাস্য, কিন্তু সত্যি কথা হল, পদ্মমণি কলকাতায় কখনো আসেনি। ওর বর বা দেওর এসেছে মাঝে-মধ্যে। কলকাতার পথ ঘাট দেখে ওর ধাঁধা লেগে যাচ্ছিল। দিদিকে মনে হচ্ছিল মহা সুখী, কিন্তু দিদির ঘর-বাসা দেখতেই তারামণির অবস্থা বুঝতে ওর দেরি হল না। তখনি পদ্মমণি বুঝেছিল তারামণির চেয়ে ও অনেক সুখী।

তখনি পদ্মমণি পেটকাপড় থেকে চালের পোঁটলা, গত-সনের জই থেকে এ-সনে ভাঙানো ছাতু নামিয়ে দিয়েছিল দিদিকে। তা ছাড়া মানকচু, তালপাটালি, একটা কুমড়ো। বরের গেঁজে থেকে বের করে এগারোটা টাকা।

এই এত দিতেছিস পদ্ম?

তুই তোকে দিতেছিস বল?

পদ্মমণি আর তারামণি হেসেছিল। তারামণিই বোনের বিয়েটা দিয়েছিল। ঘর-বসত করাবার সময়ে নিবারণের সংসার দেখে বলেছিল, জাজ্জ্বল্য সুখ হবে পদ্ম। যখন হবে, মনে জানবি দিদির জন্যে এত সব হল।

ক-দিন থাকবি, ও পদ্ম?

সোমবার চলে যাব।

সোমবার যাসনি। কিসের মিছিল, কিসের বা হাংনামা হবে।

তবে তার পরদিনকে ?

২। শনিবার, ৫ই জুন তারামণির প্রতিবেশিনীর ভাষায় পদ্মমণির 'অস্তু ঘনাইল, যম আইয়া বল্‌ল ওঠ্‌ ছেম্‌রি চল্‌।'

ট্রেন আসে আর যায়, দেখে-দেখে পদ্মমণির আশ মিটছিল না। সেদিন ট্রেনে আর ট্রাকে বাইরে থেকে লোক আসছিল, পদ্মমণি দেখছিল আর দেখছিল। লাইনের দক্ষিণে তারামণির বাসা। বাসার হাঁড়ি-বাসনও ট্রেন এলে গেলে কাঁপতে থাকে। লাইনের উত্তরে লেক। পদ্মমণির ছেলেরা, বর, দেওর, সবাই স্নান করছিল, হাতে কাপড়-গামছা নিয়ে পদ্মমণি লাইন পেরোতে যাবে, তখনি ট্রেন আসছিল।

সবুজে-ক্রীম রঙে সুন্দর, উদ্ধত, বেগবান ট্রেন। ট্রেন দেখে পদ্মমণি দাঁড়িয়ে পড়ে, কিন্তু মাথায়, তারামণির প্রতিবেশিনীর ভাষায়, 'ঘোর চক্কর লাইগা ছেম্‌রি পড়ল।' প্রতিবেশিনী বয়েসে রাবণের মা নিকষা। সাত ছেলের মা পদ্মকে ও কাল থেকেই 'ছেম্‌রি' বলছিল। ঘুরে পদ্মমণি লাইনের পাশে খোয়ায় কপাল ঠুকে পড়ে ও কপালাস্থিতে বাড়ি খায়। সে আঘাতের ঘা করোটির ভেতর সযত্নে রাখা মস্তিষ্ককে দমকলের ঘণ্টা বাজিয়ে ভয় খাইয়ে দেয়। মহাশিরা ও অন্য রক্তবাহ শিরা ছিঁড়ে মাথার রক্ত-সংবহন ব্যবস্থা বিকল হয়ে যায়। পদ্মমণির মস্তিষ্কের রক্ত-সংবহন ব্যবস্থা এমন ভয় খেয়ে যায়, যে কান দিয়ে নাক দিয়ে বেরিয়ে আসতে থাকে গলগলিয়ে। দুর্ঘটনা ঘটে সকাল ন-টায়।

তারপর ভয়ার্ত বিপন্ন তারামণি আর পদ্মমণির দিশাহারা বর পদ্মমণিকে নিয়ে দক্ষিণের হাসপাতালে যায়, কিন্তু 'এখানে এ-সব কেস ভর্তি হয় না।' তাড়া খেয়ে প্রথমে তারা 'দয়া কর বাবু গো' বলে মাথা কোটাকুটি করে, তারপর পদ্মমণিকে নিয়ে ধর্মপিতাদের হাসপাতালে আনে বেলা তিনটেয়। রাত ন-টায় পদ্মমণি আর পদ্মমণি থাকে না। এইচ. এফ. বয়স ৩৭; হিন্দু ফিমেল: ৩৭ ভর্তি হয়। প্রতিটি ওষুধ ইঞ্জেকশনের জন্যে টাকা চাওয়া হয় ও বলে দেওয়া হয় বেডের টাকা কম করতে হলে সকালে এসে কর্তাদের ধরতে হবে।

৩। রবিবার, ৬ই জুন সকালে এইচ. এফ. ৩৭কে তারপর ফোঁড়াফুঁড়ি খোঁড়াখুঁড়ি চলে ও তারামণি মনিবদের বাড়ি-বাড়ি ঘুরে ওষুধ-ইঞ্জেকশনের টাকা তুলতে থাকে। পদ্মমণির বরকে বুক ও মাথা চাপড়াতে দেখে কর্তৃপক্ষ টাকার অঙ্ক কমিয়ে দেন বেডের। তারামণি ও পদ্মমণির বরের মুখে পদ্মমণির আঘাত লাগার কথা শুনে লেখা হয় এইচ. এফ. ৩৭ অ্যাডমিটেড। এমার্জেন্সি কেস। ট্রেন দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত। 'টেনের গায়ে লাগেনি গো বাবু। শরীলে কোতা কাটেনি ছ্যাকো' —তারামণির বিলাপ শুনে ভর্তি-বাবু কিছুমাত্র বিচলিত হন না। খেঁকিয়ে বলেন,

ট্রেন না এলে মাথা ঘুরে পড়ত কি? কিন্তু তারপরই, তারামণি যখন ফুটপাথে অবসন্ন হয়ে বসে থাকে, তার মিস্তিরি ছেলে বলে, সর্বনাশ করে এলে? মাসি যদি মরে, তবে কি হাংনামা হবে ভেবে দেখেচ? ও কথা কেউ লেখে? বলতে হয় কলার খোসায় পা পিছলে গেছল, নয় তো হোঁচট খেয়ে পড়েছে।

তারামণি সে কথা শুনে হাপসে কাঁদে আর বলে, বুদ্ধি হরে গেল যে ও বাপ! মরবে বলতেছ কেন?

পদ্মমণির বর, 'উ কি বলতেছিস' বলে আরো বিশ্রী ও অসভ্য ভাবে কাঁদে। যেন পদ্মর বোনপো 'মরে' বলেছে বলেই পদ্মমণি মরবে। হাসপাতালের সামনে ফুট-পাথে ও এবং তারামণি দুজনেই কাঁদতে থাকে কপাল চাপড়ে। তারামণির ছেলে ডাক্তারের লেখা কাগজ নিয়ে ওষুধ কিনতে ছোটাছুটি করে। ও বিয়াল্লিশ টাকা যোগাড় করতে পারে না কিছুতে। ওষুধ না নিয়ে হাসপাতালে ফেরা ঠিক হবে কি না ও ভেবে পায় না, ওর বয়েস মাত্রই সতেরো। আবার পায়ে পায়ে ও ডাক্তারের কাছে ফিরে আসে এবং আরেকজন ডাক্তার আরেকটি প্রেসক্রিপশন ওর হাতে ধরিয়ে দেন। এবার ও তেইশ টাকা যোগাড় করে ওষুধ কিনে ফিরে আসে। তারামণি কান্না থামিয়ে পদ্মর বরকে বলে, অ্যাত ট্যাকার ওষুধ দিতেছে। নিশ্চয় ভাল হয়ে যাবে। ওরা দুজনেই ফুটপাথে ছায়া খুঁজে নিয়ে শুয়ে থাকে, শুয়েই থাকে। তারামণির মিস্তিরি ছেলে ওদের কাছে এসে বসে বটে, কিন্তু কথা বলে না।

সময় যায়, সময় যায়, মাঝে-মাঝে পদ্মর বোনপো ভেতর থেকে খবর নিয়ে আসে। এই ভাবেই রাত হয়, রাত ঘনায়।

রাত দেড়টায় পদ্ম মরে যায়। এইচ. এফ. ৩৭ এক্সপায়ার্ড অ্যাট ওআন এ. এম. অফ……। এই সার্টিফিকেটটি পরদিন লেখা হয় ও থানায় পাঠানো হয়।

৪। রবিবার ৬ই জুন, সেই রাতেই পদ্মর বোনপোকে ডাক্তার বলেন, কাল লাশ পেয়ে যাবে। পুলিস কেস হবে না।

কিন্তু সোমবার, ৭-ই জুন জানা যায় ময়না না করে লাশ ছাড়া হবে না। ভোর-বেলাই খবর জানা যায় এবং থানা থেকে খবর না আসা অব্দি কিছুই করা সম্ভব নয় বলে ডাক্তার পদ্মর বোনপোকে তাড়া মারেন।

রাতে যে বলেছিল লাশ পেয়ে যাবে সেও ডাক্তার। এখন যে বলছে লাশ পাবে না সেও ডাক্তার। সন্ধ্যের যে বিয়াল্লিশ টাকার প্রেসক্রিপশন লিখেছিল সেও ডাক্তার, রাতে যে তেইশ টাকার প্রেসক্রিপশন লিখেছিল সেও ডাক্তার। পদ্মর বোনপোর সব দেখে ধাঁধা লেগে যায়। যদিও ও বাবরি ও জুলপি রেখেছে, এবং অত্যন্ত ময়লা গেঞ্জি ঢেকে নকল টেরিলিন পরে আছে, তবুও ভদ্রলোক, বাবু, এদের সমীহ করে

চলা ওর রক্তের অভ্যেস।

একই সঙ্গে, থানা-পুলিসকে ভয় করা আয়ত্ত করা ওর অভ্যেস। এখন ওর মনে পড়ে যায় গোপাল আলুওয়ালা সুবাসীর প্রেমে ব্যর্থ হয়ে ফলিডল খাওয়ার পর লাশ বের করতে, ওর ভাষায়, 'ডমকে' টাকা খাওয়াতে হয়েছিল। বর্তমানে ও টাকাপয়সায় নেহাত কাহিল। মা তারামণিও মনিববাড়িতে এমন কোন গুডউইল তৈরি করতে পারেনি যে ঘুষ দেবার টাকা পেতে পারে। মেসো যথাসর্বস্ব ত্রিশ টাকা বের করে দিয়ে বলে, ঝা পার কর বাপ মোর। তুমি শউরে ছেলে। মোরা গেঁয়ো মুখ্যু। সাঁঝ হবার আগে শ'সই না করলে সব্বনাশ হবে।

সর্বনাশ! তারামণির প্রতিবেশিনী গভীর তৃপ্তিতে টেনে বলে। পদ্মর মৃত্যু-সংবাদ জেনেই ও সকাল-সকাল পদ্মর ছেলেমেয়ে দেওর সবাইকে নিয়ে এসে পড়েছে। তারামণির দেশ-ঘরের যত ঝি আশে-পাশে কাজ করে, সবাই আসে। প্রতিবেশিনী বয়সে নিকষা হয়েছে, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বেশি। তা ছাড়া কালীঘাটে এক ধনী পুরুত-বাড়ির বউরা বুকের গড়ন নষ্ট হবে বলে ছেলেদের দুধ খাওয়াত না। ওর দুধে মানুষ ছেলেরা এখন দলপতি, নেতা, মিসায় আটক, বেনামী শুঁড়িখানার মালিক। অতএব মৃতাশৌচ সংক্রান্ত সব খবরই ও জানে।

ও বলে, সর্বনাশ! দাহ না অইলে ছেম্‌রি তোমার পাছে ফিরব। পোলাপানগো কাছে চাইব। এ কথা শুনে সকলেই কাঁদে। বুক চাপড়ায়। পদ্মর বোনপোকে বলে, বেবস্থা কর বাপ। বোনপো থানায় যায়। মেসো ও মেসোর ভাই থানার বাইরে বসে থাকে। বোনপো ঢুকে যায়।

৫। সোমবার, ৭ই জুন সকালে থানাবাবুর মুখে-চোখে প্রসন্নতা, দয়া, মানবিক বিবেচনা খেলা করতে থাকে কেন না তিনি জানেন, যে-সব কথা দিচ্ছেন, তা তাকে রাখতে হচ্ছে না, অচিরে তাঁর ডিউটি শেষ হবে। আটটার পর থেকে অন্য ডিউটি। আজ সব মন্ত্রী ও মান্য লোকরা মিছিল করে বেরোবেন। সারাদিন কলকাতায় শান্তিপূর্ণ মিছিল চলবে। অতএব সমস্ত পুলিস সকল লাশবওয়া গাড়ি দমকল আজ অর্জুন, মিছিলটি তাদের একাগ্র দৃষ্টি ও মনের সামনে মাছের চোখ।

তিনি আরো জানেন, দুটোর পরে লাশ পৌছলে সরকারি নিয়মে সে লাশ ময়না হয় না, ডাক্তারও মানুষ। শহরের কল্যাণে প্রত্যহই ডাক্তারকে বহু লাশ ময়না করতে হয়। হিম-কুঠরিতে লাশ জমেই থাকে। তিনি জানেন, এইচ এফ. ৩৭ আজ ময়না হতে পারে না। তাই তিনি স্নেহবিগলিত কণ্ঠে পদ্মর বোনপোকে সান্ত্বনা দেন ও আগেই আঁচ করে নেন, এর দ্বারা এ-পকেট ও-পকেট ফুটকিফাটকি সম্ভব নয়। আজকাল এই দরিদ্র দর্শনধারীদের বিশ্বাস করা গোখুরি। এরাই দশজন

ছেলে ও এম. এল. এ.র চিঠি এনে হাজির করতে পারে।

তাই তিনি একেবারে কেতামত কথা বলতে থাকেন, আইন বাঁচিয়ে। এখন আর তেমন সর্বনেশে দিন নেই যে টেবিলের সামনে অচেনা ছেলের ছায়া পড়লে চমকে আঁতকে পকেটে হাত দিতে হবে। সে-সময়ে যুবকদের সঙ্গে মিষ্টি কথা বললে তাতে আন্তরিকতা থাকত না। এখন তাঁর কথাবার্তা কেতামাফিক হলেও আন্তরিক। তিনি মানুষ হিসেবে ভালই। তা ছাড়া, আজকাল, নতুন জ্যোতিষীকে দিয়ে, বিল্ডিং তৈরির সময়কে জন্ম সময় ধরে নিয়ে, এই থানা-বাড়ির কোষ্ঠীপত্র করিয়ে নেবার পর থেকে—এ থানাবাড়ির বৃহস্পতি এখন তুঙ্গী, তা জানার পর থেকে—এখন তিনি থানায় ঢুকলেই বাতাসে, ঘাম-রক্ত-মূত্র-সিগারেটের গন্ধে, পরমা শান্তির ভাসমান অস্তিত্ব টের পান। আশ্চর্য এই অদৃশ্য 'অ্যরা' বৎসলা জননী হয়ে তাঁর অন্তরের অন্তরকে কী যেন মুখে দিয়ে শান্ত করে ফেলে।

মনের ভেতর সেই পরমা শান্তি ফোঁটায় ফোঁটায় উছলে পড়ে। চোখ চাইতেই ধুলোমাখা ফাইলের চারপাশ ও কোনা-কানাচ থেকে লক্ষ্মী, গণেশ, কালীর ছবি দেখতে পান থানাবাবু। তিনি পদ্মর বোনপোকে বলেন, কী বলছ বল?

আজ্ঞা, ময়না না করলে…

তা কি হয় বাবা? ময়না কত্তেই হবে। নয়তো আমাদের মহাবিপদে পড়তে হয়।

ময়না কত্তে টাইন চলে যাবে।

আহা, হাসপাতালের খবর আমরা পেয়ে গেছি। টাইম যাবে কেন? আর গেলেই বা। মরা মানুষ তো ফিরে আসবে না। ব্যস্ত কেন? মঙ্গলবার পেয়ে যাবে।

আজ্ঞা, রবিবার মরেছে, মঙ্গলবার হলে তিনদিন হয়।

তা তো হলই।

অপঘাতে মিত্যু তো। মড়া বাসি হলে দোষ পায়, শাদ্ধ শান্তি তাড়াতাড়ি সারা দরকার।

সি কি! বামুনের মড়া তো নয়!

আমার মেসো হরি সংকাত্তন গায়। উনির সকল কাজ বামুনের নিয়মে।

থানাবাবু বোঝেন এ ছেলেটি নেহাতই বিভ্রান্ত, দিশাহারা। কেমন যেন মনে হয়, এর পেছনে দলবল নেই। বোধহয় ছেলেটা একা। আবার ওঁর মনে দয়া উছলে উঠে আসে। সহৃদয় মমতায় বলেন, দেখ, পুলিস হলে কি হয়। দয়ামায়া এ সব ক্ষেত্রে সবাই করে। হুট করে ময়না সারা কি আমার হাতে? আগে রেল-পুলিসের অনুমতি চাই।

রেলপুলিস কেন?

বা, মড়া তো এখন রেলপুলিসের সম্পত্তি। দেখ, তুমি শেয়ালদা চলে যাও। রেলপুলিসের কাছ থেকে লিখে আন। ইদিকে আমরা হাসপাতালে বলে কয়ে রাখব। তোমার হাতে রেলপুলিসের চিঠি পেলে তবে আমরা সরেজমিন ইংকুয়েস্ট করে লাশ কাঁটাপুকুর পাঠাব।

আজ হবে সব ?

নিশ্চয় নিশ্চয়। দেখো, বিকেলের মধ্যে লাশ ময়না হয়ে পেয়ে গেছ।

পদ্মর বোনপো কাল সকাল থেকে চব্বিশ ঘণ্ট. ঘুরছে আর ঘুরছে। এখন ওর শরীরে ঝিম মেরে আসে, পেটের ভেতর নাড়ীগুলো পাকায়, পেঁচিয়ে ওঠে, জড়ায়, পাক খোলে। এখন একটু ঘুমোতে পারলে শরীর বাঁচত, কিন্তু মেসো ও মেসোর ভাইয়ের অগাধ বিশ্বাসের উক্তি 'তুমি শউরে ছেলে, সব জান,' ওর ওপর যেন আরো গুরুভার দায়িত্ব তুলে দেয়। এইচ. এফ. ৩৭ যেন যাত্রাদলের অধিকারী। ওর ওপর এক বয়স্ক, অভিজ্ঞ, ঝানু, এলেমদার, চালু, হয়কে-নয় করবার ক্ষমতা-সম্পন্ন পুরুষের ভূমিকা সেই অধিকারী চাপিয়ে দিয়েছে। অতএব ও যে ঠিকে ঝিয়ের হতভাগা আধভাতার হাফ-মিস্তিরি ছেলে, সে কথা ভুলে গিয়ে আরোপিত ভূমিকায় কাজ করতে থাকে। মেসোদের বাসায় পাঠিয়ে দেয় ও। বলে, আমি আছি, ভাব কেন ? যেয়ে চান কর, যা হয় খাও।

ও নিজে এক কাপ চা ও দুখানা লেড়ো বিস্কুট খেয়ে নিয়ে শেয়ালদা চলে যায়। কিন্তু প্রথমত ও জায়গাটি চিনতে পারে না। তারপর ট্রেনের পর ট্রেনে শুধু মিছিল-ধারী জনতা আসছে বলে ভিড় ঠেলে ঢুকতেও ওর দেরি হয়। এই সময়েই বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়।

রেলপুলিসের থানাবাবু প্রথমে, 'ক্যা...... ?' বলে হাঁকড়ে ওঠেন, কিন্তু হাঁক-ড়ানির পরিশ্রমে ঘাম গলগলিয়ে বেরোয় বলে পার্বতীর ভূমিকায় তামিল অভিনেত্রীর উত্তুঙ্গ চেহারা-আঁকা ক্যালেণ্ডারের দিকে চেয়ে আবার ঝিমিয়ে পড়েন, ঝিমিয়েই থাকেন। তারপর বলেন, বাতি জ্বলুক, পাখা চলুক, নইলে কাজ করতে পারব না।

পদ্মর বোনপো বলে, থানা থেকে যে পাটিয়ে দিল।

দিক গে। এ কি তাদের মড়া ? আমাদের মড়া, আমাদের সুবিদেয় কাজ হবে। বুঝেছ বাপ ?

মড়া বাসি হচ্ছে বাবু।

যাও যাও, বাইরে যাও।

ছুটোর পরে কাঁটাপুকুরে লাশ নেবে না।

কে বললে ? থানায় বলেছে বুঝি ? কাঁটাপুকুরের টাইম আমায় দেখাচ্ছে।

কাঁটাপুকুরে হপ্তায় কটা লাশ আমি পাঠাই জান? আমাকে কাঁটাপুকুর দেখাতে এসেছ?

বিদ্যুৎ সরবরাহ চালু হয় একটায়। দেড়টায় ছেলেটি একখানা কাগজ পায়: ময়নার পরই এইচ. এফ. ৩৭-এর লাশ আত্মীয় বৈরাগীচরণ নাইয়াকে দেওয়া যেতে পারে। মে বি হ্যান্ডেড ওভার……

আড়াইটেয় ছেলেটি থানায় গিয়ে কাগজটি দেয়। ডিউটি-বদলি অন্য থানাবাবু, থানার সকলে এখন বেজায় ব্যস্ত। শান্তিপূর্ণ মিছিল শুরু হয়ে গেছে। এখন সকলের মন-প্রাণ-কান-চোখ অর্জুন। মিছিলের খবর মীনচক্ষু। থানাবাবু বলেন, কাগজ এনেছ, রেখে যাও। মঙ্গলবার খোঁজ করবে।

ছেলেটি বোঝে এইচ. এফ. ৩৭ আরোপিত ভূমিকার প্রতি সে সুবিচার করতে পারল না। সহসা কেঁদে ফেলে ও। সতেরো বছরের বয়ঃসন্ধি পেরনো, চোয়াড়ে চেহারার ছেলেটিকে কাঁদবার সময়ে ভারি বিশ্রী দেখায়।

থানাবাবু 'ল্লে বাবাঃ' বলে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসেন।

বলেন, দেখ! হবার কিছু নেই। তবে হ্যাঁ, এক কত্তে পার।

কি কাজ?

আলিপুরে পুলিস কেস হাসপাতালে যেয়ে ডাক্তারবাবুর হাত পা ধরে ঝুলে পড়। এখন ময়না হয় না। তবে যদি উনি রাজী হন, তবে আমরা লাশ কাঁটা-পুকুরে কাল সকাল নটার মধ্যে পাঠাব।

আজ্ঞা, আজ হয় না?

না না, আমাদের লোক যাবে, সরেজমিনে ইংকুয়েস্ট করবে, তবে তো!

সকালে বাবু বললেন…

যাও, যাও, মেলা দেরি কর না। আর দেখ, ডাক্তার কি বলেন, এখানে বলে যেও। তোমাদের কি! যত…

ছেলেটি এখন বোঝে, তিনটে বাজতে চলল, আলিপুরে ওকে হেঁটেই যেতে হবে। এক-ফেরতা হেঁটে গেলে ফিরে-ফেরতা ও বাসে ফিরতে পারবে। দুবারের ভাড়া দিলে কুলবে না। তাই ও প্রখর রোদে, গলন্ত পিচে সস্তার হাওয়াই চটি ছটকে চলতে থাকে। ওর মাথা ও শরীর দিয়ে বিদ্যুৎ-সরবরাহ কখনো আসে, কখনো মস্তিষ্কে লোডশেডিং হয় ঘন-ঘন। কাল থেকে পেটে দানা নেই, কয়েকবার চা ও লেড়ো বিস্কুট খেয়েছে শুধু, কিন্তু কিছুতেই ও এখন বেরতে পারে না। চক্র-ব্যূহে ধৃত। ওকে ভেতরে ঢুকতেই হয়, ঢুকে চলতেই হয়।

পুলিস-কেস হাসপাতালে ও ডাক্তারকে প্রথম দেখতেই পায় না। ময়লা, ধুলো-

ওড়া বারান্দায় কজন তাস পেটে। চারদিকে আবর্জনা। কিন্তু সমানে কেস আসতে থাকে, মাথা ফাটা, হাত ভাঙা, পাঁজরে চোট। 'এত কেস কিসের,' বলতে গিয়ে ও ধমক খায়। থামে ঠেস দিয়ে চেয়ে থাকে, এবং গোপাল আলুওয়ালার মৃত্যুজনিত ব্যাপারে সাক্ষাৎকার হয়েছিল বলে ডাক্তারের চেহারা চেনা আছে এই ভরসায় ঘন ঘন চারদিকে চাইতে থাকে। ডাক্তারকে দেখেই ও গিয়ে সামনে বসে পড়ে ও কাতরে বলতে থাকে, বাবু! ডাক্তারবাবু!

ময়না-পার্টির লোকজন দেখে-দেখে ডাক্তারবাবু মানুষের কাছে আর মানুষী ব্যবহার আশা করেন না। ছেলেটিকে তিনি কাঁদতে দেন। তারপর ওর প্রার্থনা শুনতে থাকেন। সব শুনে এখন ধীরে, শিশু ভুলিয়ে বলেন, এখন ময়না করতে হলে, ডোমদের তো ছুটি, বুঝলে কি না, ডোমদের খবর দিতে হবে, মদ খেতে পঞ্চাশ টাকা!

গোপালের বেলা ডমদেরকে পনেরো টাকা দিছ্লাম আমরা!

সে কবে?

বচর ঘুরে গেছে।

এখন কি আর তাতে ওরা মানবে? গরিবকে টাকা ধসাব মিছেমিছি, সে আমার পছন্দ নয়। এখন দাহ আছে, শ্রাদ্ধশান্তি আছে। দেখ! থানায় বল গে! লাশ যেন পৌঁছে যায়। মঙ্গলবার দিনকে আমি আদালত থেকে আসতে বেলা একটা বাজবে। সে সময়ে তুমি এখানে থেক। তখন আমি যাব। বরঞ্চ, দুটোর মধ্যে, সবচে আগে তোমাদের লাশ ময়না করে দেব। যাতে করে সাঁঝের মধ্যে সব সেরে আসতে পার।

অপঘাত মিত্যু কি না!

এর আগে হয় না।

ডোম যদি রাজি হয়?

দেখ! টাকা যদি যোগাড় হয়, সন্ধ্যের আগে আমায় কাঁটাপুকুরে যেয়ে জানিও। ডোমদের বলতে তো হবে।

ছেলেটি এখন থানায় ফেরে। ফিরতে ফিরতে পাঁচটা বাজে। ওর কথা শুনে থানাবাবু বলেন, কাল নটার মধ্যে লাশ পেলে ডাক্তার ময়না করবে? বেশ! ও জিতেন! জিতেন!

একটি শক্ত-সমর্থ, আত্মস্থ চেহারার যুবক এসে দাঁড়ায়। ঘামে ঘন নীল জামা গায়ে সেঁটে আছে, চোখ রক্তাভ, দৃষ্টি উদ্ধত।

কী বলছেন?

কাল সকালে ছুটো, না, তিনটে লাশ আনতে হবে।

হবে না।

কেন ?

ডাক্তার ময়না করবে না।

করবেন বাবু, বলেছেন করবেন।

আজ এতক্ষণ অব্দি লাশ-বওয়া ভ্যান ওদিকে আটকা ছিল। আমারও কাল ডিউটি নেই।

থানাবাবু কী যেন ওকে বলতে থাকেন, জিতেনকে। ছেলেটির আচ্ছন্ন চেতনা ও শ্রবণে রেলবস্তি……"—"র এলাকা……"—" মিস্ত্রির আজ নয় মিছিলে ব্যস্ত আছে, কাল…সেবার সেপ্টেম্বরে…শব্দগুলি লুকোচুরি খেলতে থাকে। হঠাৎ জিতেন বলে, ঠিক আছে যাব, কাল কাঁটাপুকুরে লাশ চলে যাবে। কিন্তু তিনটে কিসের ?

এদের কেসটা রেলপুলিসের, একটা জলে-ডোবা, সেই পচা-চোলাইয়ের লাশটা, তেনটেই তো হল।

জিতেন বলে, লাশ যাবে, ও হাসপাতালে ঠাণ্ডাঘরে ছিল, ভাল থাকত। যদি কাল না হয়, মড়ার গাদার মধ্যে কাঁটাপুকুরে, ইঁদুরে চোখ খুবলে খেয়ে নেবে তা জান ?

না বাবু। তা যদি হয়……

পরে মড়া গেলেই ভাল ছিল, এই তো ? না, জিতেন দোলুইয়ের এক জবান ? কালই যাবে লাশ।

ছেলেটি থানা থেকে বেরোয় ছ-টার পর। এখন ও সাদার্ণ অ্যাভিন্যুর সুখ-বিলসিত, আলুলায়িত, সুখী ও সুন্দর জনতার জন্যে উৎসর্গীকৃত বুক ধরে চলতে থাকে। এখন গিয়ে ভাঁটিখানায় পাড়ার হর্তা-কর্তা-পাতা ও ত্রাতার কাছে ধর্না দিয়ে এইচ এফ. ৩৭ যাতে নিঃসম্বলে ভিখিরির মতো নিখরচায় দাহ হতে পারে, ঘাটবাবুর নামে একখানা সুপারিশ চিঠি নেবে।

বাড়ি ফিরবার আগে অবধি ওর ধারণা থাকে, ও চক্রব্যূহের ভেতর আছে, এবং একটি ট্রেন—হাসপাতালের সারি-সারি ডাক্তার—থানাবাবুরা—রেলপুলিস—ময়নাডাক্তার—জিতেন দোলুই, এরাই কৌরব।

বাড়ি ফিরে বোঝে, কৌরবদের দলবদ্ধতা অতি পাকা বনেদে বাঁধা। কেন না ও যখন বলে, মঙ্গলবারের আগে হচ্ছে না—তখনি সবাই হাউমাউ করে ওঠে।

তারামণির প্রতিবেশিনী বলে, তয় না তর এত চিনা, এত জানা ? মরছে

রবিবারে, সৎকার হইতে মঙ্গলবার ?

ছেলেটির মা, মেসো, মেসোর ভাই, সবাই ওকে ক্ষমাহীন নিষ্ঠুরতায় আক্রমণ করে। ছেলেটি অবসন্ন ক্লান্তিতে রাগবার শক্তিও খুঁজে পায় না। আজ মিছিল ছিল বলে ভ্যান ছিল আটকা। রেলপুলিসের কাছেও দেরি হল। এ-সব কথা বলতে তার রুচি হয় না। এইচ. এফ. ৩৭ তাকে যে ভীষণ ভূমিকায় প্রতিষ্ঠা করেছে, ছেলেটি বোঝে, এরা ভাবছে ও সে-ভূমিকার দায়িত্ব পালনে ফেল করেছে। ছেলেটিও সারাদিনে ভেবেছে ও ফেল করেছে। কিন্তু এখন ও, এই শোকাহত, মূঢ়, নির্বোধ, প্রেতভীত মানুষগুলির দিকে চেয়ে বোঝে, না, ও সে-ভূমিকার দায়িত্ব যথাযথ পালন করেছে। ও যা করেছে, তা কর্মবীরের যোগ্য কাজ। যত পথ হেঁটেছে, যত দরবার করেছে, যত দরজায় ঘা মেরেছে, তা সামান্য মানুষ পারে না। এখন ওর ক্ষুধার্ত, আচ্ছন্ন, অবসন্ন চেতনায় মনে হয়, এইচ. এফ. ৩৭ বুঝি বা সর্বশক্তিমান। ওকে দিয়ে এত সব কাজ করিয়ে নিল। ওর খুব মনে হয়, মা অন্তত কিছু খা, হাতে-মুখে জল দে, বলতে পারত। কিন্তু মা কিছু বলে না। মনে হয়, চিরকাল মা, ও যা-যা পারেনি তা নিয়ে অন্ধ আক্রোশে ওকে বেঁধে। ও কিন্তু তার-পরও মা বলে, বোন বলে, টাকাকড়ি সর্বস্ব এনে-এনে দেয়। এ জন্মে ওর এই একতরফা ভূমিকা। কিছু না বলে ও উঠে পড়ে। 'সী ত্থাট এইচ এফ. ৩৭ হ্যাজ এ পপার'স ফিউন্যেরাল' লেখা কাগজটি বের করতেই হবে। কাল দাহ সেরে ঘুমনো যাবে।

কোতা যাস, ট্যাকা দে ঝা!

তারামণি চেঁচিয়ে বলে। ছেলেটির সহসা মনে পড়ে, এত হেঁটে বেড়াল, কই, মেসোর দেওয়া তিরিশ টাকা ওর শার্টের ভেতর পকেটে পলিথিনের ঠোঙায় মুড়ে সেপটিপিনে যেমন আঁটা রয়ে গেল, মনে পড়েনি তো ?

ও বলে, টাকা থাক, মঙ্গলবার খাটিয়া কেনা আছে।

দে ঝা!

ও নীরবে টাকা বের করে দেয় ও এক গেলাস জল গড়িয়ে খেয়ে বেরিয়ে যায়। বোন চেঁচিয়ে বলে, মিস্তিরি নোক পাট্যেছিল দাদা! কেন আসনি শুধোচ্ছিল।

ছেলেটি কোন উত্তর করে না।

৬। সোমবার ৭ই জুনের মধ্যে পদ্মমণি, তারামণির গাঁ-জ্ঞেয়াতি আরো পাঁচ-জনা এসে পড়ে। বহুজনের কথায়, আলোচনায় বাদ-প্রতিবাদে ক্রমে ছেলেটির বিষয়ে গভীর অবিশ্বাস রচিত হয়। মেসোর ভাই বলে, ঝা করছে সকল একা। মোদের কিছু বলে নে কেন ?

তারামণি বলে, চেরকাল একোরকম অইল।

মেসো বলে, ডাক্তার বলেছে বেলা এট্টায় যাবে, তা কি হয়? এট্টায় যাবে? তকন গেলে অতগুলোন লাশের চেরাই ফাড়াই হয়?

তারামণির প্রতিবেশিনী বলে, তা কি অয়? বাবা, লাশঘরের নিয়ম, বাতি জ্বললে লাশ কাটব না। সূর্য থাকতে রইতে হকল সারা চাই। অহন একটা কইছে, না আটটা, কে কইব? আমি কই, তোমরা বিয়ান অইতে গিয়া বইয়া আহ। ছেম্‌রার কথায় বিশ্বাস কী?

সোমবার ৭-ই জুন, ছেলেটি নিখরচায় দাহ করবার সুপারিশ চিঠি যোগাড়ে আরো বহু পথ হাঁটে ও শেষে যোগাড় করে।

৭। মঙ্গলবার ৮ই জুন, ভোর না হতে পদ্মর বর, দেওর, বড়-মেজ দুই ছেলে, জ্ঞাতিগুষ্ঠী, তারামণি, তার প্রতিবেশিনী, সবাই গিয়ে কাঁটাপুকুরে বসে থাকে। ছেলেটি ওদের নিরস্ত করতে পারে না, ও এক সময়ে রেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে লেকের ধারে গাছের নিচে পড়ে ঘুমোয়। ওর ওপর পুষ্পিত বকুল পুষ্পবর্ষণ করে, ও গগন-বিহারী চিল সপ্রেমে চাইতে থাকে, জলগন্ধী বাতাস ওর কপাল ছুঁয়ে-ছুঁয়ে যায়।

বারোটায় উঠে পড়ে, লেকের জলে চোখমুখ ধুয়ে, প্যান্টের ওপর গামছা বেঁধে ও হাসপাতাল যায়। ডাক্তার একটার বদলে সাড়ে তিনটেয় আসেন। তারপর কাঁটাপুকুর। এইচ. এফ. ৩৭-এর লাশই প্রথমে বেরায়। 'উইদিন সানসেট!' ডাক্তার ব্যক্তিনিরপেক্ষে নিরুদ্দেশকে ঘোষণা করেন। তারপর ঢুকে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দেন। দরজার ফোকর দিয়ে না দেখে ছেলেটির বিফল যুধ্যমান কর্ণের মতো অস্তমান সূর্যকে লক্ষ্য করা উচিত, তবু ও দেখতে থাকে। এইচ. এফ. ৩৭-এর লাশের চেহারা বড় সুন্দর মনে হয়। সুন্দর মনে হয়। শুধু পায়ের নিচে যেন সাদা চুনের ডোরা-কাটা।

লাশ হাতে পেলে বোঝা যায় পিঁপড়ে চোখ খায়নি, কিন্তু লাশঘরের ইঁদুর স্বাধিকারবলে পায়ের নিচের মাংস সযত্নে কুরে খেয়ে অস্থিজাল উদলা করে রেখে গেছে। লাশ খাটিয়ায় তোলা হয়।

এইচ. এফ. ৩৭-এর লাশ অবশেষে নিখরচায় বিদ্যুৎ-চুল্লিতে ঢুকে যায়। ছেলেটি এখন উত্তরে হাঁটে কার্তিক-ঘাটের কোনো পুরুত, দাহ হতেই অপঘাত মৃত্যুর প্রায়শ্চিত্ত-শ্রাদ্ধ সেরে দেবে। দর কষতে হবে।

সব সেরে ফিরতে রাত দশটা বাজে।

বুধবার, ৯ই জুন স্বর্ণাভ প্রত্যুষে পদ্মর বর, দেওর, সবাই দেশমুখো ট্রেনে চাপে। একটু বেলায় কাজে গিয়ে ছেলেটি জানে বিনানোটিশে কামাই করার জন্যে ও বরখাস্ত হয়েছে।

১৩৮৩

সকাল বেলা ভগীরথ ঘুম থেকে উঠে মুখহাত ধোয়, ঠাকুমাকে তোলে ও হাতমুখ ধোয়ায়। আজও সে সবই করেছিল। সে নিজে বাসি রুটি খায় ও ঠাকুমাকে পান্টিভাত চটকে দেয়, আজও দিয়েছিল। ঠাকুমার শরীরে জরা যত, রোগ তত। এবার গরম পড়ে থেকে ঠাকুমার গা চুলকে চুলকে ঘা হয়ে গেল। ঘা শুকোতে চায় না। পাড়ার সেবা-ক্লিনিকের ডাক্তার বললেন, ভিখিরির শরীর, রোগ বাধিয়েছ রাজার।

কি হয়েছে ঠাগমার?

ডায়াবেটিস। তাতেই ঘা শুকোচ্ছে না। আলু দেবে না, ভাত দেবে না। এই বড়ি তিনবার খাবে। চিনি গুড় মোটে দেবে না। দেখবে, যেন তেমন কেটে ফুটে না যায়। তাহলে আর রক্ত বন্ধ হবে না।

ভগীরথ ভেবে পায় না কি দিয়ে কি করবে। ডাক্তার যা বলে যান কিছুই ওর মাথায় ঢোকে না এবং রিকশা করে ঠাকুমাকে বাড়ি আনার সময়ে ঠাকুমার পিচুটি-পড়া চোখ, ঘোলাটে দৃষ্টি, শীর্ণ ও কোঁচকানো মুখ দেখে ওর অত্যন্ত মায়া হয়। সেইজন্যে ও ঠাকুমাকে একটি বারখণ্ডি কিনে দেয় অসীম ভালবেসে, বলে, চুষতে থাক।

বাড়ি এসে সে ডাক্তারের কথা অবিলম্বে ভুলে যায় ও সযত্নে চটকে চটকে সকালে পান্টিভাত, দুপুরে গরম ভাত ঠাকুমাকে খাওয়ায়। রাতে ঠাকুমা দুটো খই জলে চটকে চিনি বা গুড় দিয়ে খায়। বালিগঞ্জ স্টেশন ও কসবার মধ্যে রিকশা চালকদের নেতা কৈলাসও বলল, তু ছেড়ে দে ডাক্তারের কতা। ডাইবেটিস! উ রোগ কোন-দিন গরিবের হয়নি, হবে না। আমার ভাই হাসপাতালে ক্যান্টিঙে কাজ করে। কোন অসুক বড়লোকের হয়, কোন অসুক গরিবের, সে সব জানে।

ভগীরথের বয়স মাত্রই সতেরো। স্টেশনে ও ট্রেনে ধূপকাঠি বেচে সে নিজের ও ঠাকুমার অন্ন সংস্থান করে। মা থাকতে তাকে খুব আড়াল করে রেখেছিল। ঠিকে ঝি খেটে খেটে মোক্ষদা বিধাতার মতো ক্ষমতায় রেলবস্তিতে ঘর রেখেছিল, সোমসারটা বেঁদে তুলব এই আশায় বাসন কিনেছিল সস্তার আলুমিনির, বেলনা-চাকি ও কেটলি কিনেছিল। বাসন বলে ভগীরথের ঠাকুমার বড় হুতাশ ছিল। দোরজে-ইতুথালির সংসার, ভগীরথের ভাগচাষী বাপ ও কাকা চোখ বুজতেই

উচ্ছন্নে যায়। বুড়ির চোখও তখনি যায় মায়ের দয়ায়। বাসনকোসন বলতে যা চাটিমাটি ছিল সব বেচেবুচে মোক্ষদা চার বছরের ভগীরথ আর কানা শাশুড়িকে নিয়ে চলে আসে।

মোক্ষদা মরে গেছে গত বছর। ঠাকুমার সব বিভ্রম! অ মুকি, অ পোড়ামুকি, ভাত দিলি না? জল দিলি না? সে নিয়ত বকে, ভগীরথকে মনে করে ভগীরথের বাপ, এবং সমানে বলে, সকল বাসন হয়েচে তা ভাতের হাঁড়ি আলুমিনির হয়নে এট্টা? লোহার কডাতে ভাত কে কবে রেঁদে খায় মা?

ভগীরথ এখন দোরজে-ইতুথালি, মা, সাঁপুলি বংশ বলতে ওই ঠাকুমাকেই বোঝে। অসীম মমতায় ও ঠাকুমাকে আঁকড়ে ধরে থাকে, এবং ডাক্তার কি বলেছিল তা বেবাক বিস্মরণ হয়ে সকালে পন্টিভাত চটকে খাইয়ে হাতের কাছে জলের ঘটি দিয়ে দাওয়ায় ঠাকুমাকে বসিয়ে রেখে বেরিয়ে যায়। ধূপকাঠি আগেও মা থাকতে দিনভোর বেচেছে। এখন বারোটা বাজতেই ও ঘরে ফেরে। ঠাকুমার ভাত বলে বড আকাঙ্ক্ষা।

আজও ও ঘরে ফেরে এবং ঘরের কাছে ভিড় দেখে বড়ই অবাক হয়। ওকে আসতে দেখে কৈলাস সচকিত হয় ও সকলের মুখ চাওয়াচাওয়ি দেখে ভগীরথ বোঝে ঠাকুমার কিছু হয়েছে। মধু ফলঅলা বলে, ওকে দেকিও না।

'দেকিও না' কথাটি বড় ভয়-খাওয়ানো। মা মরে যাবার সময়ে বলেছিল, অ মাসি, দাঁত ছরকুটে মরলে ছেলেকে মুক দেকিও না—কিন্তু বাড়িউলি বলেছিল, তা বলিসনি মুকি। মুয়ে আগুন দেবে ছেলে, নইলে মায়া কাটে? মা চলে যাচ্ছে তা মুক দেকবে না?

ক্লান্ত ও ঘর্মাক্ত ভগীরথ, 'ঠাগ্‌মা গো!'—বলে বিকট ও বিচ্ছিরি ভাবে কেঁদে ওঠে। তখন কৈলাস বলে, আচে রে আচে। দাওয়া থে' পড়ে গেচে মুখ থুবড়ে। খোয়াতে কেটেকুটে একশা হয়েছে। তো আইডিন এনে দিনু, তবু রক্ত বন্ধ হচ্ছে না। গৌর বললে, রক্ত বন্ধ হবে না।

ভগীরথ ডাক্তারের কথা স্মরণ করে ও বলে, কি হবে কৈলেসদাদা?

গৌর কম্পাউণ্ডারি পড়েছে। সে বলে, ডায়াবেটিসে রক্ত বন্ধ হয়? হাসপাতালে নে যা।

ভগীরথ দেখে ঠাকুমার মাথা, কপাল, হাত ও শুষ্ক স্তনের ওপরে রক্ত। চারদিকে প্রচুর রক্ত দেখে ওর মাথা ঘোরে। আচ্ছন্নের মতো ও ধূপের থলে নামিয়ে রাখে, 'অ ঠাগ্‌মা অ ঠাগ্‌মা'—বলে ডাকে।

মধু ও কৈলাস প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখায়। সাধারণত তারা মস্তানি করে ও

গলায় রঙিন রুমাল বেঁধে স্টেশনে চক্কর দিতে ভালবাসে। আবার আপদে-বিপদে বুদ্ধি দিতে, রাতেভিতে মড়া পোড়াতে, শীতলাপুজোর ভার নিতে ওরাই কাঁধ দেয়। মধু ও কৈলাস ভগীরথকে খানিক স্নেহের চোখেও দেখে। ছেলেটা ভীরু, নিরীহ, মায়ের ছেলে, ঠাকুমার নাতি। বুড়ো ঠাকুমাকে টানে বলে ভগীরথ ওদের ছিন্নমূল মানসে খানিকটা শ্রদ্ধাও পায়। যেমনটি হলে সংসার থাকে, সেই প্রাচীন মূল্যবোধ ওরা জীবনে অভ্যাস করে না বটে, কিন্তু যে করে তাকে মূল্য দেয়। যে জন্যে ওরা নিম্নমধ্যবিত্ত খেটে-খাওয়া মেয়ে হিমানীকে আওয়াজ দেয় না। এখন মধু ও কৈলাস বলে, চ ভগীরথ, হাসপাতালে নে যাই।

নিকটতম হাসপাতালও দূরে। ট্যাক্সিতে ঠাকুমাকে উঠিয়ে ভগীরথ কোলে নিয়ে বসে ও অঝোরে কাঁদে। মধু ও কৈলাসকে বলে, টাকা পয়সা নি যে মোটে, অ কৈলাসদাদা। মধু ও কৈলাস বলে, সে জন্যে ভাবিসনি। সব হয়ে যাবে।— তারাও এখন পরিস্থিতিটির গুরুভার অনুভব করে। 'রবি' ও 'ডোরা' লেখা রঙিন গেঞ্জির নিচে হৃৎপিণ্ডে অচেনা অনুভূতি হয় ও আন্তরিক মমতায় মধু বলে, সে তুই ভাবিসনি। যা করে হোক হয়ে যাবে 'খুনি।

হাসপাতালে পৌঁছে ভগীরথেরা প্রথমে ঠাকুমাকে নামাতে লোক পায় না। নিজেরা কোনোমতে ধরাধরি করে নিয়ে আসে। ডাক্তার তখন জনৈক ছেলের মাকে, 'ছেলে দশপয়সা গিলল, তুমি কি মজা দেখছিলে বাছা?'—বলে ছেলের গলা থেকে পয়সা বের করতে প্রয়োজনীয় সময় নেন। তারপর এসে ভগীরথের ঠাকুমাকে দেখে ধরে তোলান ও দেখে বলেন, এঃ! রক্ত পড়ে পড়েই যে শেষ হয়ে এসেছে!

ভগীরথদের উনি বের করে দেন ও ঘণ্টাখানেক বাদে এসে বলেন, হয়ে গেছে।

ভগীরথ হো হো করে কাঁদে বলে উনি মধুকেই মস্তান ঠাউরে বলেন, কে হয়?

আমাদের কেউ না, ওর ঠাগ্‌মা।

কাল বডি নিও।

কেন? ছেড়ে দেন, নিয়ে যাই।

না। আনন্যাচারেল, মানে অস্বাভাবিক মৃত্যু। বডি ময়না হবে, তবে পাচ্ছ।

অস্বাভাবিক কিসে?

ডাক্তার লক্ষ্য করেন, মধু তাঁকে বাবু—ডাক্তারবাবু—স্যার কিছুই বলছে না। তাতে তাঁর নিজেকে অকিঞ্চিৎকর মনে হয় ও সময়কে মনে মনে গাল পাড়েন। সময়ই সকল হেরোফেরোকে মস্তান-মেজাজী বানিয়ে ছেড়েছে বই তো নয়। তিনি

বলেন, স্বাভাবিক কিসে? অ্যাঁ? সর্বাঙ্গে ইনজুরি, রক্ত পড়ে গঙ্গা হয়েছে, ইনসিশান যত, ল্যাসেরেশান তত, ভীষণ আঘাত না পেলে এভাবে মরে?

পড়ে গিইছিল আজ্ঞা, রক্ত বন্ধ হয়ে নে—রোগ হয়ে যেয়েছিল—ডাইবিটিস।—ভগীরথ বলে।

না না, আমরা ওসব শুনি না। হাসপাতালে আনলে কেন বাপু? শেষ করে এনিছিলে—ফেলে রাখলে বাড়িতেই মরত—তখন যাকে হয় দিয়ে সার্টিফিকেট লেখালেই পারতে। হাসপাতালে এনেছ, হাসপাতালের ঘাড়ে দোষ চাপাবে বলে। তোমাদের চেনা আছে আমার। যাও যাও। এখন থানায় খবর যাবে। লাশ চেরাই-ফাড়াই হবে, তারপর মর্গ থেকে লাশ পাবে। এ আমরা দায়িত্ব নিতে পারি না।

ভগীরথ এখন, ঠাগ্‌মা গো, তোমাকে মেরে ফেললাম গো! কেন বা দাওয়ার ধারে বইসে গেলাম!—বলে কেঁদে ওঠে। ডাক্তার বলেন, এই তো ঝেড়ে কাসছ বাপু!

মধু ও কৈলাস পরস্পরের দিকে চায় ও বোঝে, জল বেকায়দা ঘোলা হচ্ছে। তারা বলে, সাটটিফিকেট লিখে দিন বাবু, নে চলে যাই।

না না, নাম-ঠিকানা বল, সব খবর যাবে থানায়।

আরেকজন ডাক্তার বলেন, কি যে বলেন কালুদা! আর আসে ওরা! ও দেখবেন পুলিস-মর্গে পচবে, তারপর—মনে নেই, সে রিকশাঅলার কেসটা? মরে গেলেই পেছন ফেরে। তখন কার লাশ কে জানায়! মানুষের আর মনুষ্যত্ব আছে?

ভগীরথদের ডাক্তার ডিসমিস করে দেন। ঠাকুমার শরীরের ক্ষতচিহ্ন দেখে ডাক্তারের সন্দেহ ক্রমে ঘন হয়, এতে গণ্ডগোল আছে। ইট ও খোয়াতে আছড়ে পড়ে এ রকম ক্ষত হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু স্বাভাবিক বলে যা মনে হয়, তাকে স্বাভাবিক বলে ঘোষণা করলে ভিখিরিরও ওয়ারিশন জোটে আজকাল, এবং লাশ ময়না করা হয়নি কেন, বলে হাঙ্গামা তোলে। সন্দেহজনক মৃত্যুর ক্ষেত্রে কি করণীয় তা আজকাল পথের পটলি-পটলাও জানে। গত ক-বছরে অস্বাভাবিক মৃত্যুর হার অসম্ভব বৃদ্ধি পাওয়াতে মানুষের কিচলে বুদ্ধির গোড়ায় প্রচুর সার ও জল পড়েছে। ডাক্তার অবশেষে ভেবে পান না কি করবেন, পুলিসে রেফার করেন ও থানাবাবু হাঁকড়ে ওঠেন, পথের রিফর‍্যাফ! ওদের কি ঠিকানা আছে যে পুলিস কেস করবে? আপনি লিখুন, ডায়েড অফ মাল্‌টিপ্‌ল ইনজুরিস। আমরা ওটা কিল্‌ড বাই আননোন অ্যাসাইলান্টস্‌ করে দেব। এখন আর রিস্ক নেওয়া যায় না।

অবশেষে তাই সাব্যস্ত হয় ও ভগীরথের ঠাকুমা 'অজানা আততায়ী'র হাতে নিহত হবার গৌরব অর্জন করে ন্যাংটো হয়ে হিমঘরের তক্তায় ঢুকে যায় এবং লেবেল আঁটা হয়ে পড়ে থাকে।

ভগীরথ, মধু ও কৈলাসের কখনোই মনে এ বিপদ চমকায় না, যে ঠাকুমার মৃতদেহ উত্তরোত্তর গৌরব পাচ্ছে। তারা যথাসময়ে থানায় ধন্না দিয়ে থানাবাবুর হুড়কো খায়। ঠাকুমা নিহত, এ কথা শুনে তারা চমকায় এবং থানার জাদুশক্তি এমনই, যে সার সার ফাইলে ভারি ধলিধূসর শেলফ্ দেখে। সকল অস্বাভাবিক মৃত্যু বিষয়ে থানাবাবুর অগাধ অভিজ্ঞতাজনিত কথাবার্তা শুনে তারা তিনজনেই ঘাবড়ায় ও তাদের বোধবুদ্ধি লোপ পায়। তিনজনেরই মনে হয়, তবে বুঝি নিহতই হবে ঠাকুমা, মৃত নয়।

মধু বলতে যায়, কে মারবে, কেন মারবে সার ? সাতকুলে কেউ নেই, সংসারে ফুটো পয়সা রেখে যায়নি। এই কাঁচ ছেলে টেরেনে ধূপকাটি বেচে কানীকে খাওয়াত।

থানাবাবু সাধারণত অদৃশ্য হুড়কোর ঠেলায় কাজ করে থাকেন। আনকোরা ও অনভিজ্ঞ গেঁয়ো মানুষ হাতে পেলে তবেই একমাত্র তিনি জ্ঞান দেবার সুযোগ পান অবরে-সবরে। এখন তিনি এমন মধুর ও বিবেচক মুখে হাসেন, যেন সক্রেটিস কোনো ন্যাংটো পুঁটে শিশুকে ধৈর্যসহকারে বোঝাচ্ছেন।

তিনি বলেন, দেখ বাপু, কে কাকে মারে, কেন মারে তা যদি বোঝা যেত, মানে আমি বুঝতাম, তাহলে তো ইষ্টিলাভ হত। যার ট্যাঁকে কিছু নেই তেমন ভিখিরিও খুন হয়।

আজ্ঞে—

ভগীরথ বলতে চায়, ঠাগ্মা নিঠুসী নিশকুড়ী ছিল বাবু ! কিন্তু ঠাগ্মা বলতেই তার কান্না পায়। না-কিশোর না-যুবক ভগীরথের চোয়াড়ে ও অনাহারশীর্ণ মুখটি বড় বিশ্রি দেখায়। থানাবাবু বলেন, তোমরা বলচ গোপালীবালা সাঁপুলি পড়ে গেছল ?

আজ্ঞা।

কি করে বলছ ? পড়ে যেতে দেখেছ কেউ ?

না।

কে কোথায় ছিলে ?

আমি রিক্শা নিয়ে দাঁইড়ে ছিলাম, মধু শোসা বেচছিল, বুড়ির নাতি টেরেনে ধূপকাঠি বেচছিল।

কেউই অকুস্থলে ছিলে না ?

না বাবু।

কেউ স্বচক্ষে দেখনি, বুড়ি পড়ল।

না বাবু।

তাহলে যদি বলি, কেউ যা চক্ষে দেখনি, তা ঘটেনি—এমন কথা কি হল : করে বলতে পার ?

না বাবু।

তবে আর মিছে হাঙ্গামায় জড়াচ্ছ কেন ? ইন্‌জুরিগুলো সন্দেহজনক। তোমরা এসে দেখলে কি ?

ঠাগ্‌মা পড়ে আচে।

কিছু বলল ?

রা কাড়েনি বাবু।

তাইলে দেখ, বুড়ি বলেনি আমায় মেরেছে, বলেনি আমায় মারেনি। এক্ষেত্রে যদি লিখি, উটকো অজানা লোকের হাতে মরেছে, দোষ হয় কিছু ?

আজ্ঞা, পড়ে গেল টাউরি খেয়ে।

এই দেখ ! এই বলছ তখন সেথা ছিলে না। ফের বলছ, পড়ে গেল ! তবে কি তুমিই কিছু করেছ না কি ?

না বাবু, ধম্ম সাক্ষী ! উনি আমার ঠাগ্‌মা, সেবাযত্নের সামিগ্‌গি, উনিকে আমি মাত্তে পারি ?

যা লেখা হয়েছে মেনে নিয়ে ঘরে যাও। লাশ নিজেরা দাহ করবে তো ?

নিশ্চয় বাবু।

দেখ তবে ! কাল যেয়ে আমাদের কাগজ নিয়ে যেয়ে চেরাই ঘর থে' লাশ নিও।

ক'দ্দেরি হবে বাবু ?

সে কি আর সাঁঝ গড়াবে না ?

মধু ও কৈলাস এখন ভগীরথকে বলে, চল্ তবে, ঘর যাই।

থানাবাবু বলেন, দয়া করে পুলিস পাঠিয়ে তোমাদের হেনস্ত করলাম না। নইলে এমন ক্ষেত্রে পুলিস যায়।

বেরিয়ে এসে কৈলাস বলে, ওঃ ! বড় দয়া করেছে। দেখল আমরা ফুটো পয়সার কারবারী, তাই ছেড়ে দিল। নইলে মামলায় ফাঁসাত।

ভগীরথ বলে, কেন ? ঠাগ্‌মা তো এমনি মরেচে। তারে কেউ মেরেচে বলে

লিখল কেন ?

তোর কপাল ! ডাক্তারও বিশ্বাস গেল না কেউ মারেনি বলে, এরাও বিশ্বাস গেল না। তাতেই এত হাঙ্গামায় জড়ালে। তবু বেরুতে পারলে বাঁচি।

তোমরা আমায় ছেড়ে যেও না কৈলাস দাদা, মোর কেউ নি। মা থাগলে এতক্ষণে—

ছাড়ছে কে ? তবে টাকা তো লাগবে ভগীরথ।

যা আচে বাসন-বুসন, সব বেচে যা পারি দেব। আর যা না যাই হয়, গতরে কামিয়ে দেব।

বাসনের কথা বলতে ভগীরথের আবার মায়ের কথা মনে হয়। বলে, আলুমিনির বাসন এট্টা এট্টা করে মা মাগী করিছিল। ঠাগ্‌মার কত সাধ ছিল আলুমিনির হাঁড়ি কেনে। তা আর হল নি।

ও বাসনের আবার দাম হয় ?

দেখি ! আমি মায়ের কুপুত্তুর, জানলে কৈলাস দাদা ? না পাল্লাম ঠাগ্‌মাকে রাকতে, একন বাসনগুলো অব্দি বেচে দিতে হবে।

মধু দার্শনিকের মতো বলে, সে ভেবে লাভ কি বল্‌ ? বেচতে না চাস্‌, ডুব মেরে দে। বেওয়ারিশ লাশ সরকার জ্বালাবে। যদি তাতে মন না ওঠে, তবে যে করে পারিস, টাকা যোগাড় কর্‌।

ভগীরথ বলে, দোকানে যেয়ে দেখি।

ধূপকাঠির মহাজন ওকে দয়াপরবশ কুড়িটা টাকা দেন। বলেন, দশ টাকা দিলাম। বাকি টাকা হপ্তায় আড়াই টাকা হিসেবে কাটান দেব।

ভগীরথ এখানে ছোটবেলা থেকে আছে। ওর বস্তির সকলে সিকে-আধুলি করে আরো নয় টাকা তুলে দেয়। অবশেষে মধু, কৈলাস, ছিদাম, বলাই ও ভাবনের সঙ্গে ভগীরথ পরদিন যায়। সন্ধ্যে না হতে ঠাকুমা হাতে আসে ও ওরা হরি হরি বলে শ্মশানে রওনা দেয় খাটুলি কাঁধে। যেহেতু ভগীরথের দ্বারা কিছুই সম্ভব নয় আর, মধু ওর কাছ থেকে একটি পাটের দাম নিয়ে নেয় ও সস্নেহে বলে, এটা তোকেই দিতে হয়, জানলি ? আমাদের দিতে হয়। এ না হলে ঠাগ্‌মার গতি হয় না। শোঁসান যাত্রীদের বেলা কত নিয়ম তো ? সে তোকে ভাবতে হবে না। তোর কতা ভেবেই একটা পাটের উপর দিয়ে সব খরচা মেরে দিলাম।

ভগীরথ তখনো 'নিহত ও মৃত' ছুটি শব্দের মধ্যে ঘুরপাক খায় মনে মনে। তাই জবাব দেয় না।

শ্মশানে পৌছে বুড়িকে বিদ্যুৎ-চুল্লীতে ঢুকিয়ে তবে ভগীরথ বসতে সময় পায়।

শূন্য খাটুলি ও অপেক্ষমাণ নিষ্পর শবগুলির বিবর্ণ মুখের দিকে চেয়ে সে বহু কথা ভাবে। মধুরা পাঁটের খোঁজে চলে যায়। ভগীরথ ভাবে, ঠাকুমা মরল দাওয়া থেকে পড়ে, তবু বাবুরা বলল, ঠাকুমাকে কেউ মেরেছে।

কে মেরেছে? কেন মারবে? এখন তার মনে হয়, এখন গিয়ে একা ঘরে ঢুকতে হবে। মাচার নিচে বাসন-কোসনগুলোর চেনা চেহারা অব্দি নেই। এখন মনে হয়, ঠাকুমা জীবনে কোন স্বস্তি পায়নি, মরলও অপঘাতে। ছেলেদের হাতের আগুন নিয়ে গাঁয়ের শ্মশানে যাবে, তা না, সব হয়ে[illegible] উলটোপালটা। ভাসা ভাসা মনে হয়, ঠাকুমা গেল, ভগীরথের সর্বস্ব খোয়া গেল যেন। ঠাকুমার ভীমরতিগ্রস্ত প্রলাপে শোনা কথাগুলো ওর চেতনার ঘাটে স্মৃতির ঢেউয়ের মতো বার বার ভেঙে ভেঙে পড়ে—গোবিন্দ, ধান তোল, বিষ্টি এল। অ মুকি, লক্ষ্মীর নোট বাঁধলি নি? ধানের নোট না বাঁধলে লক্ষ্মীপুজো হয়? ঝড় উঠেচে, উনোন নিবো, উনোনে জল ঢাল্, ঘর জ্বলে যাবে।

সে ঘর, উঠোনে ভাগের ধান, ধানের গোছা নিয়ে লক্ষ্মীপুজোর নোট বাঁধা, গোবিন্দ, গোপীনাথ, সধবা মোক্ষদা, এ সব কিছু দেখেনি ভগীরথ। ঠাকুমা জরা-গ্রস্ত মন নিয়ে সেই হৃত অতীতে বাস করত বলে তার জাগ্রত প্রলাপে কিছু কিছু শুনেছে মাত্র। তারপর কলকাতা, রেল বস্তি, একখানা আস্ত কাপড় জোটেনি ঠাকুমার, আমের দিনে আম, গুড়ের দিনে পাটালি, কিছু দিতে পারেনি ঠাকুমাকে ভগীরথ, মোক্ষদাও পারেনি। মায়ের চেয়েও আজ ঠাকুমার জন্যে ভগীরথের কষ্ট হয় বেশি। মা বলত, বাপ কাকা মরে যেতে কুঁড়েখানা মহাজনকে ধার শুধে মা, ঠাকুমা আর ভগীরথকে নিয়ে ভিখিরি হয়ে শহরে চলে আসে। এখন মনে পড়ল, সেবার ডাক্তার দেখিয়ে এনে মা বিরস মুখে বলেছিল, ডাক্তারের কি? ডাক্তার বলে দেয় এটা খাওয়াও সেটা খাওয়াও। তোর ঠাগ্মা বুলি ধরে, হ্যা মুকি, ডাক্তার যে বলল, তা ফল দিলি না? সন্দেশ দিলি না? কেন মুকি? দোকানে জিনিস নি?

দোকানে সব জিনিসই থাকত, থাকে—ঠাকুমার যা যা দরকার। আস্ত ও নতুন কাপড়, শীতের চাদর, ফল-সন্দেশ-ওষুধ। কিন্তু ঠাকুমার কপালে পষ্টিভাত চটকানো ছাড়া কিছুই জোটেনি।

থানাবাবু বলে দিল, ঠাকুমাকে মেরে ফেলেছে কারা যেন। কারা মারল? তাদের দেখা যায় না কেন? কেন কখনো তাদের কেউ দেখতে পায় না? থানা-বাবু কি মিছে বলবে? মরেনি ঠাকুমা সময় হলে, ওকে মেরেই ফেলেছে কেউ। সংসারে এত লোক থাকতে তারা ভগীরথের ঠাকুমার মতো নিশতুরী কানী বুড়িদের মারে কেন?

কারা সেই আততায়ী হতে পারে, ভাবতে গিয়ে ভগীরথের মাথা ঝিমঝিম করল। এত বিশাল আকৃতি সেই নিহন্তার, এত ক্ষমতা তার, চোখ চেয়ে ভগীরথ কি তাকে দেখতে পারে? ঝিমঝিমেনি সামলাতে ভগীরথ চোখ বুজল ও চোখ খুলতে অ্যালুমিনিয়ামের উদ্ধত ও দর্পিত চুল্লীর দরজাটি দেখতে পেল শুধু। ভগীরথের মনে হল, ঠাকুমার একটা অ্যালুমিনিয়মের ভাতের হাঁড়ির সাধ ছিল খুব। এর চেয়ে অনেক কম অ্যালুমিনিয়ামে একটা ভাতের হাঁড়ি হয়

মাসিপিসি বনগাঁ-বাসী বনের মধ্যে ঘর।
কখনো মাসি বলল না যে, খই মোয়াটা ধর।
যশোদার মাসি কখনো আদর করত, না অনাদর, তা যশোদার মনে পড়ে না। জন্ম থেকেই সে যেন কাঙালীচরণের বউ, হাতে গুণে জেয়স্তে-মরস্তে কুড়িটা ছেলেমেয়ের মা। মনেই পড়ে না যশোদার, কবে তার গর্ভে সন্তান ছিল না, মাথা ঘুরত না সকালে, কাঙালীর শরীর কুপি-জ্বলা আঁধারে তার শরীরকে ভূ-তাত্ত্বিকের মতো ড্রিল করত না। মাতৃত্ব সে সইতে পারে, কি পারে না, সে-হিসেব কোনোদিন খতিয়ে দেখবে সময় পায়নি যশোদা। নিরন্তর মাতৃত্বই ছিল তার বাঁচবার ও অসংখ্য জীবের সংসারকে বাঁচাবার উপায়। যশোদা পেশায় জননী, প্রফেশ্যনাল মাদার। বাবুদের বাড়ির বউ-ঝির মতো এ্যমেচার মা ছিল না যশোদা। এ জীবন পেশাদারদের একচেটিয়া। এ্যমেচার ভিখিরি-পকেটমার-গণিকা এ শহরে পাত পায় না, এ রাজ্যে। এমন কি ফুটপাথ ও পথের নেড়িকুত্তা, ডাস্টবিনলোভী কাক— তারাও নবাগত এ্যমেচারদের ঠাঁই দেয় না। যশোদা মাতৃত্বকে পেশা হিসেবে নিয়েছিল।

সে জন্যে দায়ী হালদারবাবুদের নতুন জামাইয়ের স্টুডিবেকার গাড়ি এবং বাবু-বাড়ির ছোট ছেলের ভরদুপুরে চালক হবার আকাঙ্ক্ষা। আকাঙ্ক্ষাটি ছেলেটির মনে হঠাৎ জেগেছিল। হঠাৎ-হঠাৎ ছেলেটির মনে ও শরীরে যেসব বাতিক চাগাত, তা তৎক্ষণাৎ পরিতৃপ্ত করতে না পারলে ছেলেটি ক্ষান্ত হতো না। হঠাৎ-হঠাৎ বাতিকগুলি ওর দুপুরের নৈঃসঙ্গ্যেই চাগাত এবং বোগদাদের খলিফার মতো ওকে বান্দা খাটাত। এ পর্যন্ত সেকারণে সে যা-যা করেছে, তাতে করে যশোদাকে মাতৃত্বের পেশা নিতে হয়নি।

এক দুপুরে হঠাৎ কামের তাড়নায় ছেলেটি তাদের রাঁধুনিকে আক্রমণ করে ও রাঁধুনিটির পেটে তখন ভরা ভাত, চোরাই মুড়ো ও কচুশাকের ভার ছিল বলে, আলস্যে শরীর মন্থর ছিল বলে, রাঁধুনিটি, 'লঃ, কি করবি কর'—বলে চিতিয়ে পড়ে থাকে। অতঃপর ছেলেটির ঘাড় থেকে বোগদাদী ভূত নামে এবং সে— 'ক্যারেও কইও না মাসি' বলে সানুশোচনা অশ্রু ফেলে। রাঁধুনিটি তাকে, 'ইয়াতে আর কওন-বলনের আছে কি?'—বলে সত্বর ঘুমোতে যায়। সে কোনোদিনই

কিছু বলে দিত না। কেন না তার শরীর ছেলেটিকে আকর্ষণ করেছে জেনে সে যথেষ্ট গর্বিত হয়েছিল। কিন্তু চোরের মন বোঁচকার দিকে। ছেলেটি পাতে অসংগত সংখ্যায় মাছ ও ভাজা দেখে মনে-মনে প্রমাদ গণে। মনে করে, রাঁধুনি তাকে ফাঁসালে সে কেচ্ছায় পড়বে। অতএব আরেক দুপুরে সে বোগদাদী জিহ্নের তাড়সে মায়ের আংটি চুরি করে, সেটি রাঁধুনির বালিশের ওয়াড়ে ঢোকায় এবং শোর তুলে রাঁধুনিকে তাড়িয়ে ছাড়ে। আরেক দুপুরে সে বাবার ঘর থেকে রেডিও তুলে নিয়ে বেচে দিয়েছিল। দুপুরের সঙ্গে ছেলেটির এহেন আচরণের সংগতি খুঁজে পাওয়া তার মা-বাপের পক্ষেও মুশকিল, কেন না তার পিতা পঞ্জিকা দেখে হরিসালের হালদারদের ঐতিহ্যমতে সন্তানদের গভীর নিশীথে সৃষ্টি করেছিলেন। বস্তুত এ বাড়িতে ফটক পেরোলেই ষোড়শ শতক। পঞ্জিকা ও স্ত্রী-গ্রহণ এ বাড়িতে আজো আচরিত। কিন্তু এসব কথা বাই-লেন মাত্র। এ সকল দুপুরে-বাতিকের জন্যে যশোদার মাতৃত্ব পেশা হয়নি।

কোনো এক দুপুরে কাঙালীচরণ দোকানের মালিককে দোকানে বসিয়ে কোঁচার আড়ালে চারটি চোরাই সিঙাড়া জিলিপি নিয়ে ঘরে ফিরছিল। প্রত্যহই ফেরে। যশোদা ও সে ভাত খায়। ছানাপোনা তিনটি বিকেলে বাসি সিঙাড়া ও জিলিপি খায়। কাঙালীচরণ ময়রার দোকানে তাড়ু নাড়ে ও সিংহবাহিনীর মন্দিরের যাত্রীদের মধ্যে যারা 'হারায়ে মারায়ে কাশ্যপ গোত্র' হয়নি, সে সকল জাত্যভিমানী বামুনদের 'সদ্‌ব্রাহ্মণের প্রস্তুত লুচি তরকারি' খাওয়ায় লুচি ভেজে। প্রত্যহই সে মরদাটা-আশটা সরায় ও সংসারে সুসার করে। দুপুর নাগাদ পেটে ভাত পড়লে যশোদার প্রতি তার বাৎসল্য ভাব জাগে এবং যশোদার স্ফীত স্তন নিয়ে নাড়াচাড়া করে সে ঘুমিয়ে পড়ে। দুপুর নাগাদ ঘরে ফিরতে ফিরতে কাঙালীচরণ অদূর সুখের কথা ভাবছিল এবং স্ত্রীর সুবর্তুল স্তনের কথা ভেবে সে স্বর্গসুখ পাচ্ছিল। কচি মেয়ে বিয়ে করে তাকে কম খাটিয়ে প্রচুর খাওয়ালে আখেরে দুপুরে সুখ মেলে একথা চিন্তা করে তার নিজেকে দূরদর্শী পুরুষবাচ্চা মনে হচ্ছিল। এমন সময়ে বাবুদের ছেলে স্টুডিবেকার-সমেত ঘ্যাঁক করে কাঙালীচরণকে বাঁচিয়ে তার পায়ের পাতা ও গোড়ালির ওপরের গোছ দুটি চাপা দিল।

নিমেষে লোক জমল। নেহাত বাড়ির সামনে দুর্ঘটনা, নইলে 'রক্তদর্শন করে ছেড়ে দিতুম' বলে নবীন পাণ্ডা চেঁচাতে লাগল। শক্তি স্বরূপিণী মায়ের পাণ্ডা সে, দুপুরে রৌদ্ররসে তেতে থাকে। নবীনের গর্জনে হালদাররা যে-যে বাড়িতে ছিল, সবাই বেরুল। হালদারকর্তা সগর্জনে, 'হালা আবুইদা ষাঁড়, তুমি ব্রহ্মহত্যা

করবায়?' বলে ছেলেকে পেটাতে থাকলেন। ছোট জামাই তখন স্বীয় স্টুডিবেকার সামান্য আহত দেখে স্বস্তিতে হাঁপ ছাড়লেন এবং এই পয়সায়-ধনী, কালচারে-পাঠা শ্বশুরগোষ্ঠীর চেয়ে তিনি যে শ্রেষ্ঠতর মানুষ, তা প্রমাণের জন্য মিহিন আদ্দির পাঞ্জাবির মতো ফিনফিনে গলায় বললেন, 'লোকটা কি মারা যাবে? হাসপাতালে নিতে হবে না?'—কাঙালীর মনিবও ভিড়ের মধ্যে ছিল এবং পথে বিক্ষিপ্ত সিঙাড়া জিলিপি দেখে সে বলতে গিয়েছিল, 'ছিঃ ঠাকুর! তোমার এই কাজ?'—এখন সে জিভ আগলাল এবং বলল, 'তাই করুন সার।'—ছোট জামাই ও হালদারকর্তা কাঙালীচরণকে সত্বর হাসপাতালে নিলেন। কর্তার মনে আন্তরিক দুঃখ হল। দ্বিতীয় যুদ্ধের সময়ে, যখন তিনি ছাঁট লোহা বেচে-কিনে মিত্রশক্তির ফাসি-বিরোধী সংগ্রামে সহায়তা করছেন—তখন কাঙালীচরণ কিশোর মাত্র। বামুন বলে তাঁর ভক্তিশ্রদ্ধা রক্তের পোকা ও সেই কারণে ভোরে চাটুজ্জে-বাবুকে না পেলে ছেলের বয়সী কাঙালীকে প্রণাম করে তার ফাটা পায়ের ধুলো জিভে ঠেকাতেন। কাঙালী ও যশোদা তাঁর বাড়িতে পালেপার্বণে যায়-আসে এবং বউমারা পোয়াতি হলে যশোদাকে কাপড়-সিঁদুর পাঠানো হয়। এখন তিনি কাঙালীকে বললেন, 'কাঙালী! ভাইব না বাপ। আমি থাকতে তোমার কষ্ট অইব না।'—এখনি তাঁর মনে হল, কাঙালীর পায়ের পাতা দুটি কিমা হয়ে গেছে, ঠেকা পড়লে আর পায়ের ধুলো নিতে পারবেন না। ভেবে বড় দুঃখ হল তাঁর, এবং 'কি করল হারামজাদায়' বলে তিনি কেঁদে ফেললেন। হাসপাতালের ডাক্তারকে বললেন, 'সবকিছু করেন! টাকার লিগ্যা ভাইবেন না।'

কিন্তু ডাক্তারেরা পায়ের পাতা ফিরে দিতে পারলেন না। খুঁতো বামুন হয়ে কাঙালী ফিরে এল। ক্রাচ দুটি হালদারকর্তা করিয়ে দিলেন। ক্রাচ বগলে কাঙালী যেদিন ঘরে ফিরল, সেদিনই সে জানল, হালদার-বাড়ি থেকে প্রত্যহ যশোদার জন্য সিধা এসেছে। নবীন পাণ্ডা পাণ্ডা-কুলে সেজো। মায়ের ভোগের আড়াই আনার অংশীদার এবং সেই দুঃখে সে নিমু হয়ে থাকত। সিনেমায় রামকৃষ্ণকে কয়েকবার দেখার পর সে অনুপ্রাণিত হয়ে সেইমতে দেবীকে 'তুই, বেটি, পাগলী' বলে ও শাক্ত-মতে কারণবারি দ্বারা চেতনা নিষিক্ত করে রাখে। সে কাঙালীকে বলল, 'তোর জন্যে বেটির পায়ে ফুল চড়িয়েছিলুম।' খেপী বললে, 'কাঙালীর ঘরে আমার অংশ আছে, তার বরাতে ও বেঁচে উঠবে।' কাঙালী একথা যশোদাকে বলতে গিয়ে বলল, 'অ্যাঁ? আমি যখন ছিলাম না, তুই ওই নবনেটার সঙ্গে লটর-খটর কচ্ছিলি?' যশোদা তখনি পৃথিবীর দুই গোলার্ধের মাঝে কাঙালীর সন্দেহী মাথাটি চেপে ধরল ও বলল, 'রোজ বাবুদের দুটো ঝি এখেনে শুত আমাকে পাহারা দিতে।

নবনেকে আমি সামল দিই ? আমি না তোমার সতী স্ত্রী ?'

বস্তুত হালদার-বাড়িতে গিয়েও কাঙালী তার স্ত্রীর প্রজ্বলন্ত সতীত্বমহিমার বহু কথা শুনল। যশোদা মায়ের মন্দিরে হত্যা দিয়েছে, সুবচনীর ব্রত করেছে, চেতলা গিয়ে সিদ্ধবাবার চরণ ধরেছে। অবশেষে সিংহবাহিনী স্বপ্নে ধাইয়ের বেশে বগলে ব্যাগ নিয়ে এসে তাকে বলেছেন, 'ভাবিসনি। তোর সোয়ামি ফিরে আসবে।' কাঙালী একথা শুনে বিশেষ অভিভূত হল। হালদারকর্তা বললেন, 'বুঝলা কাঙালী ! হালার অবিশ্বাসীরা কয়, মায়ে স্বপ্ন দিব, তা ধাই সাইজ্যা ক্যান্ ? আমি কই, তিনি সৃষ্টি করে মা অইয়া, ধাত্রী অইয়া পালন করে।'

এরপর কাঙালী বলল, 'বাবু ! ময়রার দোকানে কাজ করব কি করে আর ? ক্রোচ নিয়ে তো বসে তাড়ু নাড়তে পারব না। আপনি ভগবান। কত লোককে কতভাবে অন্ন দিচ্ছেন ! আমি ভিক্ষে চাইনি। এট্টা কাজের ব্যবস্থা করে দিন।'

হালদারবাবু বললেন, 'হ কাঙালী ! তোমার লিগ্যা জায়গা দেইখ্যা থুইছি ! আমার বারিন্দায় ছাউনি দিয়া এট্টা দোকান কইরা দিনু। সামনে সিংহবাহিনী। যাত্রী আসে, যাত্রী যায়। তুমি মুড়ি-মুড়খি, চিড়া-বাতাসার দোকান দাও। অহন বারিতে বিয়া লাগছে। আমার সপ্তম পুত্র, হেই আবাইগার বিয়া। যদ্দিন না দোকান অয়, তদ্দিন সিধা যাইবে।'

একথা শুনে কাঙালীর মন বর্ষা সমাগমে বাদুলে পোকার মতো উড্ডীন হল, ও ঘরে ফিরে সে যশোদাকে বলল, 'সেই যে কালিদাসের শোলোক আছে, নেই তাই খাচ্ছ, থাকলে কোথায় পেতে ? —আমার কপালে তাই হল রে ! বাবু বলছে, ছেলের বিয়ে মিটলে রকে দোকান করে দেবে। যদ্দিন না দিচ্ছে, তদ্দিন সিধে পাঠাবে। ঠ্যাং থাকলে কি এরকমটা হতো ? সবই মায়ের ইচ্ছে রে !'

ক্রাচ খটখটিয়ে কাঙালী সুসংবাদটি আপামরকে বিতরণ করল। ফলে তার প্রাক্তন মনিব নবীন পাণ্ডা, ফুলদোকানের কেষ্ট মহান্তি, মায়ের বাঁধা ঢাকী উল্লাস, সকলে বলল, 'আহা ! কলি বললে তো হয় না ! মায়ের তল্লাটে পাপের পতন, পুণ্যের জয়, এ হতেই হচ্ছে। নইলে কাঙালীর পা খোয়া যাবে কেন ? আর হালদারকত্তা বা বামুনের মন্ত্রির ভয়ে এত কথা স্বীকার যাবে কেন ? সবচে বড় কথা, যশোদাকে বা মা ধাই বেশে দেখা দেবে কেন ? সবই মায়েব ইচ্ছে।'

এ ঘোর কলিতে পাঁচেব দশকে কাঙালীচরণ পতিতুণ্ডকে ঘিরে দেড়শো বছর আগে স্বপ্নাদেশে প্রাপ্তা দেবী সিংহবাহিনীর ইচ্ছাসকল এভাবে পাক খাচ্ছে, তা দেখে সকলে যথোচিত বিস্মিত হয়। হালদারকর্তার হৃদ্-পরিবর্তন, সেও মায়েরই ইচ্ছে। হালদারকর্তা পাত্র না দেখে দয়া করেন না। তিনি স্বাধীন

ভারতের বাসিন্দা, যে ভারত মানুষে-মানুষে, রাজ্যে-রাজ্যে, ভাষায়-ভাষায়, রাঢ়ী-বারেন্দ্র-বৈদিকে, উত্তররাঢ়ী কায়স্থ ও দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থে, কাপ-কুলীনে প্রভেদ করে না। কিন্তু তিনি পয়সা করেছেন ব্রিটিশ আমলে, যখন ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল ছিল পলিসি। হালদারকর্তার মানসিকতা তখনই গঠিত হয়ে গেছে। ফলে তিনি পাঞ্জাবি-উড়িয়া-বিহারি-গুজরাটি-মারাঠি-মুসলমান, কারুকে বিশ্বাস করেন না এবং দুর্গত বিহারি শিশু বা অনাহারে কাতর উড়িয়া ভিখারি দেখলে তাঁর বিয়াল্লিশ ইঞ্চি গোপাল গেঞ্জির নিচে অবস্থিত, চর্বিতে সুরক্ষিত হৃৎপিণ্ডে করুণার ঘামাচি আদপে চুলকোয় না। তিনি হরিসালের সুসন্তান। ফলে পশ্চিমবঙ্গের মাছি দেখলেও তিনি 'আঃ! দ্যাশের মাছি আছিল রিষ্টপুষ্ট—ঘটির দ্যাশে হকলডি চিমড়া-চাম্‌সা' বলে থাকেন। সেই হালদারকর্তা গাঙ্গেয় কাঙালীচরণকে কেন্দ্র করে করুণাঘন হচ্ছেন, এ দেখে মন্দিরের চারিদিকে সকলেই বিস্মিত হয় এবং কিছুদিন ধরে লোকের মুখে-মুখে এই কথাই ফেরে। হালদারকর্তা এমন ঘোর দেশপ্রেমী যে নাতি, ভাইপো, ভাগ্নেরা দেশনেতাদের জীবনী পাঠ্যপুস্তকে পড়লে কর্মচারীদের বলেন, 'হঃ! ঢাকার পোলা, মইমনসিঙের পোলা, যশুইরা পোলা, ইয়াগর জীবনী পড়ায় ক্যান্? হরিসাইলা অইল দধীচির হাড়ে তৈয়ার। ব্যাদ উপনিষদ হরিসাইলার লিখা, এ্যাও একদিন প্রকাশ পাইব।' তাঁর কর্মচারীরা তাঁকে এখন বলে, 'আপনার চেইন্‌জ অফ হার্ট হইত্যাছে, ঘটির লিগ্যা আপনার এই দয়া, ইয়ার পাছে দ্যাখবেন ঈশ্বরের কুন্ বা পার্পাস আছে।' কর্তা একথায় হ্লাদিত হন এবং 'ব্রাহ্মণের কি ঘটি-বাঙাল অয়? গলায় উপবীত থাকলে হ্যায় পাইখানায় বইয়া রইলেও মাইন্য দিতে অইব' বলে উচ্চ হাস্য করেন।

চতুর্দিকে এভাবে মায়ের ইচ্ছার প্রভাবে করুণা-মায়ামমতা-দয়ার সুবাতাস বইতে থাকে এবং নবীন পাণ্ডা কয়েকদিন ধরে সিংহবাহিনীর কথা যতবারই ভাবতে যায়, যশোদার উত্তুঙ্গস্তনা, গুরুনিতম্বা শরীর তার চোখে ভাসে এবং মা যশোদাকে যেমন ধাই সেজে স্বপ্ন দিলেন, তাকে যশোদা সেজে স্বপ্ন দিচ্ছেন কিনা সেকথা ভেবে তার শরীরে মন্দ উত্তেজনা জাগে। আট-আনার পাণ্ডা তাকে বলে, 'মেয়েছেলের এ রোগ হলে বলে প্যাঁদ রোগ, বেটাছেলের হলে বলে ম্যাদ রোগ। তুই পেচ্ছাপ করার সময়ে কানে শ্বেত অপরাজিতার শেকড় বাঁদ্।'

একথা নবীনের মনে নেয় না। একদিন সে কাঙালীকে বলে, 'মায়ের ছেলে শক্তি নিয়ে র‍্যালা করব না। তবে একটা বুদ্ধি মাথায় এয়েচে। বোষ্টম ভাব নিয়ে র‍্যালা করতে বাধা নেই। তোকে বলি, স্বপ্নে গোপাল পা একখানা। আমার পিসি শ্রীকেত্তর থেকে গোপাল এনিছিল পাতরের। সেটা তোকে দিই। স্বপ্নে পেইছিস

বলে প্রচার দে। দেকবি দুদিনে রমরমা হবে, ঝমঝমিয়ে পয়সা পড়বে। পয়সার জন্যে শুরু কর্, পরে মনে গোপাল-ভাব আসবে।'

কাঙালী বলে, 'ছি দাদা! ঠাকুর-দেবতা নিয়ে তামাশা করতে আছে?'

নবীন তাকে, "তবে মর্‌গা যা!" বলে তাড়া দেয়। পরে দেখা যায়, নবীনের কথা শুনলে কাঙালী ভাল করত। কেন না, হালদারকর্তা হঠাৎ একদিন হার্টফেল করে মরে যান। কাঙালী ও যশোদার মাথায় শেক্ষপীরের ওয়েল্‌কিন ভেঙে পড়ে।

২

কাঙালীকে পথে বসিয়ে যান হালদারকর্তা। কাঙালীকে ঘিরে ভায়া-মিডিয়া হালদারকর্তা সিংহবাহিনীর যেসব ইচ্ছা প্রকাশ পাচ্ছিল, তা প্রাক্-ভোট রাজনৈতিক দল-প্রদত্ত প্রজ্বলন্ত প্রতিশ্রুতির মতো শূন্যে মিলায় ও নিরুদ্দেশ-যাত্রার নায়িকার মতো রহস্যজালের মায়ায় অদেখা হয়। কাঙালী ও যশোদার রঙিন স্বপ্ন-ফানুসটিতে য়ুরোপীয় ডাইনির বডিকিন ফুটকে যায় এবং স্বামী-স্ত্রী আতান্তরে পড়ে। ঘরে গোপাল, নেপাল ও রাধারানী খাবার তরে আখ্‌খুটে বায়না ধরে ও মায়ের মুখ খায়। শিশুদের এই 'ওদনের তরে' কান্নাকাটি খুবই স্বাভাবিক। কাঙালীচরণের চরণ খোয়া যাবার পর থেকে ওরা প্রত্যহ হালদার-বাড়ির সিধায় ভালমন্দ খেয়েছে। কাঙালীও ভাতের তরে কাতর হয় এবং মনে গোপাল-ভাব জাগিয়ে যশোদার বুকে মুখ খুঁশতে গিয়ে ধমক খায়। যশোদা একেবারে ভারতীয় রমণী, যে-রমণীর যুক্তি-বুদ্ধি-বিচারহীন স্বামীভক্তি ও সন্তানপ্রেমের কথা, অস্বাভাবিক ত্যাগ-তিতিক্ষার কথা, সতী-সাবিত্রী-সীতা থেকে শুরু করে নিরুপা রায় ও চাঁদ-ওসমানি পর্যন্ত সকল ভারতীয় নারী জনমানসে জাগিয়ে রেখেছেন। এহেন স্ত্রীলোককে দেখেই সংসারের ন্যালা-মাকড়ারা বোঝে, ভারতের সেই ঐতিহ্য প্রবহমান—বোঝে এদের কথা মনে রেখেই এই সব আপ্তবাক্য রচিত হয়েছে—

> 'স্ত্রীলোকের জান যেন কচ্ছপের প্রায়'—
> 'বুক ফাটে ত মুখ ফোটে না'—
> 'পুড়বে নারী উড়বে ছাই
> তবে নারীর গুণ গাই'—

বস্তুত, বর্তমান দুরবস্থার জন্য যশোদার একবারও স্বামীকে দুষতে ইচ্ছে যায় না। শিশুদের তরে যেমন, কাঙালীর তরেও তেমনি মমতা তার বুকে উছলে ওঠে।

পৃথিবী হয়ে গিয়ে ফলে-শস্যে অক্ষম স্বামী ও নাবালক সন্তানদের ক্ষুধা মিটাতে ইচ্ছা যায়। যশোদার এই স্বামীর প্রতি বৎসল ভাবটির কথা জ্ঞানী-মুনিরা লিখে যাননি। তাঁরা প্রকৃতি ও পুরুষ এইভাবে নারী-পুরুষকে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু সে তাঁরা করেছেন আদ্যি যুগে—যখন অন্য দেশ থেকে তাঁরা এই পেনিনসুলায় প্রবেশ করলেন। ভারতের মাটির গুণ এমনি, যে এখানে রমণীরা সবাই জননী হয়ে যায় এবং পুরুষরা সবাই গোপাল-ভাবে আপ্লুত থাকে। সকল পুরুষই গোপাল ও সকল রমণী নন্দরানী, এ ভাবটি যাঁরা অস্বীকার করে নানারূপ 'ইটার্নাল শী'—'মোনালিসা'—'লা পাসিওনারিয়া'—সিমন দ্য ব্যোভোআর—ইত্যাদি পছন্দমতো কারেন্ট পোস্টার পুরনো পোস্টারের ওপরে সাঁটতে চান ও মেয়েদের সে ভাবে দেখতে চান, তাঁরাও এ ভারতের ছানাপোনা। তাই দেখা যায় শিক্ষিত বাবুদের এ সকল অভীপ্সা বাইরের মেয়েছেলেদের জন্যে। ঘরে ঢুকলে তারা বিপ্লবিনীদের মুখে ও ব্যবহারে নন্দরানীকেই চান। প্রসেসটি খুবই জটিল। এটি বুঝেছিলেন বলে শরৎচন্দ্রের নায়িকারা নায়কদের সতত চারটি বেশি করে ভাত খাইয়ে দিতেন। শরৎচন্দ্রের এবং অন্যান্য অনুরূপ লেখকদের লেখার আপাত-সরলতা আসলে খুব জটিল এবং সন্ধ্যেবেলা শান্ত মনে বেলের পানা খেয়ে চিন্তা করার কথা। পশ্চিমবঙ্গে যাঁরাই লেখাপড়া ও চিন্তাশীলতার কারবার করেন, তাঁদের জীবনে আমাশার প্রভাব অত্যন্ত বেশি এবং সে কারণে বেল ফলটিতে তাঁদের সমধিক গুরুত্ব দেওয়া উচিত। বেলফল-থানকুনি-বাসক-পাতাকে সমধিক গুরুত্ব দিই না বলে আমরা যে কত কি হারাচ্ছি তা নিজেরা বুঝি না।

যা হোক, যশোদার জীবনকথা বলতে বসে বারংবার বাই-লেনে ঢোকার অভ্যেস ঠিক নয়। পাঠকের ধৈর্য কিছু কলকাতার পথঘাটের জটিল নয় যে দশকে-দশকে বেড়ে চলবে। আসল কথা হল, যশোদা সমধিক ফাঁপরে পড়ল। কর্তার শ্রাদ্ধ চলার কালে তারা লুসেপুসে খেল বটে, কিন্তু সব চুকেবুকে গেলে যশোদা রাধারানীকে বুকে ধরে ও-বাড়িতে গেল। বাসনা, গিন্নিকে বলে-কয়ে তাঁর নিরিমিষ হেঁসেলের রান্নার কাজ চেয়ে নেবে।

গিন্নির বুকে কর্তার শোক বেজেছিল খুব। কিন্তু উকিলবাবু জানিয়ে গেছেন, কর্তা এই বাড়ির মালিকানা, চালের আড়তের স্বত্ব তাঁকেই দিয়ে গেছেন। তিনি সেই বলে বুক বেঁধে আবার সংসার-সাম্রাজ্যের হাল ধরেছেন। মাছটা-মুড়োটা বলে বড় কষ্ট হয়েছিল। এখন দেখছেন উৎকৃষ্ট গাওয়া ঘি, গাঙ্গুরামের দই-সন্দেশ, ঘন ক্ষীর ও মর্তমান কলা খেয়েও কোনোমতে শরীরটা টিকিয়ে রাখা চলে। গিন্নি জলচৌকি আলো করে বসে আছেন। কোলে এক ছ-মেসে ছেলে, গিন্নির

নাতি। এ পর্যন্ত ছয় ছেলের বিয়ে হয়েছে ও পঞ্জিকায় যেহেতু প্রায় মাসেই স্ত্রী-গ্রহণ অনুমোদিত, সেহেতু গিন্নির বাড়িতে একতলায় সার-সার আঁতুড়ঘর প্রায়শ ফাঁক যায় না। লেডি ডাক্তার ও সরলা ধাই এ বাড়ি ছাড়া হয় না। গিন্নির মেয়ে ছয়টি। তারাও দেড় বছুরে পোয়াতি। তাই কাঁথা-কানি-ঝিনুক-বোতল-রবারক্লথ-বেবিজন্‌সন্‌পাউডার-স্নানের গামলার এপিডেমিক লেগেই থাকে।

গিন্নি নাতিকে দুধ খাওয়াবার চেষ্টায় জেরবার হচ্ছেন ও যশোদাকে দেখে স্বস্তি পেয়ে যেন বললেন, 'মা আমার ভগবান হইয়া আসছ! এ্যারে দুধ দাও মা, পা ধরি। মায়ের অসুখ—তা এমুন পোলা যে বুতল মুখে ধরে না।' যশোদা তখনি ছেলেকে দুধ দিয়ে শান্ত করল। গিন্নির সনির্বন্ধ অনুরোধে যশোদা রাত ন-টা অবধি ওবাড়িতে থাকল এবং গিন্নির নাতিকে দফায় দফায় দুধ দিল। তার সংসারের জন্যে রাঁধুনি বামনী ভাত-তরকারি গামলা ভরে দিয়ে এল। ছেলেকে দুধ দিতে দিতেই যশোদা বলল, 'মা! কর্তা তো কত কথাই বলিছিলেন। তিনি নেই, তাই সেকথা আর ভাবি না। কিন্তু মা! তোমার বামুন-ছেলের পা দুখানা নেই। আমার জন্য ভাবি না। কিন্তু সোয়ামি-ছেলের কথা ভেবে বলছি, যা হয় এট্টা কাজ দাও। নয় তোমার সোংসারে রান্না কাজ দিলে?'

'দেখি মা! চিন্তা কইরা দেখি।' গিন্নি কর্তার মতো বামুন-ভজা নন। তাঁর ছেলের দুপুরে বাই চাগানো দোষে কাঙালীর পা গেছে একথা তিনি পুরো মানেন না। নিয়তি কাঙালীরও, নইলে খটখটে রোদে ফিকফিক করে হেসে-হেসে পথ ধরে সে যাচ্ছিল কেন? তিনি মুগ্ধ ঈর্ষায় যশোদার ম্যামাল প্রোজেকশান দেখেন ও বলেন, 'কামধেনু কইরা তোমায় পাঠাইছিল বিধাতা। বাঁট টানলেই দুধ! আমার ঘরে যেগুলা আনছি, তাদের এ্যার সিকিভাগ দুধ-অ বুঁঠায় নাই!'

যশোদা বলে, 'সে আর বলতে মা! গোপাল ছেড়ে দিল, বয়স হল তিন বছর। এটা তখনো পেটে আসেনি। তাতেও দুধ যেন বান ডাকত। কোত্থেকে আসে মা? খাওয়া নেই, মাখা নেই!'

একথা নিয়ে রাতে মেয়ে মহলে প্রচুর কথা হয় এবং রাতে ব্যাটাছেলেরাও এ-কথা শোনেন। মেজ ছেলে, যাঁর স্ত্রী অসুস্থ এবং যাঁর ছেলে যশোদার দুধ খেল, তিনি সবিশেষ স্ত্রৈণ। অন্য ভায়েদের সঙ্গে তাঁর তফাত হল, ভাইরা পাঁজি দেখে সুদিন পেলেই সপ্রেম বা অপ্রেমে বা বিরক্ত মনে বা কারবারে গুণ-চটের কথা ভাবতে ভাবতে সন্তান সৃজন করেন। মেজ ছেলে একই ফ্রিকোয়েনসিতে স্ত্রীকে গর্ভবতী করেন, কিন্তু তার পেছনে থাকে সুগভীর প্রেম। স্ত্রী বারবার গর্ভবতী হন, সে ভগবানের হাত। কিন্তু সেই সঙ্গে স্ত্রী যাতে সুন্দরী থাকেন, সেজন্যেও

মেজ ছেলে আগ্রহী। ক্রমান্বয় গর্ভাধান ও সৌন্দর্যের কমবিনেশন কি ভাবে করা যায়, একথা তিনি অনেক ভেবে থাকেন, কিন্তু কূল পান না। মেজ ছেলে আজ স্ত্রীর মুখে যশোদার সারপ্লাস দুধের কথা শুনতে শুনতে হঠাৎ বলেন, 'পাইছি পথ!'

'কিয়ের পথ?'

'এই, তোমার কষ্ট বাচাইবার পথ।'

'কেম্‌তে? আমার কষ্ট যাইব চিতায় গুঠলে। বছর-বিয়ানীর আর শরীল সারে?'

'সারব, সারব, ভগবানের কল হাতে পাইছি যে! বছর বিয়াইবা, স্যাহও থাকব।'

স্বামী-স্ত্রী পরামর্শ হল। স্বামী সকালে গিয়ে মায়ের ঘরে ঢুকলেন ও ঘুচুর-ঘুচুর করে কথা কইলেন। গিন্নি প্রথমটা গাঁইগুঁই করতে লাগলেন, কিন্তু তারপর স্বগতচিন্তা করতে করতে বুঝলেন প্রস্তাবটি লাখ টাকার। বউরা এসেছে, বউরা মা হবে। মা হলে ছেলেকে দুধ খাওয়াবে। যেহেতু যতদিন সম্ভব, ততদিনই মা হবে— সেহেতু ক্রমান্বয়ে দুধ খাওয়ালে চেহারা ঝটকাবে। তখন যদি ছেলেরা বারমুখো হয়, বা বাড়ির ঝিদের ওপর উৎপাত করে, গিন্নি কিছু বলতে পারবেন না। ঘরে পাচ্ছে না বলে বাইরে যাচ্ছে—হক কথা। তাই যশোদা যদি কচি কাঁচাদের দুধ-মা হয়, তাহলে নিত্য সিধা, পুজোয় পার্বণে কাপড়, মাসান্তে কিছু টাকা দিলেই কাজ হয়। গিন্নির বাড়িতে আজ চাপড়াষষ্ঠী, কাল সুবচনী, পরশু মঙ্গলচণ্ডী ব্রত লেগেই থাকে। তাতেও যশোদাকে বামুন-এয়ো করা চলবে। তাঁর ছেলের কারণে যশোদার এত খোয়াব, পাপও ক্ষালন হবে।

যশোদা তাঁর প্রস্তাবে হাতে মন্ত্রিত্ব পেল। নিজের স্তন দুটিকে বড় মহার্ঘ মনে হল তার। রাতে কাঙালীচরণ খুনসুড়ি করতে এলে সে বলল, 'দেখ! এখন এর জোরে সংসার টানব। বুঝে শুনে ব্যবহার করবে।' কাঙালীচরণ সে রাতে গাঁই-গুঁই করল বটে, কিন্তু সিধাতে চাল-ডাল-তেল-আনাজের বহর দেখে তার মন থেকে গোপাল-ভাবটি নিমেষে চলে গেল। ব্রহ্মা-ভাবে সে উদ্দীপিত হল এবং যশোদাকে বুঝিয়ে বলল, 'পেটে সন্তান থাকলে তবে তো তোর বুকে দুধ আসবে। এখন সেকথা ভেবেই তোকে কষ্ট করতে হবে। তুই সতীলক্ষ্মী। নিজেও পোয়াতি হবি, পেটে ছেলে ধরবি, বুকে পালন করবি, এ তো জেনেই মা তোকে ধাইবেশে দেখা দিইছিল।'

যশোদা এ কথার যাথার্থ্য বুঝল ও সাশ্রুচোখে বলল, 'তুমি স্বামী, তুমি গুরু। যদি বিস্মরণ হয়ে না-না করি, তুমি সোঙরে দিও। কষ্ট আর কি বল? গিন্নিমা কি

তেরটা বিয়োয়নি ? গাছের কি ফল ধরতে কষ্ট হয় ?'

অতএব সেই নিয়মই বহাল রইল। কাঙালীচরণ পেশাদারী পিতা হল। যশোদা হল প্রফেশানে মা। বস্তুত যশোদাকে দেখলে এখন সেই সাধকমার্গের গানটির গভীরতা অবিশ্বাসীরও মনে জাগে। গানটি হল—

মা হওয়া কি মুখের কথা ?
শুধু প্রসব কল্লে হয় না মাতা।

হালদার-বাড়ির একতলায় চকমেলানো উঠোনে চারধারে বড-বড় ঘরে বারো-চোদ্দটি সুলক্ষণা গাভী হামেশা হামেহাল বজায় থাকে। দুজন ভোজপুরী গো-মাতা জ্ঞানে তাদের পরিচর্যা করে। খোল-ভুসি-খড়-ঘাস-গুড পাহাড়-পাহাড় আসে। হালদারগিন্নি বিশ্বাস করেন, গরু খাবে যত, দুধ দেবে তত। যশোদার জায়গা এ বাড়িতে এখন গো-মাতাদের ওপরে। গিন্নির ছেলেরা ব্রহ্মাবতার হয়ে প্রজাদের সৃষ্টি করে। যশোদা প্রজা প্রপালিকা। তার দুগ্ধসঞ্চয় যাতে অব্যাহত থাকে সেদিকে হালদারগিন্নি কড়া নজর রাখলেন। কাঙালীচরণকে ডেকে বললেন, 'হ্যা বামুন ছেলে ? দোকানে ত ভাড়ু নাড়তা, ঘরে পাকসাকের ভারটা নিয়া অরে আরাম দেও। নিজের দুটো, এখানে তিনটা, পাঁচটারে দুধ দিয়া ঘরে গিয়া পাক-সাক করতে পারে ?'

কাঙালীচরণের জ্ঞাননেত্র এভাবে খুলে গেল এবং নিচে এসে ভোজপুরীদ্বয় তাকে খৈনি দিয়ে বলল, 'মা জী ত ঠিকহি বলেছে। হামরা গো-মাতার ইতনা সেবা করি— তো তুর বহু তো জগৎমাতা আছে।'

এরপর থেকে কাঙালীচরণ বাড়ির রান্নার ভার তুলে নিল হাতে। ছেলেমেয়ে-দের করে তুলল কাজের সাগবেদ। ক্রমে সে থোড়ঘণ্ট, কলাই ডাল, মাছের অম্বল রাঁধতে বড়ই সেয়ানা হল এবং সিংহবাহিনীর প্রসাদী পাঁঠার মাথার মুড়িঘণ্ট রেঁধে নবীনকে খাইয়ে-খাইয়ে সেই দুর্দান্ত গেঁজেল মাতালকে নিজের বশীভূত করে ফেলল। ফলে নবীন কাঙালীকে নকুলেশ্বর শিবের মন্দিরে ঢুকিয়ে দিল। যশোদা প্রত্যহ রাঁধা ভাতব্যঞ্জন খেয়ে পি. ডব্ল্যু. অফিসারের ব্যাঙ্ক-অ্যাকাউন্টের মতো ফুলে ফেঁপে উঠল। তার ওপর গিন্নিমা তাকে দুধ-উঠনো করে দিলেন। পোয়াতি হলে তার জন্যে আচার-ঝালনাড়ু-মোরব্বা পাঠাতে থাকলেন।

এই ভাবে অবিশ্বাসীদেরও প্রত্যয় জন্মাল, যশোদাকে সিংহবাহিনী এই কারণেই বগলে ব্যাগ নিয়ে ধাই হয়ে দেখা দিয়েছিলেন। নইলে নিরন্তর গর্ভধারণ, সন্তান-প্রসব, অপরের ছানাপোনাকে গাভীর মতো অকাতরে দুগ্ধদান, কে কবে শুনেছে বা দেখেছে ? নবীনের মন থেকেও মন্দ ভাব চলে গেল। পাঁঠার মাথা, কারণবারি,

গাঁজা, এহেন উগ্র জিনিস খেয়েও তার শরীর আর তাতল না। মনে আপনা হতেই ভক্তিভাব এল। যশোদাকে সে দেখা হতেই 'মা! মা! মাগো!' বলে ডাকতে থাকল। চতুর্দিকে সিংহবাহিনীর মাহাত্ম্য বিষয়ে বিশ্বাস পুনর্জাগ্রত হল এবং অঞ্চলটির বাতাসে দেবীমহাত্ম্যের ইলেক্ট্রিফাইং প্রভাব বইতে থাকল।

যশোদা বিষয়ে সকলের ভক্তিভাব এমন প্রখর হল যে বিয়ে-সাধ-অন্নপ্রাশন-পইতে সকলে তাকে ডেকে প্রধানা এয়োর সম্মান দিতে থাকল। যশোদার ছেলে বলে নেপাল-গোপাল-নেনো-বোঁচা-পটল ইত্যাদিকে সবাই সেই চোখে দেখতে থাকল, এবং যে যেমনটি বড় হল, পইতে নিয়ে মন্দিরে যাত্রী ধরে আনতে থাকল। রাধারানী, আলতারাণী, পদ্মরানী, ইত্যাদি মেয়েদের জন্যে কাঙালীকে বর খুঁজতে হল না। নবীন আশ্চর্য তৎপরতায় মেয়েদের বর জুটিয়ে দিল ও সতী মায়ের সতী কন্যারা যে যার শিবের ঘর করতে গেল।

হালদার-বাড়িতে যশোদার আদর বেড়ে গেল। স্বামীরা খুশি, কেন না এখন আর তাদের পাঁজি উলটোতে দেখলে বউদের হাঁটুতে ঠকঠকি লাগে না। তাঁদের গোপালরা যশোদার স্তন্যে লালিত হচ্ছে বলে তাঁরা যথেচ্ছ গোপাল হতে পারেন বিছানায়। বউদের 'না' বলবার মুখ রইল না। বউরা খুশি। কেন না দেহের ডোলটি ভাল থাকল। তারা যথেচ্ছ মেম কাটের জামা ও বডিস্ পরতে পারল। হোলনাইট সিনেমা দেখে শিবরাত্তির করার সময়ে ছেলেকে দুধ দিতে হল না। এ সবই সম্ভব হল যশোদার জন্যে। ফলে যশোদার মুখ খুলল এবং শিশুদের নিরন্তর স্তন দিতে দিতে গিন্নির ঘরে বসে সে ফুট কাটতে থাকল, 'মেয়েছেলে বিয়োবে, তার জন্যে ওষুধ রে, ব্লাডপেসার দেখা রে, ডাক্তার দেখানো রে। আদিখ্যেতা! এই তো আমি! বছর-বিউনি হইছি। তাতে কি শরীর চস্‌কাচ্ছে, না দুধ কমছে? কি ঘেন্না মা! শুনছি না কি ইঞ্জিশান দিয়ে সব দুধ শুকিয়ে ফেলছে। এমন কথাও শুনিনি কখনো!'

হালদার-বাড়ির ছেলেদের মধ্যে যারা কিশোর, তাদের বাপ-জ্যেঠা-কাকারা গোঁফ গজাতেই ঝিদের আওয়াজ দিত। দুধ-মার দুধে তারাও মানুষ, তাই দুধ-মার বন্ধু ঝি-রাঁধুনিকে তারা এখন মাতৃভাবে দেখতে থাকল এবং মেয়ে-ইস্কুলের চারপাশে হাঁটাহাঁটি শুরু করল। ঝিয়েরা বলল, 'যশি! ভগবতী হয়ে এইছিলি তুই! তো' হতে বাড়ির হাওয়া পালটাল।'

ছোট ছেলে যখন একদিন উবু হয়ে বসে যশোদার দুগ্ধদান দেখছে, তখন যশোদা বলল, 'তুমি বাছা, আমার লক্ষ্মী! বামুনের ঠ্যাং খুঁতো করিছিলে বলে তো এতসব হল? বল দেখি কার ইচ্ছেয় হল?'

ছোট হালদার বলল, 'সিংহবাহিনীর ইচ্ছে!'

তার জানতে ইচ্ছে হয়েছিল, ঠ্যাং নেই, তবু কাঙালীচরণ ব্রহ্মা হয় কি উপায়ে? কথাটা ঠাকুরদেবতার দিকে চলে গেল বলে, সেও প্রশ্নটি ভুলে গেল।

সবই সিংহবাহিনীর ইচ্ছে!

৩

পঞ্চাশের দশকে কাঙালীর ঠ্যাং কাটা যায়, আমাদের কাহিনী এই সময়ে পৌঁছেছে। পঁচিশ বছরে, থুড়ি তিরিশ বছরে, যশোদা কুড়ি বার আঁতুড়ে ঢুকেছে। শেষের দিকের মাতৃত্বগুলো বেফয়দা যায়, কেন না, কেমন করে যেন হালদার-বাড়িতে নতুন হাওয়া ঢুকে পড়ল। ওই পঁচিশ না তিরিশ বছরের গণ্ডগোলটুকু সেরে নিই। কাহিনী যখন শুরু হয় তখনি যশোদা তিন ছেলের মা ছিল। তারপর তার সতেরো বার সন্তান-সম্ভাবনা হয়। হালদার গিন্নিও মরে গেলেন। তাঁর বড় ইচ্ছে ছিল, তাঁর শাশুড়ির যেমনটি হয়েছিল, তেমনটি বউদের কারো হোক। কুড়িটি সন্তান হলে আবার স্বামী-স্ত্রীর বিয়ে হবার নিয়ম ছিল বংশে। কিন্তু বউমারা বারো-তেরো-চোদ্দতে ক্ষান্ত দিল। দুর্বুদ্ধিবশত তারা স্বামীদের বোঝাতে সক্ষম হল এবং হাসপাতালে গিয়ে ব্যবস্থা করে এল। এ সবই নতুন হাওয়ার কুফলে ঘটল। কোনো যুগেই জ্ঞানী পুরুষ বাড়িতে নতুন হাওয়া ঢুকতে দেন না। দিদিমার কাছে শুনেছি জনৈক ভদ্রলোক তাঁর বাড়িতে এসে 'শনিবারের চিঠি' পড়ে যেতেন। কদাচ ঘরে বইটি ঢোকাতেন না। বলতেন, 'বউ-মা-বোন যে ওই কাগজ পড়বে, সেই বলবে আমি নারী! মা নই, বোন নই, বউ নই।' ফলে কি ঘটবে, তা জিগ্যেস করলে বলতেন, 'চটি পরে ভাত রাঁধবে।' নতুন হাওয়ার প্রকোপে অন্দরে অশান্তি হয়, এ চিরকালের নিয়ম।

হালদার-বাড়িতে চিরকাল ষোড়শ শতক চলছিল। কিন্তু সহসা বাড়িতে মেম্বর সংখ্যা অগণিত হল বলে ছেলেরা যে-যার মতো নতুন বাড়ি বানিয়ে সটকে পড়তে থাকল। সবচেয়ে আপত্তির কথা, মাতৃত্ব বিষয়ে গিন্নির নাতবৌরা একেবারে উলটো হাওয়া খেয়ে ঘরে ঢুকল। বৃথাই গিন্নি বললেন, চালের অভাব, টাকার অভাব নেই। কর্তার বড় সাধ ছিল হালদারদের দিয়ে অর্ধেক কলকাতা ভরে ফেলেন। নাতবৌরা নারাজ। তারা বুড়ির দাবড়ি অগ্রাহ্য করে স্বামীদের নিয়ে কর্মস্থলে ছুটল। এরই মধ্যে সিংহবাহিনীর মন্দিরের পাণ্ডাদের মধ্যে বিষম কলহ হওয়াতে কে বা কাহারা যেন দেবীর মূর্তি ঘুরিয়ে দিল। মা মুখ ফিরিয়েছেন, একথা শুনে গিন্নির বুক ভেঙে গেল এবং মনোদুঃখে ভরা জ্যৈষ্ঠে অসংগত পরিমাণে কাঁঠাল খেয়ে

দাস্তবমি হয়ে তিনি মরে গেলেন।

৪

গিন্নি মরেই খালাস পেলেন, কিন্তু জ্যান্ত থাকার জ্বালা মরণ হতে বেশি। গিন্নির মৃত্যুতে যশোদার আন্তরিক দুঃখ হল। বয়স্ক মানুষ পাড়ায় মরলে বাসিনীর মতো সুবিন্যাসে কেউ কাঁদতে পারে না, বাসিনী এ বাড়ির পুরনো ঝি। কিন্তু যশোদার ভাতের থালাটি গিন্নির সঙ্গে বিসর্জন গেল, তাই যশোদা আরো সুবিন্যাসে কেঁদে সকলকে অবাক করে দিল।

বাসিনী কাঁদল, 'অ ভাগ্যিমানী মা! মাথার চুড়োটি খসতে কত্তা হয়ে সকলেরে যে আগলে রেকেছিলে মা! কার পাপে চলে গেলে মা গো! ওগো, আমি যে বন্নু, অত ক্যাটাল খেওনি, তা মোর কতা যে মোটে নিলে না গো মা!'

যশোদা বাসিনীকে দম নিতে সুযোগ দিল ও সেই বিরতিতে কেঁদে উঠল, কেন রইবে মাগো! ভাগ্যিমানী তুমি, পাপের সংসারে রইবে কেন বল গো মা! সিংহাসন পাতা ছিল তা যে তুলে ফেললে গো বউদিরা! গাচ যখন বলে ফল ধরবনি, সে যে পাপ গো! অত পাপ কি তুমি সইতে পার মাগো! তা বাদে সিংহবাহিনী যে মুক ফেরালে গো মা! বুঝিছিলে পুণ্যের পুরী পাপের পুরী হয়ে গেল, এ পুরীতে কি তুমি বাস কত্তে পার? কত্তা চলে যেতে তোমারো যে মন চলে গিইছিল গো মা! শরীলটা সংসারের দিকে চেয়ে ধরে রেখেছিলে বই তো নয়। অ বউদিরা! আলতা দিয়ে পায়ের ছাপ উটিয়ে রাখ গো! ও পায়ের ছাপ ঘরে রইলে লক্ষ্মী বাঁদা থাকবে গো! সকালে উঠে ওতে মাতা ঠেকালে ঘরে রোগ দুঃখ ঢুকবে না গো!'

শবদেহের পেছন-পেছন যশোদা কেদে-কেঁদে শ্মশানে গেল ও ফিরে এসে বলল, 'স্বচক্ষে দেখনু সগ্‌গ থেকে রথ নেমে এসে চিতার বুক থেকে গিন্নিমাকে নিয়ে ওপর-পানে চলে গেল।'

গিন্নির শ্রাদ্ধশান্তি চুকে গেলে বড় বউ যশোদাকে বললেন, 'বামুন দিদি! সংসারে তো ভাঙন ধরল। মেজ সেজ বেলেঘাটার বাড়িতে উইঠা যাইত্যাছে! রাঙা আর নতুন যাইত্যাছে মানিকতলা-বাগমারী। ছোট যাইব গিয়া আমাগো দক্ষিণেশ্বরের বাড়ি।'

'এখেনে কে থাকবে?'

'আমিই থাকুম। তবে গিয়া নিচতলা ভাড়া দিব হ্যায়। অহন সংসার গুটাইতে অইব। তোমার দুগ্ধে সবারে পাল্‌ছ, নিত্য সিধা গেছে। হ্যায় সন্তান দুধ ছারছে,

তবও আট বছর মা সিধা পাঠাইছে। উনি যা মন লয় তাই করছে। পোলারা কথা কয় নাই। কিন্তু অহন তো আর পারতাম না।'

'আমার কি হবে বড়বউদি ?'

'তুমি যদি আমার সংসারে পাক-সাক কর, তোমার প্যাট চলব। কিন্তু ঘরের হকলডির কি করবা ?'

'কি করব ?'

'তুমিই কও। জেয়ন্তে তুমি বারো সন্তানের মা! মাইয়াগুলান্ বিয়া অইয়া গিছে। পুলারা ত শুনি যাত্রী ডাকে, মন্দিরে ভোগ খায়, চাতালে পইড়া থাকে। বামুনও ত শুনি নকুলেশ্বর মন্দির ভালই জমাইছে। তোমার অভাব কিসের ?'

যশোদা চোখ মুছে বলল, 'দেখি! বামুনকে বলি।'

কাঙালীচরণের মন্দিরে এখন খুবই রমরমা। কাঙালী বলল, 'আমার মন্দিরে তুই কি করবি ?'

'নরেনের বোনঝি কি করে ?'

'সে মন্দিরের সোম্সার দেখে, রাঁধে-বাড়ে। তুই ঘরেই রাঁধিস না ক'দ্দিন, মন্দিরের উনুনো তুই ঠেলতে পারিস ?'

'ওবাড়ির সিধে উঠে গেল। সে কতা মাথায় ঢুকল ড্যাকরার ? খাবে কি ?'

নবীন বলল, 'সে তোকে ভাবতে হবে না।'

'এ্যাদ্দিন ভাবিয়েছিলে কেন ? মন্দিরে খুব দু'পয়সা হচ্ছে, তাই না ? সব জমিয়েছ আর আমার গতরজল করা ভাত খেয়েছ বসে বসে।'

'বসে বসে রাঁধত কে ?'

যশোদা হাত নেড়ে বলল, 'বেটাছেলে এনে দেয়, মেয়েছেলে রাঁধে-বাড়ে। আমার কপালে সকলই উলটো হইছিল। আমার ভাত খেয়েছ যখন, তখন আমাকে ভাত দেবে এখন। ন্যায্য কথা।'

কাঙালী ফস্ করে বলল, 'কোত্থেকে ভাত যোগাড় করলি ? হালদার-বাড়ি তোর কপালে জুটত ? আমার ঠ্যাং কাটা গেল বলেই না তোর কপালে ওবাড়ির দোর খুলল ? কত্তা তো আমাকেই সব দেবেথাবে বলিছিল। সব ভুলে বসে আছিস মাগী ?'

'তুমি মাগী না আমি মাগী ? বউয়ের গতরে খায়, সে আবার বেটাছেলে!'

একথা থেকে দুজনের তুমুল কলহ বেধে গেল। দুজনে দুজনকে শাপশাপান্ত করল। অবশেষে কাঙালী বলল, 'তোর মুখ আর দেখব না, যাঃ!'

'না দেখলে না দেখবে।'

যশোদাও রেগে ঘর ছেড়ে বেরলো। ইতিমধ্যে পাণ্ডাদের শরিকে-শরিকে সট হয়েছে, ঠাকুরের মুখ ফেরাতে হবে, নইলে সমূহ সর্বনাশ। সে জন্যে মন্দিরে মহা ধুমধামে প্রায়শ্চিত্ত পুজো হচ্ছে। যশোদা সেখানে হত্যা দিতে গেল। দুঃখে তার প্রৌঢ়, দুগ্ধহীন, স্থূল বুক দুটি ফেটে যাচ্ছে। সিংহবাহিনী তার দুঃখ বুঝে পথ বাৎলে দিন।

তিনদিন যশোদা চাতালে পড়ে থাকল। নতুন হাওয়া সম্ভবত সিংহবাহিনীও খেয়েছেন। তিনি মোটেই স্বপ্নে দেখা দিলেন না। উপরন্তু তিনদিন উপোসী থেকে কাঁপতে-কাঁপতে উঠে যশোদা যখন ঘরে গেল, ছোট ছেলে বলে গেল, 'বাপ মন্দিরে থাকবে। আমাকে আর নবাকে বলেছে তোরা ঘণ্টা বাজাবি, রোজ পেসাদ পাবি, পয়সা পাবি।'

'বটে! তা বাপ কোথা!'

'শুয়ে আছে। গোলাপী মাসি বাবার পিঠের ঘামাচি গেলে দিচ্ছে। বলল, তোরা পয়সা দিয়ে ল্যাবেঞ্চুস খেগে যা! আমরা তাই তোকে বলতে এনু।'

যশোদা বুঝল, হালদার-বাড়িই নয়, কাঙালীর কাছেও তার দরকার ফুরিয়েছে। জলবাতাসা খেয়ে সে নবীনকে নালিশ করতে গেল। নবীনই সিংহবাহিনীর প্রতিমা হিঁচকে বিমুখ করেছিল ও অন্য পাণ্ডাদের সঙ্গে বাসন্তী পূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা ও শারদ দুর্গাপূজার বিশেষ রোজগার বিষয়ে ফয়সালা হবার পর পুনর্বার প্রতিমাকে হিঁচড়ে মুখ ফিরিয়ে সে ব্যথিত নড়ায় পাকি মদ মালিশ করে গাঁজা টেনে বসেছিল এবং স্থানীয় ভোটের ক্যাণ্ডিডেটের উদ্দেশে বলছিল, 'পুজো দিলি নে তো? মায়ের মাহাত্ম্য আবার ফিরেছে। এবার দেখে নোব কেমন করে জিতিস!'

মন্দিরের আওতায় থাকলে এ দশকেও কি কি অলৌকিক ঘটনা ঘটে, নবীনই তার প্রমাণ। দেবীর মুখ সে নিজেই ফিরিয়েছিল এবং নিজেই বিশ্বাস করেছিল পাণ্ডারা ভোট-চাই দলসকলের মতো জোট বাঁধছে না বলে মা বিমুখ হয়েছেন। এখন মার মুখ ফেরাবার পর তার আবার ধারণা জন্মাল, মা নিজে ফিরেছেন।

যশোদা বলল, 'কি বকছ?'

নবীন বলল, 'মায়ের মাহাত্ম্যের কথা কইছি।'

যশোদা বলল, 'নিজে ঠাকুরের মুখ ঘুরিয়েছিলে তা জানি না ভেবেছ?'

নবীন বলল, 'চুপ কর যশি। ঠাকুর শক্তি দিলে, বুদ্ধি দিলে, তবে না আমা হতে কাজটি হল?'

'তোমাদের হাতে পড়ে মায়ের মাহাত্ম্য গেল!'

'মাহাত্ম্যি গেল! গেলে পরে পাখা ঘুরছে, পাখার নিচে বসে আছিস, তা হল

কি করে ? চাতালের ছাতে ইলেটিরি পাখা এর আগে ঘুরেছে ?'

'তা তো হল। এখন আমার কপাল পোড়ালে কেন, তাই কও দিখি ? আমি তোমার কি করিছি ?'

'কেন ? ক্যাঙালী তো মরেনি ?'

'মরবে কেন ? মরার বাড়া হয়েছে।'

'কি হল ?'

যশোদা চোখ মুছে ভারি গলায় বলল, 'এতগুলে পেটে ধরিছি, সেই বলে বাবুদের বাড়ি বাঁদাধরা দুধ-মা ছিলাম। জান তো সবই। কোনোদিন কুপথে হাঁটিনি।'

'আই ব্বাস্! তুই হলি গে মায়ের অংশ।'

'মা তো ভোগেরাগে রইল। অংশ যে অন্ন বিনে মরতে বসেছে। হালদারবাড়ি তো হাত ওঠালে।'

'তুই বা ক্যাঙালীর সঙ্গে ঝগড়া করতে গেলি কেন ? বেটাছেলে ভাতের খোঁটা সয় ?'

'তুমি বা তোমার বোনঝিকে হোথা গছালে কেন ?'

'সে ঠাকুরের লীলে হয়ে গেল। গোলাপী যেয়ে মন্দিরে ধন্না দিত। তা ক্রেমে-ক্রেমে ক্যাঙালী বুঝল ও হচ্চে ঠাকুরের ভৈরব আর গোলাপী ওর ভৈরবী।'

'ভৈরবী ! খ্যাংরা মেরে ওর হাত হতে সোয়ামী ছাড়িয়ে আনতে পারি এখনি।'

নবীন বলল, 'নাঃ ! সে আর হতে হচ্চে না। ক্যাঙালী পুরুষ ছেলে, ওর আর তোতে মন ওঠে ? তা বাদে গোলাপীর ভাইটে সাক্ষাৎ গুণ্ডা, সে হোথা যেয়ে পওরা দিচ্ছে। আমাকেই গেট আউট করে দিলে। আমি যদি দশ ছিলিম টানি, সে টানে বিশ ছিলিম। ক্যাঁকালে লাথি মেরে দিলে। যেয়েছিলাম তোর কথা বলতে। ক্যাঙালী বললে, ওর কতা আমায় বল না। ভাতার চেনে না, বাবু-বাড়ি চেনে। বাবু-বাড়ি ওর ইষ্টিদেবতা, সেথা যাক গা !'

'তাই যাব !'

বলে সংসারের অবিচারে পাগল-পাগল যশোদা ঘরে ফিরল। কিন্তু শূন্য ঘরে মন টেকে না। দুধ থাক না থাক, কোলের কাছে একটা ছেলে না থাকলে ঘুম আসে না। মা হওয়া বড় ভীষণ নেশা। সে নেশা দুধ শুকোলেও কাটে না। অগত্যা মান খুইয়ে যশোদা হালদারনীর কাছে গেল। বলল, 'রাঁধব বাড়ব, মাইনে দেবে দিও, না দেবে না দিও। হেথা থাকতে দিতে হবে। মিনসে নিজের মন্দিরে থাকতেছে। ছেলেগুলো কি বেইমান মা! সেথা গিয়ে জুটেছে। কার তরে ঘর

আটকে রাখব মা ?'

'তা থাকো। তুমি ছেলেদের দুধ দিছ, তায় বামুন। তা থাক। কিন্তু দিদি, থাকতে তোমার কষ্ট হইব। ওই বাসিনীদের লগে এক ঘরে থাকবা। ক্যারো, লগে ঝগড়াবিবাদ কইর না। বাবুর মাথা গরম। তায় সেজ পুলা বুঝে গিয়া সেই দেশী মেয়ে বিয়া বসছে বইলা ম্যাজাজ মন্দ। ক্যাচাকেচি হইলে তাই চটব।'

সন্তান হবার ক্ষমতাই যশোদার লক্ষ্মী ছিল। সেটি খতম হতেই তার কপালে এত-এত দুর্গতি ঘটল। পাড়ার মায়ের ভক্তবাড়িগুলির শ্রদ্ধেয়া দুগ্ধবতী সতীসাধ্বী যশোদার এখন পড়তির সময়। মানুষের স্বভাবধর্ম হল উঠতির কালে অসংগত অহমিকা হয় এবং পড়তির কালে 'অবস্থা বুঝে নিচু হয়ে থাকি'—এ সারেগুার আসে না মনে। ফলে মানুষ তুচ্ছ জিনিস নিয়ে আগের দাপে দাঁমড়াতে যায় ও ব্যাঙের লাথি খায়।

যশোদার কপালেও তাই হল। বাসিনীরা তার পা ধোয়া জল খেত। এখন বাসিনী অক্লেশে বলল, 'তুমি তোমার বাসন মেজে নেবে। তুমি কি মনিব, যে তোমার এঁটো বাসন মাজব ? তুমিও মনিবের চাকর, আমিও।'

'জানিস আমি কে ?'—বলে গর্জে উঠতে যশোদা বড় বউয়ের মুখ শুনল, 'এই লিগাই আমার ডর ছিল খুব। মায়ে অরে মাথায় উঠাইয়া দিয়া গেছে। দেখ বামুন দিদি ! ডাইকা আনি নাই, সাইধা আসছ, অশান্তি কইর না।'

যশোদা বুঝল, এখন আর তার টুঁ কথাটিও কেউ শুনবে না। মুখ বুজে সে রাঁধল বাড়ল, এবং বিকেলে মন্দিরের চাতালে গিয়ে কাঁদতে বসল। মন খুলে কাঁদতেও পারল না। নকুলেশ্বর মন্দির থেকে আরতির বাজনা শুনে ও চোখ মুছে উঠে এল। মনে মনে বলল, 'এবার দয়া কর মা ! শেষে কি টিনের বাটি হাতে পতে বসতে হবে ? তাই চাও ?'

হালদার-বাড়ি ভাত রেঁধে আর মায়ের কাছে মনোদুঃখ নিবেদন করে দিন কাটতে পারত। কিন্তু যশোদার কপালে তা সইল না। যশোদার দেহ যেন এলে পড়ল। কেন কিছুতে ভাল লাগে না, যশোদা বোঝে না। মাথার ভেতর বিভ্রম সব। রাঁধতে বসলে মনে হয় সে এ বাড়ির দুধ-মা। কস্তাপেড়ে শাড়ি পরে সে সিধে নিয়ে ঘরে যাচ্ছে। স্তন দুটি বড় শূন্য লাগে, যেন বরবাদ। স্তনবৃন্তে শিশুর মুখ নেই, এ তার জীবনে ঘটবে বলে ভাবেনি।

খুব অন্যমনস্ক হয়ে গেল যশি। ভাত তরকারি প্রায় সবই বেড়ে দেয়, নিজে খেতে ভুলে যায়। মাঝে মাঝে নকুলেশ্বর শিবের উদ্দেশে বলে, 'মা না পারে, তুমিই আমায় সরিয়ে নাও। আর পারি না।'

শেষে বড় বউয়ের ছেলেরাই বলল, 'মা! দুধ-মার শরীর কি অসুস্থ? কেমন যেন হইয়া গেছে?'

বড় বউ বলল, 'দেখি!'

বড়বাবু বলল, 'দেখ! বামুনের মাইয়া, কিছু অইলে আমাগো পাপ অইব।'

বড় বউ জিগ্যেস করতে গেল। ভাত চড়িয়ে যশোদা রান্নাঘরেই আঁচল পেতে শুয়েছিল। বড় বউ তার আদুড় গা দেখে বলল, "বামুন দিদি! তোমার বাঁও মাইয়ের উপরটা লাল মতো দেখায় ক্যান? ইশ! গেদগা লাল!'

'কি জানি। ভেতরে যেন পাতর ঠেলে উঠেচে। বড় শক্ত, ঢিল পারা।'

'কি অইল?'

'কি জানি? এতগুলোকে দুধ দিইছি, তাতেই হয়ত অমন ধারা হল?'

'ধুর! ঠুন্‌কা হয়, মাইঠোস হয় দুগ্ধ থাকলে। তোমার তো কুলেরটা দশ বছইরা।'

'সেটা নেই গো! তার উপরেরটা আছে। সেটা তো আঁতুড়ে গেচে। গেছে, ভাল গেছে। পাপের সংসার!'

'রও কাল ডাক্তার আইব নাতিরে দেখতে। তারে জিগামু। আমি য্যান্ ভাল দেখি না।'

যশোদা চোখ বুজে বলল, 'যেন পাতরের মাই গো, পাতর পোরা। আগে শক্ত গুলিটা সরত নড়ত, এখন আর নড়ে না, সরে না!'

'ডাক্তাররে দেখামু।'

'না বউদিদি, বেটাছেলে ডাক্তারের কাছে আমি গা আদুড় করতে পারব না।'

রাতে ডাক্তার আসতে ছেলেকে সামনে রেখে বড় বউ জিগ্যেস করল। বলল, 'ব্যথা নাই, জ্বালা নাই, কিন্তু হ্যায় জানি আলাইয়া পড়ত্যাছে।'

ডাক্তার বললেন, 'জেনে আসুন দিকি, কুঁচকে গেছে না কি নিপ্‌ল, বগলের নিচটা বিচিফোলা মতো কি না!'

'বিচিফোলা' শুনে বড় বউয়ের মনে হল ছিঃ! কি অসভ্য! তারপর সরজমিনে তদন্ত সেরে এসে বললেন, "কয়, অনেকদিন ধইরাই আপনে যা যা বললেন, তা হইছে।'

'বয়স কত?'

'বড় ছেলের বয়স ধল্লে পরে পঞ্চান্ন হবে।'

ডাক্তার বললেন, 'ওষুধ দেব।'

বেরিয়ে গিয়ে বড়বাবুকে বললেন, 'আপনার কুকের ব্রেস্টে কি হয়েছে

শুনলাম। আমার মনে হয় ক্যানসার হাসপাতালে নিয়ে দেখানো ভাল। চোখে দেখিনি। তবে যা শুনলাম, তাতে ম্যামারি গ্ল্যাণ্ডে ক্যানসার হতে পারে।'

বড়বাবু ষোড়শ শতকে সেদিন অব্দি ছিলেন। অতি ইদানীং তিনি বিংশ শতকে এসেছেন। তেরটি সন্তানের মধ্যে মেয়েদের বিয়ে দিয়েছেন এবং ছেলেরা যে যার পথে মতে বড় হচ্ছে, বড় হয়েছে। কিন্তু এখনো তাঁর মগজের বুদ্ধি-কোষ অষ্টাদশ এবং প্রাক্-রেনেসাঁস উনিশ শতকায় অজ্ঞানের অন্ধকারে ঢাকা। আজও তিনি বসন্তের টিকা নেন না ও বলেন, 'বসন্ত হয় ছুডলোকের। আমার টিকা লইতে লাগত না। উচ্চ বংশ, দেবদ্বিজে ভক্তিমান বংশে ও রোগ হয় না।'

'ক্যানসার' শুনে তিনি উড়িয়ে দিলেন ও বললেন, 'হঃ! হইলেই হইল ক্যানসার! অতই সোজা! কি শুনতে কি শুনছেন, যান, মলম দিলেই সারব। আপনের কথায় আমি বামুনের মাইয়ারে হাসপাতালে পাঠাইতে পারব না।'

যশোদাও শুনেমেনে বলল, 'হাসপাতালে যেতে পারবনি বাপু। তার চে আমায় মত্তে বল। ছেলে বিয়োতে হাসপাতালে গেলাম না, এখন যাব? হাসপাতালে গেছল বলে তো মড়িপোড়া ঠ্যাং দুটো খুঁতো করে ফিরে এল!'

বড় বউ বলল, 'সিদ্ধমলম আইনা দেই লাগাও। সিদ্ধমলমে ঠিক আরাম হইব। গুপ্ত ফোড়া মুখ লইয়া ফাটিব।'

সিদ্ধমলমে কোনোই কাজ হল না এবং ক্রমে যশোদা খাওয়াদাওয়া ছেড়ে হীনবল হল। বাঁ দিকে আঁচল রাখতে পারে না। কখনো মনে হয় জ্বালা, কখনো মনে হয় ব্যথা। অবশেষে চামড়া ফেটে ফেটে ঘা দেখা দিল। যশোদা বিছানা নিল।

ভাবগতিক দেখে বড়বাবুর ভয় হল, বুঝি তার ভিটেতে বামুন মরে। যশোদার ছেলেদের ডেকে সে ধমকে বলল, 'যা হয়, এতদিন খাওয়াইছে, এখন হ্যায় যে অসুখে মরে। তোরা নিয়া যা! হকলডি থাকতে হ্যায় কায়েতের ভিটায় মরব?'

কাঙালী একথা শুনে বড়ই কাঁদল ও যশোদার প্রায়ান্ধকার ঘরে এসে বলল, 'বউ! তুই সতীলক্ষ্মী! তোকে হেনস্তা করার পর দু বছরের মধ্যে মন্দিরের বাসন চুরি হল, আমার পিঠে ফোড়া হয়ে ভুগলাম, গোলাপী হারামজাদী ন্যাপলাটাকে ভুলিয়ে বাক্স ভেঙে সব্বস্ব নিয়ে তারকেশ্বরে দোকান দিলে। চ, তোরে আমি মাথায় করে রাখব।'

যশোদা বলল, 'বাতিটা জ্বাল।'

কাঙালী বাতি জ্বালল।

যশোদা অনাবৃত ও ঘা-বিজবিজে বামস্তন দেখিয়ে বলল, 'ঘা দেখেছ? ঘায়ের গন্ধ কেমন জান? এখন নিয়ে যেয়ে কি করবে? নিতে বা এলে কেন?'

'বাবু ডাকলে।'

'বাবু তবে রাখতে চাইছে না।'—যশোদা নিশ্বাস ফেলল, ও বলল, 'আমারে দিয়ে কোনো সুসার হবেনি জান? নিয়ে যেয়ে করবে বা কি?'

'তা হোক, কাল নে যাব। আজ ঘর পক্কের করে রাখি। কাল নিয্যস নে যাব।'

'ছেলেরা ভাল আচে? মাঝে মধ্যে নবলে আর গৌরটা আসত, তাও আসে না।'

'সব বেটা স্বার্থপর। আমার ইয়েতে জন্ম তো? আমার মতোই অমানুষ।'

'কাল আসবে?'

'আসব—আসব—আসব।'

যশোদা সহসা হাসল। সে হাসি বড়ই বুকে দাগা-দেওয়া ও প্রাচীন স্মৃতির কথা মনে-পড়ানো।

যশোদা বলল, 'হ্যাঁ গো মনে আচে?'

'কি মনে থাকবে বউ?'

'এই মাই নিয়ে তুমি কত সোহাগ কত্তে? নইলে তোমার ঘুম হতো না? কোল খালি হতো না, এটা বোঁটা ছাড়ে তো ওটা ধরে, তায় বাবুর বাড়ির ছেলে-গুলো! কি করে পাত্তাম, তাই ভাবি!'

'সব মনে আছে বউ!'

কাঙালীর এ কথাটি এ মুহূর্তে সত্য। যশোদার ক্লিষ্ট, শীর্ণ, কাতর চেহারা দেখে কাঙালীর স্বার্থপর দেহ ও প্রবৃত্তি এবং উদরসর্বস্ব চেতনাও অতীত স্মরণে মমতা-কাতর হল। সে যশোদার হাতটি ধরল ও বলল, 'তোর জ্বর?'

'জ্বর তো হয়ই। আমি ভাবি ঘায়ের তাড়সে?'

'এমন পচা গন্ধ কোত্থেকে আসছে?'

'এই ঘা হতে।' যশোদা চোখ বুজে বলল।

তারপর বলল, 'তুমি বরং সন্নিসী ডাক্তারকে দেখিও। তিনি হোমোপাথি দিয়ে গোপালের টাইফয়েড সারিয়েছিল।'

'ডাকব। কালই নে যাব তোকে।'

কাঙালী চলে গেল। সে যে বেরিয়ে গেল, ক্রাচের খটখট শব্দ যশোদা শুনতে পেল না। চোখ বুজে, কাঙালী ঘরে আছে জ্ঞানে নিস্তেজে বলল, 'দুধ দিলে মা

হয়, স—ব মিছে কতা ! না নেপাল-গোপালরা দেখে, না বাবুর ছেলেরা উঁকি মেরে এট্টা কতা শুধোয় ।'

ঘা-গুলি শত মুখে, শত চোখে যশোদাকে ব্যঙ্গ করতে থাকল। যশোদা চোখ মেলে বলল, 'শুনচ ?'

তারপরই সে বুঝল কাঙালী চলে গেছে।

রাতেই সে বাসিনীকে দিয়ে লাইফবয় সাবান আনাল ও ভোর হতে সাবান নিয়ে নাইতে গেল। গন্ধ, কি দুর্গন্ধ! বেড়াল-কুকুর ডাস্টবিনে পচলে এমন গন্ধ হয়। যশোদা চিরকাল, বাবুদের ছেলেরা স্তনবৃন্ত মুখে দেবে বলে কত যত্নে তেলে-সাবানে স্তন দুটি মার্জনা করেছে। সেই স্তন তার এমন বেইমানি করল কেন ? সাবানের ঝাঁঝে চামড়া জ্বলে ওঠে। যশোদা তবু সাবান দিয়ে স্নান করে এল। মাথা ঝিমঝিম করে, সব যেন আঁধার আঁধার। যশোদার শরীরে আগুন, মাথায় আগুন। কালো মেঝেটি বড় ঠাণ্ডা। যশোদা আঁচল বিছিয়ে শুল। স্তনের ভার সে দাঁড়িয়ে সইতে পারছিল না।

সেই যে শুল যশোদা, জ্বরে অজ্ঞান ও বিবশ। কাঙালী ঠিক সময়েই এল ; কিন্তু যশোদাকে দেখে সে বুদ্ধি হারিয়ে ফেলল। অবশেষে নবীন এসে ধমকে বলল, 'এরা কি মানুষ ? সবগুলো ছেলেকে দুধ দিয়া বাঁচাল তা এট্টা ডাক্তার ডাকে না ? হরি ডাক্তারকে ডেকে আনছি।'

হরি ডাক্তার দেখেই বললেন, 'হাসপাতাল।'

এমন রুগী হাসপাতালে নেয় না। কিন্তু বড়বাবুর চেষ্টায় ও সুপারিশে যশোদা হাসপাতালে ভর্তি হল।

'কি হয়েচে ? অ ডাক্তারবাবু, কি হয়েচে'—কাঙালী বালকের মতো কেঁদে জিগ্যেস করল।

'ক্যানসার।'

'মাইয়ে ক্যানসার হয় ?'

'নইলে হল কি করে ?'

'নিজের কুড়িটা, বাবুদের বাড়ির তিরিশটা ছেলে—খুব দুধ ছিল ডাক্তার-বাবু—'

'কি বললে ? কতজনকে ফীড করেছে ?'

'তা পঞ্চাশ জনা তো হবে।'

'প—ঞ্চা—শ—জ—ন ?'

'হ্যাঁ বাবু।'

'ওর কুড়িটা সন্তান হয়েছে ?'

'হ্যাঁ বাবু।'

'গড্ !'

'বাবু !'

'কি ?'

'এত মাই খাওয়াত বলেই কি—?'

'তা বলা যায় না ক্যানসার কেন হয়, তা বলা যায় না। তবে বুকের দুধ যারা অতিরিক্ত খাওয়ায়—আগে বোঝনি ? একদিনে তো এমনটা হয়নি ?'

'আমার কাছে ছিল না বাবু। ঝগড়া করে—'

'বুঝেছি।'

'কেমন দেখছেন ? ভাল হবে তো ?'

'ভাল হবে ! কদিন থাকে সেই দেখ। এনেছ তো শেষ অবস্থায়। এ অবস্থা থেকে কেউ বাঁচে না।'

কাঙালী কাঁদতে কাঁদতে চলে এল। বিকেলে, কাঙালীর কান্নাকাটিতে বিপর্যস্ত হয়ে বড়বাবুর মেজছেলে ডাক্তারের কাছে গেল। যশোদার জন্যে তার সামান্যই উৎকণ্ঠা ছিল, কিন্তু বাবা হুড়কো দিলেন—সে বাবার টাকার ওপর নির্ভর করে।

ডাক্তার তাকে সব বুঝিয়ে বললেন। একদিনে হয়নি, বহুদিন ধরে হয়েছে। কেন হয়েছে ? তা কেউই বলতে পারে না। বুকের ক্যানসার কি ভাবে বোঝা যাবে ? স্তনের ওপর দিকে ভেতরে শক্ত গুলি, সেটা সরানো চলে। তারপর ক্রমে ভেতরের গুলি শক্ত ও বড় ও জমাট চাপের মতো হল। চামড়া কমলারঙা হওয়া প্রত্যাশিত, যেমন প্রত্যাশিত স্তনবৃন্তের সংকোচন। বগলের নিচে গ্ল্যাণ্ডটি আঙুরে উঠতে পারে। আল্সারেশন, অর্থাৎ ঘা যখন হল, তখন বলা চলে শেষ অবস্থা। জ্বর ? সেটা দ্বিতীয় বা তৃতীয় পর্যায়ে পড়বে গুরুত্বের দিক থেকে। শরীরে ঘা জাতীয় কিছু থাকলে জ্বর হতেই পারে। সেটা সেকেণ্ডারি।

এতগুলি বিশেষজ্ঞ-কথা শুনে মেজছেলের মাথা গুলিয়ে গেল। সে বলল, 'বাঁচব ?'

'না।'

'কদ্দিন কষ্ট পাইব ?'

'মনে হয় না বেশি দিন।'

'কিছুই যখন করার নাই, কি চিকিৎসা করবেন ?'

'পেইনকিলার, সেডেটিভ, জ্বরের জন্যে অ্যান্টিবায়োটিক। শরীরও তো ডাউন

খুব, খুবই।'

'খাওয়া ছাইরা দিছিল।'

'কোনো ডাক্তার দেখান নি ?'

'দেখ্ছিল।'

'বলেন নি ?'

'বলছিল।'

'কি বলেছিলেন ?'

'ক্যানসার অইতে পারে। আসপাতালে লইতে বলছিল। হ্যায় যাইতে চায় নাই।'

'চাইবে কেন ? মরবে যে !'

মেজছেলে বাড়ি ফিরে এসে বলল, 'তখন যে অরুণ ডাক্তার কইল ক্যানসার হইছে, তখন লইলেও বাঁচত বুঝি !'

তার মা বলল, 'অতই যদি বুঝিস তবে লইস নাই ক্যান ? আমি কি বাধা দিছিলাম ?'

মেজছেলে ও তার মার মনের কোথাও অজানা পাপবোধ ও অনুশোচনা পচা ও আবদ্ধ জলে বুদ্বুদের মতো জাগছিল ও নিমেষে লয় পাচ্ছিল।

পাপবোধ বলছিল—আমাদের কাছেই আছিল, কুনদিন দেখি নাই উকি মাইরা, কবে বা হছিল রোগ, গুরুত্ব দেই নাই। হ্যায় তো আবুইদা মানুষ, আমাদের এত জনরে পালছিল, দেখি নাই অরে। অহন হকলে রইতে আসপাতালে গিয়া মরতাছে, পুলা এতগুলা, স্বামী আছে, আমাদের আকড়াইয়া ধরছিল যহন, তহন আমাদেরই—! এইও তাজা শরীর আছিল, দুধ খাইরাইত ঠিকর দিয়া, কুনদিন ভাবি নাই হেয়ার এই রোগ অইব।

পাপবোধের লয় বলছিল—নিয়তি কে খণ্ডাইতে পারে ? হেয়ার কপালে আছে ক্যানসারে মরণ—ঠেকাইব ক্যাডা ? আমাদের এহানে মরলে দোষ অইত—হেয়ার স্বামীপুত্র কইত কি কইরা মরল ? অহন হেই দোষ হইতে বাচছি। কেও কিছু বলতে পারত না।

বড়বাবু ওদের আশ্বস্ত করে বলল, 'অহন অরুণ ডাক্তার কইতাছে ক্যানসার হইলে কেও বাচে না। বামুন দিদির যেই ক্যানসার হইছে তা অইলে মাই কাইটা ফালায়, জরায়ু বাদ দেয়, হেয়ার পরও মাইন্ষে ক্যানসারে মরে। দেহ, বাবায় বামুন বইলা বড় ভক্তি দিয়া গিছে—বাবার দয়ায় আমরা বাইচা আছি। ভিটায় বামুন-দিদি মরলে প্রায়শ্চিত্ত করতে অইত।'

যশোদার চেয়ে কম আক্রান্ত রোগী কত আগে মরে, যশোদা ডাক্তারদের আশ্চর্য করে প্রায় এক মাস টিকে রইল হাসপাতালে। প্রথম প্রথম কাঙালী, নবীন, ছেলেরা যাতায়াত করেছিল বটে, কিন্তু যশোদা একই রকম আছে, কোমাটিক, জ্বরে ভাজা-ভাজা, আচ্ছন্ন। স্তনের ক্ষতগুলি ক্রমেই বড় বড় হাঁ করছে এবং স্তনটির চেহারা এখন এক নগ্ন ক্ষতসদৃশ। অ্যান্টিসেপটিক লোশন নিষিক্ত পাতলা গজ কাপড়ে সেটি আবৃত, কিন্তু গলিত মাংসের তীব্র গন্ধ ঘরের বাতাসে ধূপের ধোঁয়ার মতো নীরবে ও চক্রাকারে ছড়াচ্ছে সর্বদা। তা দেখে কাঙালীদের উৎসাহে ভাঁটা পড়ল ও ডাক্তারও বললেন, 'সাড়া দিচ্ছে না? না দিলেই তো ভাল। অজ্ঞানেই সওয়া যায় না, সজ্ঞানে কেউ ঐ যমযন্ত্রণা সইতে পারে?'

'কিছু জানছে, আমরা আসি যাই বলে?'

'বলা কঠিন।'

'খাচ্চে কিছু?'

'নল দিয়ে।'

'তাতে মানুষ বাঁচে?'

'এখন যে খুব—'

ডাক্তার বুঝলেন, যশোদার এ অবস্থার জন্য তাঁর মনে অহেতুক রাগ হচ্ছে। যশোদার ওপর কাঙালীর ওপর, যেসব মেয়েরা ব্রেস্ট-ক্যানসারের লক্ষণকে যথেষ্ট সিরিয়াসলি নেয় না এবং আখেরে বীভৎস নরক যন্ত্রণায় মরে, তাদের ওপর। ক্যানসার, রোগী ও ডাক্তারকে নিয়ত পরাজিত করে। একটি রোগীর ক্যানসার মানে রোগীর মৃত্যু এবং বিজ্ঞানের পরাজয়, ডাক্তারেব তো বটেই। সেকেণ্ডারি সিম্পটমের ওষুধ দেওয়া যায়, খাওয়া বন্ধ হলে ড্রিপ দিয়ে শরীরকে গ্লুকোজ খাওয়ানো চলে, শ্বাস নিতে ফুসফুস অপারগ হলে অক্সিজেন—কিন্তু ক্যানসারের অগ্রগমন, প্রসারণ, ব্যাপ্তি, হত্যা, অব্যাহত থাকে। ক্যানসার শব্দটি এক সাধারণ সংজ্ঞা, এ সংজ্ঞা দ্বারা শরীরের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ম্যালিগ্‌নান্ট গ্রোথ বোঝায়। 'দি গ্রোথ ইজ পার্পাসলেস, প্যারাসাইটিক, অ্যান্ড ফ্লারিশেস অ্যাট দি একসপেন্‌স অফ দি হিউম্যান হোস্ট।' এর চারিত্র্যবৈশিষ্ট্য হল, সংক্রমিত শরীরাংশকে ধ্বংসকরণ, মেটাস্‌টাশিয়া দ্বারা ব্যাপ্তি, রিমুভালের পর প্রত্যাবর্তন, টক্‌সিমিয়া সংঘটন।

কাঙালী তার প্রশ্নের সদুত্তর না পেয়ে বেরিয়ে এল। মন্দিরে এসে সে নবীন ও ছেলেদের বলল, 'আর যেয়ে লাভ নেই। চিনতে পারে না, চোখ খোলে না, জানতে পারে না। ডাক্তার যা পারে কত্তেছে।'

নবীন বলল, 'যদি মরে যায় ?'

'বড়বাবুর টেলিফোন নম্বর আচে, বলবে।'

'ধর যদি তোমারে দেকতে চায়। সতীলক্ষ্মী বউ তোমার ক্যাঙালী ! কে বলবে এতগুনোর মা ! শরীর দেকলে—তা কোনো দিকে হেলেনি, চায়নি।

বলতে বলতে নবীন গুম্ মেরে গেল। বস্তুত, অচৈতন্য যশোদার ক্ষতাক্রান্ত স্তন দেখার পর তার গাঁজা-চরস-মদ জনিত ঘোলাটে মাথায় বহু দার্শনিক চিন্তা ও দেহতত্ত্বের কথা মিথুনমত্ত ঢোঁড়া সাপের মতো মন্থর খেলা করে। যেমন,—ওর জন্যেই এত আকুলি-ব্যাকুলি ছিল ?—সেই মনমাতানো বুকের এই পরিণাম ? হোঃ ! মানবদেহ কিস্সু নয়। তার তরে পাগল হয় যে সেও পাগল।

কাঙালীর এত কথা ভাল লাগল না। যশোদার প্রতি তার মন থেকেই রিজেকশান এসে গিয়েছিল। সেদিন হালদার-বাড়ি যশোদাকে দেখে মন সত্যিই কাতর হয় ও হাসপাতালে নেবার পরও ব্যাকুলতা থাকে। কিন্তু সে অনুভূতি ঠাণ্ডা মেরে আসছে এখন। ডাক্তার যখনি বলেছে যশোদা বাঁচবে না, সে মন থেকে যশোদাকে প্রায় অকষ্টে বাদ দিয়েছে। তার ছেলেরাও তারই ছেলে। তা ছাড়া মা তাদের কাছে অনেকদিনই দূরের মানুষ হয়ে গেছে। মা মানে চুড়ো করে বাঁধা চুল, ধপধপে কাপড়, প্রবল ব্যক্তিত্ব। হাসপাতালে যে শুয়ে আছে. সে অন্য কেউ, মা নয়।

স্তনের ক্যানসারে ব্রেন কোমাটোজ হয়, যশোদার বেলা সেটি মুশকিল-আসান হল।

সে যে হাসপাতালে এসেছে, হাসপাতালে আছে, তা বুঝল যশোদা এবং এও বুঝল, এই যে বিবশকারী ঘুম, এ ওষুধের ঘুম। তাতে খুব স্বস্তি হল তার। এবং দুর্বল ও আক্রান্ত, আচ্ছন্ন মস্তিস্কে মনে হল, হালদার-বাড়ির কোনো ছেলেটা কি ডাক্তার হয়েছে ? নিশ্চয় তার দুধ খেয়েছে বলে এখন দুধের ঋণ শুধছে ? কিন্তু ওবাড়ির ছেলেরা তো স্কুল না পেরোতে কারবারে ঢোকে ! যেই হোক, যারা এত করছে তারা বুকের দুর্গন্ধময় উপস্থিতিটা থেকে তাকে মুক্তি দেয় না কেন ? কি দুর্গন্ধ, কি বেইমানি ? এই স্তনকে সে ভাতের যোগানদার জেনে নিয়ত গর্ভ ধরে দুধে ভরে রাখত। স্তনের কাজই দুধ ধরা ! কত গন্ধসাবানে স্তন মেজে পরিষ্কার রাখত, বড্ড ভারি ছিল বলে জামা পরেনি যৌবনেও।

সেডেশান কমে এলেই যশোদা চেঁচিয়ে ওঠে, 'আঃ ! আঃ ! আঃ !'—এবং ব্যাকুল ঘোলাটে চোখে নার্স ও ডাক্তারকে চায়। ডাক্তার এলে সাভিমানে বিড়বিড় করে বলে, 'দুধ খেয়ে এত বড়টা হলে, এখন এমন কষ্ট দিচ্ছ ?'

ডাক্তার বলে, 'বিশ্বসংসারে দুধ-ছেলে দেখছে!'

আবার ইঞ্জেকশন ও আবার নিদ্রাচ্ছন্ন অসাড়তা। যন্ত্রণা, ভীষণ যন্ত্রণা, অ্যাট দি এক্সপেন্স অফ দি হিউম্যান হোস্ট ক্যানসার সংক্রমিত হচ্ছে। ক্রমে যশোদার বাম স্তন ফেটে আগ্নেয়গিরির ক্রেটার-সদৃশ হল। পুতিগন্ধে কাছে যেতে কষ্ট হয়।

শেষে এক রাতে, যশোদা বুঝল তার পা ও হাত ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। ও বুঝল এবার মৃত্যু আসছে। চোখ খুলতে পারল না যশোদা, কিন্তু বুঝল, কেউ কেউ তার হাত দেখছে। সূচ বিঁধল বাহুতে। ভেতরে শ্বাসের কষ্ট। হতেই হবে। কারা দেখছে? তারা কি তার আপন কেউ? যাদের পেটে ধরেছিল বলে দুধ দেয়, ভাতের জন্যে যাদের দুধ দেয়, যশোদার মনে হল সে তো বিশ্বসংসারকে দুধ দিয়েছে, তবে সে কি একা-একা মরতে পারে? যে ডাক্তার রোজ দেখছে সে, যে ওর মুখে চাদর টেনে দেবে সে, যে ওকে ট্রলিতে তুলবে সে, যে ওকে শ্মশানে নামাবে সে, যে ওকে চুল্লিতে দেবে সে-ডোম, সবাই তার দুধ-ছেলে। বিশ্বসংসারকে দুধে পাললে যশোদা হতে হয়। নির্বান্ধবে একলা মরতে হয়, মুখে জল দিতে কেউ থাকে না। অথচ শেষ সময়টা কারো থাকার কথা ছিল। সে কে? কে সে? সে কে?

যশোদা মারা গেল রাত এগারোটায়।

বড়বাবুর বাড়ি ফোন গেল। বাজল না। রাতে ওদের ফোন ডিস্‌কানেক্ট করা থাকে।

হাসপাতালের মর্গে যথাবিধি পড়ে থেকে যশোদা দেবী, হিন্দু ফিমেল, যথা-সময়ে গাড়িতে শ্মশানে গেল ও দাহ হল। ডোমই তাকে দাহ করল। যশোদা যা-যা ভেবেছিল, ঠিক তাই-তাই হল। যশোদা ঈশ্বর-স্বরূপিণী, সে যা ভাবে, অন্যেরা ঠিক তাই করে, তাই করল। যশোদার মৃত্যুও ঈশ্বরের মৃত্যু। এ সংসারে মানুষ ঈশ্বর সেজে বসলে তাকে সকলে ত্যাগ করে এবং তাকে সতত একলা মরতে হয়।

একটা মাঠ। সার সার অসমাপ্ত বাড়ি। কোণে পূর্ণিমার চাঁদ। চাঁদের ওপর একটি হাতের সিলুয়েট। চাঁদের পটভূমিতে একটি মানুষের হাত মাটি থেকে ওপর পানে উঠে আয়-আয়-আয় বলে ডেকে চলেছে। দৃশ্যটি দেখে পার্থ, এবং বেজায় ভয় পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। পার্থ কাফকা পড়েনি, সুররিয়ালিস্ট শিল্পের খবর রাখে না। তবুও দৃশ্যটির অবাস্তব বাস্তবতা, অ্যাবসার্ডিটি ও সমারোহ তাকে স্থাণু করে দেয়। সরকারী-আবাস-প্রকল্পের সাইটে পূর্ণিমার চাঁদের ওপর এক মানুষী হাতের হাতছানি দেখে সে ভয়ে জমে যায়। কেন না মাঠটির প্রেতঘটিত কুখ্যাতি সে ভাল ভাবেই জানে। একদা এখানে ন্যাংটো কালের বন্ধুরা ন্যাংটো কালের বন্ধুদের লাশ ফেলেছে। সময়ের নিয়মে। সে-সব কাণ্ড-বাণ্ডতে পার্থ ছিল না। তবু সে বেগতিক ভয় খায় এবং ভয়ের প্রবল আকর্ষণে গুটিগুটি এগোয়। তারপরই সে দাঁড়িয়ে পড়ে, কেন না চাঁদ ওপরে উঠে যেতে থাকে। ও চাঁদের কানা দিয়ে এখন দুটি হাত ওপরে উঠে ডাকতে থাকে।

'সব ডবল-ডবল দেখি কেন?' পার্থ নিজেকে শুধোয় এবং বিমল কনট্রাকটরের বাড়িতে বসে লোভের বশে আজই প্রথম সরকারের সীলমোহর করা দেশী মদ (বোতল ফেরতে সাতষট্টি পয়সা রিফাণ্ড) খাবার জন্যে নিজেকে দোষী করে। রোজ বিমলই খায়, পার্থ দেখে। ভিতু ও বিবেকী হবার দরুন এ জীবনে তার ভূমিকা এখন অবধি দেখে যাবার। প্রত্যহই বিমলকে তেলিয়ে বাড়ি ফেরার পর (বিমল তারই বয়সী), পার্থর মা জিজ্ঞেস করেন, 'কিছু অইল?' এবং এ প্রশ্নের উত্তর নেতিবাচক হবে, তা জানেন বলে পার্থর রুটি-ডাল-তরকারি অকেশ্যনাল মাছের বাসনটি নামিয়ে রেখে বেরিয়ে যান। পার্থর বয়স বছর সাতাশ, অতীব আখাম্বা ও ঝাঁকড়াচুলো চেহারা, এখনকার সকল যুবকের মত জুলপি লম্বা ও চওড়া, প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার পর সে যথানিয়মে ফেল করে এবং কাজের চেষ্টা করে যাচ্ছে বছর সাতেক। করেই যাচ্ছে। সকলের চোখে সে খুবই অপদার্থ। কেননা আপলিটিকাল অন্যান্য ঝাঁকড়া-চুলোদের মতো ছুটকো-ছুটকি চাল-লানে-অলা ও ভেণ্ডারদের কাছে তোলা ওঠানো, অথবা বারো মাসে বারো শীতলা পূজা, অথবা আঞ্চলিক সিনেমার টিকিট ব্ল্যাক, অথবা বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা-কেন্দ্র, কনট্রোল ইত্যাদি জনকল্যাণমূলক কাজে সে এলেম দেখাতে পারেনি। শেষোক্ত

কাজটি খুবই সুদূরসম্ভাবী ছিল। বিদ্যায়তন কর্তৃপক্ষের হাত থেকে সেণ্টার টেকওভার, অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দশ-আনা ছ-আনা রফা, সেণ্টার রক্ষণে নিযুক্ত প্রহরীদের 'তুম লোক আরাম করো হম লোক সামাল লেগা' বলা, সরল ও শিশু হৃদয় পরীক্ষার্থীদের ডুপ্লিকেট উত্তর লেখা খাতা দেওয়া এবং প্রত্যেক বিভাগ থেকে টাকা নেওয়ার সুবিধা হল প্রত্যক্ষ সুবিধা। কিন্তু পরোক্ষ সুবিধা হল অন্য রকম। পরীক্ষাসেণ্টার নিবিড়-চাষপদ্ধতি। এ জমিন আবাদ করলে নানাভাবে ধান ফলে বা সোনা ফলে। এর ফলে সকল পরীক্ষার্থী পাস করে এবং পরীক্ষার সঙ্গে সমাজ ও শিক্ষা-ব্যবস্থার যত সেকশন জড়িত, সকলে খুশি থাকে। ফলে ডিরেক্ট ক্যাশ মেলে এবং এক বিস্তারায়িত পাবলিক কণ্টাক্ট স্থাপিত হয়। এভাবে যে সকল ছানাপোনা পাস করে তাদের অভিভাবকরা অনেকেই প্রভাবশালী ও প্রয়োজনীয় ব্যক্তি। ফলে কাজ বাগিয়ে চলার সুবিধে হয়। কখন ডান হাত হতে বামে যেতে হবে, বাম হাত হতে ডানে —তা ঝাঁকড়াচুলোরা ভালই জানে। সাবভাইভালের জৈব ও মৌল নীতি এই ব্যাপারটি ক্যাশ করেই বিমল কনট্রাকটর হয়ে গেছে এবং এখন সে-অঞ্চলে কনট্রাক্টরী সাব-কনট্রাক্টরী সাব-সাব-কনট্রাক্টরী জগৎ বেড়ে ফেলে সব পেরেক-পাইপ-সিমেণ্ট-সুরকি-ইট-রং—ইলেকট্রিক সরঞ্জাম—দরজা-জানলা-গ্রিল—কমোড-সিটিং পায়খানা ইত্যাদি ধরে ফেলেছে। পার্থকে সে দীর্ঘদিন আশা দিয়ে রেখেছে এবং আজকাল পার্থকে সে তার মালপত্রের গুদাম রোঁদগস্তির কাজে বহাল করেছে। দৈনিক পাচ টাকা। রোঁদগস্তির কাজে যারা অফিসিয়ালি নিযুক্ত, তারা মাসে তিনশো টাকা পায়। পার্থর কাজ তারা চুরি-না-করে তাই দেখা। কেননা বিমল জানে, পার্থর চুরি করার সাহস নেই। ইদানিং পার্থ ওর গোডাউনের এক পরিষ্কৃত কোণে ঘুমোচ্ছে। লক্ষ টাকার মালমশলার কোণে তার খাট, আলো, টেবিলপাখা। পার্থর এখানে ঘুমোতে খুবই ভাল লাগে এবং দেয়ালে প্রলম্বিত নীতু সিং-এর 'ব্লো-আপ' দেখতে দেখতে সে যখন ঘুমোয়, তখন শরীরে যে বিদ্যুতের খেলা চলে, সেটি পার্থর কাছে খুবই মনোরম। এই টাকাটি সে খুব ইদানিং পাচ্ছে, ফলে বিমল তাকে সত্যিই কিছু করে দেবে, সে আশাও পার্থ রাখে।

সন্ধ্যের দিকে ও বাড়ি আসে, স্নান করে, খায় এবং বিমলের বাড়ি ঘুমোতে যায়। সরকারী আবাস-প্রকল্পের মাঠটি পেরোনোই সুবিধা। বিমল এ প্রকল্পের ওপর খুবই চটা। কেননা সে কোন কনট্রাক্টরী পায়নি। পার্থ মাঝে মধ্যে বিমলকে লুকিয়ে এখানেও কাজের চেষ্টা করে যায়।

আজও সে মাঠ পেরোচ্ছিল। প্রথম নেশা করার আনন্দে ও অনভ্যাসে মাথা

তরঙ্গিত ছিল, গলায় গান ছিল, মন কোনো মতেই কোনো বেয়াড়া দৃশ্য দেখার জন্যে প্রস্তুত ছিল না। এ হেন মন অনাক্রান্ত দেশের মতো। চাঁদের পটভূমিতে হাতটি (এখন হাত দুটি); সে মনের ওপর লোভী সৈন্যের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল ও অধিকার করল।

পার্থ জানত না, ওই হাত জোড়ার দিকে এগোলে সে আগামী ছ মাস কি ফ্যাসাদে ফেঁসে যাবে; কি রকম অভিজ্ঞতা ঘটবে তার; অনন্ত খাটুয়ার নিয়তি কি ভাবে তাকেও জড়িয়ে ফেলবে। জীবনের অদ্ভুত অভিজ্ঞতাগুলির স্টার্টিং প্রেমিস খুব আপাত তুচ্ছ হতে পারে। এ ক্ষেত্রে ওই জোড়া হাতের হাতছানি ছিল স্টার্টিং প্রেমিস।

পার্থ গুটি গুটি এগোল। প্রকল্প সাইটে মাত্রই তিনটি চায়ের দোকান, সাঁঝে ঝাঁপ বন্ধ। মাঝে মধ্যে সাঁইবাবলার গাছ, এখানে-ওখানে ইট ও বালি সুরকির স্তূপ। যেখানে কাজ হচ্ছে, সেখানে পাহারাদার থাকে।

উদ্বীয়মান ঘরদোর দূরে। বিস্তারায়িত মাঠের সবটকু জুড়ে কোনোদিন ঘরদোর উঠবে, এখনো ওঠেনি। চাঁদ উঠে যাচ্ছে বলে উত্থিত হাত দুটি ক্রমেই তরল অন্ধকারে ফেড আউট করতে থাকে। কাছে যেতে পার্থ শোনে ভূগর্ভ থেকে একটি অশ্লীল বৃদ্ধ গলা অলটারনেটিভলি কথা বলছে ও গান ভাঁজছে।

বলছে, 'কোনো শালা কাছে নেই?' গান ভাঁজছে।

'বুড়ো-বুড়ির রসের খেলা
কোলে তুলে ছ্যানা ডলা'—

গানটি খুবই অশ্লীল ভাবেঙ্গিতে পূর্ণ এবং কোনো বৃদ্ধ কণ্ঠ থেকে পূর্ণ চাঁদের আকাশ পানে ওঠার লগ্নে নিঃসৃত হবার নয়। এ ক্ষেত্রে গানটি, সনাক্তীকরণে সহায়তা করে। পার্থ চেঁচিয়ে বলে, 'অনন্ত-কা? তুমি?'

'কে বাবা? পার্থ?'

'আসতাছি।'

'এসো বাপ, ককন থেকে চিল্লোছি।'

'খাড়াও।'

মাঠ ভর্তি ঢ্যাবা-ঢ্যাবা উঁচু-উঁচু। পার্থ অঞ্চলের নামী স্প্রিণ্টার। নানারকম ওজন হরাইজনটালি বহন করে দৌড়তে তার মতো দড় কেউ নেই। কেন সে বিভিন্ন স্পেশিফিকেশনের ওজন হরাইজনটালি বয় এবং দৌড়য়, তা পরে জানা যাবে। সেটি সাস্‌পেন্সে থাকুক।

পার্থ দৌড়ে ঢ্যাবা পেরোয় ও কাছে গিয়ে দেখে পাড়ার সর্বজনপরিচিত পেস্ট

অনন্ত খাটুয়া এক পেল্লায় গর্তে পড়ে দাঁড়িয়ে আছে। পার্থ তার বগল ধরে টেনে ওঠায় ও নাক সিঁটকে বলে, 'আবার তাড়ি টানছ?'

'তুমি কি খেয়েচ বাপ? সুবাস ছাড়ছে?'

'বইক না।'

অনন্ত নিজেকে চাপড়ে-চুপড়ে সাব্যস্ত করে ও বলে, 'শর্টকাট কত্তে গিয়ে পড়ে গেলাম।'

'তাড়ি পাইলে কোথা?'

'বিলডিঙের কুলিরা দিলে।'

'তোমার আর ভাগ্য নাই।'

'নাচ দেখালাম, তাড়ি দিলে।'

'আবার রোগে ধরছে?'

'কেন? নাচ দেখিয়ে অন্যায় করেছি?'

'চল। কথা কইও না।'

'এতই যখন করলে বাপ, তখন ডেরায় তুলে দে যাও। নইলে কানী এসে জায়গা দখল নেবে।'

'তখনও সেথায় আছ?'

'যাব কোথা বাপ? আজ বাইশ বছর অনন্ত খাটুয়ার পার্মানেট ঠিকানা, অনন্ত খাটুয়া, কেয়ার অফ বিক্রমগড় হরিসভার দাওয়া, পোস্টাপিস যাদবপুর।'

পার্থ অনন্তকে সযত্নে স্টিয়ার করে নিয়ে চলল। অনন্ত গাইতে-গাইতে চলল, 'বুড়ো-বুড়ির রসের খেলা, কোলে তুলে ছ্যানাডলা।'

'আবার ওই অসভ্য গান!'

'অসভ্য কিসে? মন্দ মনে করলে মন্দ, নইলে, বুজলে বাপ, গানটি চিন্তা করার যুগ্যি।'

'লও, তোমার ডেরা আইসা গিছে। গিয়া চিন্তা কর গা তুমি।'

'শুধু হাতে যাব বাপ?'

'তোমারে লইয়া—!'

পার্থ একটা দশ-পয়সা দিল। এমন দশ-পয়সা ওকে মাঝে মাঝে দিতে হয়। সকলকেই দিতে হয়। এ পাড়ার পলিটিক্যাল ছেলেদের জনৈক নেতা ভ্যান্টা বলেছিল, না অনন্ত-কা। ভিক্ষা না। চাইবা না, দিব না। তোমার যা প্রবলেম, তা অন্যভাবে সল্ভ করনের কথা। তা যদ্দিন না হচ্ছে, তদ্দিন…

অনন্ত তাকে কিছুই বলেনি, কিন্তু দুপুরে বাড়ি ফিরে সেই ভ্যান্টাই দেখেছিল,

অনন্ত তাদের দাওয়ায় বসে ভাত খাচ্ছে।

ভ্যান্টার তেজস্বিনী মা বলেছিলেন, ‘*চোক্ষু ঘোঁচাইয়া দেখস্ কি? ত্যালপড়াটুক, জলপড়াটুক, করে কে? বছরে এক-তুই দিন খায়, তাও তর খায় না। কি দেখস?*’

অনন্ত তখন খুব খারাপ হেসে বলেছিল, ‘ওকে বোলনি মা। যকনি বলেচে ভিক্কে দেব না, তখনি জানি রোগে ধরেছে। রোগে ধরলে বাবুরা ভিক্ষে দেয় না, আর হাত-রিকশা চড়ে না। বলে, মানুষ চেপে যাব না।’

পলিটিকাল অন্য ছেলেদেরও যা বলে, ভ্যান্টাকেও বিকেলে তাই বলেছিল অনন্ত, বাড়ি থেকে দূরে এসে। বলেছিল, ‘বয়সের ছেলে, লেকাপড়া কর, চাগরি খোঁজো, আর সকালে-বিকেলে দিদিমণিদের দেখে মন খুশী রাখো। ও রোগ বাধিয়ে হবেটা কি?’

অনন্ত এ অঞ্চলের এক স্থিতিস্থাপক ব্যাপার। বাঙালীকে অন্য রাজ্যের লোকরা যে যাই মনে করুক, বাঙালী বড় পুরাতন প্রেমী। পুরনো মুখই তারা রাজনীতিতে দেখতে ভালবাসে, পুরনো সব কিছু। অনন্ত এ অঞ্চলের পুরনো পেস্ট্। সব পেস্ট্ কণ্ট্রোল করা যায় না, এলিমিনেট তো নয়ই। অনন্ত খাটুয়া মেদিনীপুরের মাহিষ্য হয়ে কি করে এ অঞ্চলের হরিসভার দাওয়াকে স্থায়ী ঠিকানা করে বসে আছে, সে অতীব কৌতূহলোদ্দীপক, রিসার্চের বিষয় হবার যুগ্যি এবং হিউম্যান বিয়িংস্ যে কত ব্যাফলিং হতে পারে তার প্রমাণ।

অনন্ত খাটুয়া মেদিনীপুরের পিছাবনি গ্রামের বাসিন্দা। তার বাল্যে ও কৈশোরে বীরেন শাসমল প্রমুখ নেতাদের প্রভাবে গ্রামটি ছিল সংগ্রামী। রাজনীতিক কাজকর্মকে সে কারণেই অনন্ত সস্নেহে ‘রোগে ধরা’ বলে। ওরা সম্পন্ন চাষী ছিল, কিন্তু ওর ভাষায় ‘লুন মারা আন্দোলন’ বা লবণ আন্দোলনে নেমে, বার-বার স্বদেশী বাবুদের সাহায্য করে ওর পরিবার রাজরোষে পড়ে ও অবশেষে আগস্ট আন্দোলনে নেমে ওর দুই দাদা, ভূষণ ও মুরারি গুলি খেয়ে মরে, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়, তুই পুত্রশোকে শুষ্ক স্তনদ্বয় চাপড়ে-চাপড়ে কেঁদে কেঁদে মা মরে, দাদাদের বিধবারা যে-যার পুত্রকলত্র-সহ স্ব-স্ব বাপের বাড়ি চলে যায়। অনন্ত পালিয়ে কলকাতা চলে আসে ও এক সহৃদয় উকিলবাবুর বাড়ি কাজে লাগে। তখন ওর বয়স ত্রিশ, নিজেও হিজলী জেল কৈশোরে দেখে এসেছে। বাবুর বাড়ির গাইগরু দেখতে থাকে ও এবং সত্বর বাড়ির এক মূল্যবান মেম্বরে পরিণত হয়। খুবই বিচিত্র ওর মনস্ত গতি, কেন না স্বাধীনতার পর, ওর কেস খুব জেনুয়িন বলে উকিলবাবু ওকে নির্যাতিত-রাজনীতিক-ভাতা পাইয়ে দেবার চেষ্টা করেন। তখন ও বলে,

'দাদারা মরেছে, জমি বাজেয়াপ্ত হয়েছে, সকলি তো জানে সরকার। দরখাস্ত করব কেন? এমনি দিক। আমি অনন্ত খাটুয়া, চাইতে জানিনি।' ওর বেগড়বেঁয়ে বুদ্ধি দেখে পাড়ায় ওর যে-সব হিতৈষীদের সন্দেহ হয়, ওর কেস জেনুয়িন নয়, শুধু তাদের শিক্ষা দেবার জন্যেই ও তমলুক-নেতা পাড়ায় এলে পরে তাঁর সঙ্গে সরাসরি কামরাদোরি টেনে কথা বলে সকলের মুখ বন্ধ করে দেয়। নেতা তাকে ভূষণ ও মুরারির কথা জিগ্যেস করেন এবং ওকে দেখা করতে বলেন। এ হেন কনটাক্ট ক্যাশ না করে অনন্ত সকলকে অবাক করে দেয় এব যথারীতি গাইগরুর পরিচর্যা করতে থাকে, বাড়ির স্ত্রীলোকদের গার্জেন হয়। নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, নির্লোভিতা ও কড়া-পড়া অ্যাঁকাব্যাঁকা আঙুলসুদ্ধ পা (কড়া দূর করতে অনন্ত পায়ে অ্যাসিড বুলিয়েছিল) নিয়ে দাপটে বিরাজ করতে থাকে। সকলের কাছেই সে দুর্বোধ্য থেকে যায় এবং তাতে সে বিশেষ মজা পায়। উকিলবাবু ১৯৫৬ সালে দেহ রাখলে পরে, সকলকে অবাক করে ও সহসা ঘোষণা করে, চৌচল্লিশ বছর বয়স হল, আর কাজ করব না, দাদাদের রোগে ধরেছিল বলে সেই ছেলেকাল হতে হয় গাই চরাচ্ছি, নয় ধান পওরা দিচ্ছি, আর কাজ করব নি।'

'কাজ করবে কেন? যেমন ছিলে, তেমনি থাকো।' গিন্নিমা চোখ মুছে বলেন।

'নাঃ।'

'যাবে কোথা? খাবে কি?'

'দেখি।'

সত্যি বলতে কি, উকিলবাবু, অনন্তর ভাষায় 'বম্বাই' খাটে শুয়ে চলে যাবার পরেই অনন্তর একটা আশ্চর্য মেটামরফসিস্ ঘটে যায় ভেতরে-ভেতরে। এক সময়ে যেমন নতুন জায়গায় এসে উঠেছিল, কলকাতায়, এখন তেমনি নতুন পল্লি বসতি, বিক্রমগড়ে চলে আসে এবং হরিসভা-দালানের দাওয়ায় থেকে যায়। কুতূহলীদের ও সঠিক সংবাদটিই দেয়, 'দত্তবাবুদের বংশের হরিসভা মন্দির। লিখিৎ-পড়িৎ আছে, দরদালান সবার জন্যে। দত্তবাবুদের জমি-জমায় কলোনি হয়েচে বলে আইন পাল্টে যাবে?'

সে পশ্চিমবঙ্গীয়, চতুর্দিকে পূর্ববঙ্গ, এতে তার কিছুই এসে যায় না এবং নবাগত পরিবার দেখলে, 'আসুন, এসো, বাঃ, বেশ' ইত্যাদি বলে যেভাবে স্বাগত জানাতে থাকে, তাতে বোঝা যায় ও জাত হোবো। হোবো বা ট্র্যাম্প বা ভবঘুরে, বা ভেগ্রাণ্ট বা চক্রচর ছাড়া অন্য কারো পক্ষে রাজার উদারতায় রামের জমিতে শ্যামকে আবাহন সম্ভবে না।

নিজেই ও হরিসভার দালান ঝাঁটপাট, চারটি ফুলগাছ লাগানো ও জল নিষেক ইত্যাদির ভার নিয়ে নেয়, এবং ওর প্রতি অত্যন্ত-বিদ্বেষী 'এদেশী'কে ঘৃণাকারী চণ্ডীদাস গুহরায়ের প্রিয়তমা এক গাইকে যেদিন পেটফাঁপা সারিয়ে দেয়, সেদিন থেকে ও এখানকার ভূগোলে অ্যাক্‌সেপটেড হয়ে যায়। জলপড়া-তেলপড়া—ঝাড়-ফুঁক যে জানে, তার অন্ন কোনোমতে জুটে যায়। এইভাবেই ও থেকে যায় এবং এখন বোঝা যায়, ওর ভেতরের ধানী-পানী গৃহস্থ-সত্তাকে ও পিছাবনি অথবা উকিল-বাবুর বাড়ি ফেলে রেখে এসেছে। এখন ওর অন্তর্সত্তা রূপান্তরিত হয়ে এক অদ্ভুত রেকলেস-হোবো ছিন্নমূল সত্তায় দাঁড়ায়। মুখের কথা অবধি বদলে যায়। চরিত্রে স্ত্রী-দোষ ঘটে না মোটেই। কিন্তু বোঝা যায় সময়কালে জীবনের মৌল জিনিস-গুলি চেয়ে-না-দেখা যে ভুল হয়ে গেছে, সহজ আনন্দ না-খোঁজা হয়েছে ভুল তা সে ভালই বুঝেছে। তাই সে ছেলেছোকরাদের বলে, 'রোগ বাই কেন? দিদিমণিদের দেখ, চাগরি খোঁজ, সিনেমা দেখ, মজা কর।' এবং মাঝেমাঝে তাড়ি খায় একটু। একদিন দেখা গেল, কাঠগোলায়, চাল-চালান দিয়ে যেসব মেয়েছেলেরা বসে থাকে ছেলেপুলে নিয়ে এবং উকুন বাছে তাদের সামনে, ছেলেপুলেকে আনন্দ দিতে ও নাচছে অ্যাঁকাবাঁকা পায়ে। অঞ্চলের সবাই বুঝল অনন্ত পাল্টাচ্ছে।

এ হেন অনন্তকে পার্থ তার ডেরায় পৌঁছে দিয়ে গেল, কিন্তু কি ছিল গর্ত থেকে তোলা হাতের পটভূমির পূর্ণচাঁদে, অনন্ত হঠাৎ চান্দ্রেয় আকর্ষণে ঠাওরাল, পার্থই তার একমাত্র উপকারী বন্ধু।

কয়েকদিন বাদে, বিমলের বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাড়ির দিকে আসতে-আসতে পার্থ দেখে, হরিসভার দালান থেকে অনন্ত তাকে ডাকছে। যেহেতু, অনন্তের একটি চোখ পাথরের, সেহেতু তার চাহনি সব সময়ে দুরকম। পার্থ দেখল, আসল চোখটি ড্যাবডেবে ও নিষ্প্রাণ, নকল চোখটি নাচছে। হাত তুলে ডাকা অনন্তর স্বভাব-অভ্যাস। দশ পয়সা ও ওইভাবেই চায়। পার্থ কাছে গেল।

অনন্ত বলল, 'ই কি রকম কথা? আমাকে কিছু বল নি? ব্যবস্থা ইদিকে হয়েই আছে?'

'কি ব্যবস্থা?'

'আরে, তোমাকে জানি ভাল ছেলে, পুণ্যবান তুমি, তুমি জান না?'

'কি কও পাগলের মতো?'

'ওই বিমলটা আমায় বলল?'

'কি কইছে বিমল?'

'না, সেই বলবে।'

'কওই না।'

'ব্যবস্থা হে, ব্যবস্থা। আমার মতো নিঃসম্বলে বুড়োকে সরকার পেনশান দেয়, বুঝেছ ?'

'হঃ! বিমল তামশা করছে।'

কিন্তু পরে বিমলও অনন্তর কথা করোবোরেট করল। বলল, 'আছে। কণ্ট্রোলার অব ভেগ্রানসির আপিসে যা, খোঁজ ল, বুড়ারা বৃত্তি পায়।'

'যাঃ। তয় তো হকল বুড়াই পাইত।'

'জানে না। সরকারে অনেক কাম করছে রে। অরে যদি পাওয়াইয়া দিতে পারস, দেখ না।'

অনন্ত বিষয়ে বিমলের উদ্বেগের কারণ বোঝা গেল, কেন না বিমল বলল, আমার হকলই তো আমার মায়ে চেষ্টায়। হ্যায় আমারে লওয়াইয়া লওয়াইয়া এই কামে লামায়। মায়ের কথা আমার গুরুবাক্য; হ্যায় কতদিন মাজার বাতে ভুগতাছে, অনন্ত তেল পইড়া দেয়। মায়ে তো বৈদ্যনাথ যাইব কেষ্টার লগে। মায়ে কইল, কদ্দিন পরে ভাত দিতাছি, তরা তো দিবি না। পালবাবু কইছে বুড়ো মানুষে পেনশান পায়, তাই অরে ব্যবস্থা কইরা দে। মায়ের আজ্ঞা, তাই তরে কইতেছি।

বিমলের কাছে তার মায়ের আজ্ঞা খুবই অলঙ্ঘনীয়, অতএব পার্থ সে আজ্ঞা কার্যকরী করবে, এর মধ্যে যে দুর্বোধ্যতা আছে তা সাফ করে বিমল। বলে, 'তরে কথা দিতাছি। এই কাজ কইরা দে, তর বানধা কাজ হইব। দুর্গাপুরে বইলা থুছি।'

বিমল বলেছে বলেই পার্থ এ কাজে তাতে না, তার নিজের মধ্যে একটা ভ্যাদ-ভেদে জলাভূমি আছে। সেটি তার উন্নতির পক্ষে প্রবল অন্তরায়। ভিখিরিকে সে পয়সা দেয়, 'আর করুম না' বলেও ভ্যান্টার বুড়ি পিসিকে ছানি কাটিয়ে আনে এবং যে কোন সময়ে, রাতে-বেরাতে মড়া পোড়াতে যায়। যেহেতু প্রপার মৃতদেহ মাত্রেই হরাইজনটাল সেহেতু এভাবেই হরাইজনটাল ওজন কাঁধে দৌড়নো তার অভ্যাস হয়েছে। দৌড়নোর মধ্যে কোনো তুচ্ছতাচ্ছিল্য বা মৃত্যুকে থোড়াই কেয়ার করার ভাব নেই। এ অঞ্চলের সব লাশই ক্যাওড়াতলা যেতে চায়। ক্যাওড়াতলা কয়েক মাইল দূরে, অতএব ছুটে চলা সুবিধাজনক বলে পার্থ দৌড়য়। কোন কাকে 'না' বলতে পারে না সে, মনের ভেতর মাশিল্যাণ্ড। এখনো সে 'না' বলতে পারল না। কেন না বিমল তার আঁতে ঘা মেরে বলল, 'হকল দিন করিসও না কিছু, নয় বুড়ার উপকারই করলি ? সময় পাইলে আমিই যাইতাম।'

এ কথায় পার্থ খুবই কেঁচো হয়ে যায় ও কিছু না বলে বেরিয়ে আসে। পরে মনে

হয়, কথাটি খারাপ নয়। অনন্তর একটা হিল্লে হয়ে যায়। সে বলে 'অনন্ত-কা তুমি তখন সরকারের পেনশান লইলা না, অহন চেতলা ক্যান ?'

অনন্ত এ কথায় হ-হু করে হাসে, পাথুরে চোখটি নাচায় ও বলে, 'রঙ্গ দেখতে যাচ্ছি, বুঝলে বাপ ? বুড়ো হলে পেনশান। বিমল বলছে কি জান ? সরকার কারুকে ফেলে না। বুড়ো হও, যা হও, সরকার তোমায় দেখবেই।'

'আজকাল ঘোর পাড় কেন ?'

'শুনবে ?'

'কাল দেখি সন্তোষপুর যাইতাছ ?'

অনন্ত কাছে এল, আসতেই তার পুরনো কফ-কাঠির পচা মিষ্টি সদৃশ স্যাত ওঠা গন্ধ পার্থর নাকে এল। অনন্ত কাছে এসে, গভীর ষড়যন্ত্রকারীর মতো হেসে বলল, 'বুড়ো খুঁজছিলাম, বুঝলে ? সাতকুলে কেউ নেই, নিঃসম্বলে বুড়ো। যা দেখে এলাম, সে তাজ্জব। কি জোচ্চোরি চলচে যদি জানতে বাপ !'

'কেন ?'

'আগে বল দেখি, বুড়ো-ভাতা দেবার আপিসটা হল গে এ রাজ্যের, তাই না ?'

'হু।'

'আরে কয়েক দিনে এগারোটা বুড়ো পেয়ে গেছি, জোচ্চোর, জোচ্চোর সব। বাজারের বুড়োটা হল গে মাদ্রাজী, জানলে ? কেমন বাঙালী সেজে রয়েচে, বোঝার সাধ্যি নেইকো। কোন শালা নিঃসম্বলে, নিরাত্মি নয়। নুলোটার ভাগ্নে আচে, ভাগ্নের চায়ের দোকান আচে। খেঁড়াটার ঠ্যাং আচে গো, ভাঁজ করে বেঁদে রাখে। সে বেটার বউ অবদি আছে।'

'অনন্ত-কা, তুমি কি গুনতে গিছিলা ?'

'গুনে গেঁতে দেখছিলাম, সঙ্গী সেথা পাই কি না। কিস্যু না কিস্যু না, তেমন বুড়ো বলতে তল্লাটে এক অনন্ত খাটুয়া, কেয়ার অফ বিক্রমগড় হরিসভার দাওয়া। দেখে বড় আনন্দ হল বাপ।'

'তোমার হয় কি না দেখি, তুমি আর বুড়োর তাল্লাস কইর না। দেখি আমি।'

দেখতে তো তুমিই দেখবে ভায়া। মেদনীপুর-টুর ভুলে গেচি, তোমাদের আশ্রয়ে আচি।'

হ্যাপাটি যখন পার্থকেই পোয়াতে হবে, সকলেই বলে, কাজটি খুব ভাল। বৃদ্ধ লোকদের পেনশন-ব্যবস্থা যখন রাজ্য সরকার করেছে। তল্লাট বোঝাই ঘরে-ঘরে বুড়ো থাকলেও অনন্তর ব্যবস্থা দরকার। হরিসভার দাওয়ায় থেকেও তার স্বভাবে

বিস্ময়জনক সব মেটামরফসিস ঘটছে। এখন, বার্ধক্যে পৌঁছে সে ভিখিরি ছোঁড়াদের আনন্দ দিতে কোমরে হাত রেখে এক মন-বিবাগী-করা আষাঢ় দুপুরে, বৃষ্টিধারার তালে তালে 'হাম্ তুম, এক কামরে মেঁ বন্ধ হো জায়, ঔর চাবি খো জায়' গাইছিল। বিল্ডিং-সাইটের কুলিদের নাচ দেখিয়ে তাড়ি খাওয়ার কথা অনন্ত সম্বন্ধে কে ভাবতে পারে ? ঝাড়ফুঁকেও মন নেই, সকলকে হাত তুলে ডেকে ও 'পেনশান' হয়ে যাবে হে, খবরটি দিতে ব্যস্ত। স্বভাব বদলাছে বললে পরে সে বলে, 'দাদাদের পোনে-পোনে যে ফেলাগ নিয়ে ছুটত, সে অনন্ত মরে গেচে', তাকে কি বলা যায় ? চণ্ডীদাস গুহরায় এতকাল বাদে অনন্তর স্বভাবের মন্দ মতির কারণ 'মেদিনীপুইরা' বলে ব্যাখ্যা করতে যান, দুদিন ব্যাপী ব্যাখ্যাটি সকলের স্বীকৃতি পায়, কিন্তু তৃতীয় দিন স্বয়ং চণ্ডীদাসবাবু শুকনো ডাঙায় আছাড় খেয়ে ঠ্যাং মচকান এবং আবার অনন্ত তেল-পড়া, জল-পড়া দিয়ে তাঁকে তোলে। চণ্ডীদাসবাবুই তার চরিত্র-হন্তা, তা জেনেও সে অশেষ ক্ষমাভরে বলে, 'সন্দে বেলা লাইন পেরিয়ে প্যাজুজ ফুলুরি খাওয়াটা ঠিক লয় বাবু। লাইনে হরদম মানুষ কাটা পড়ে। সাঁঝে উপরি লেগে যায়। ব্যথাটা সারলে তাগা বেঁদে দেব।' এ ঘটনায় সকলেরি বিশ্বাস হয়, অনন্তকে ভিলিফাই করা অনুচিত কাজ, এবং তল্লাটের মহিলাদের নেত্রী ভ্যানটা-জননী বলেন, 'ইঃ! যত অন্যায় হকল অনন্ত করতাছে। যে অরে মন্দ বলে, তার মুখে পোকা পড়ব। তাড়ি খায়। লাচে। পুরাণে ল্যাখা নাই ? শিব ভাঙ্গড়ভোলা হইয়া ল্যাচে না ?'

ফলে সকলের বিবেক বিদ্ধ হয়, এবং সময়টি যেহেতু ১৯৭৮, মানুষের মনকে ব্যস্ত রাখার মতো ঘটনাবলী বিরল, বাতাসে শুভ সংকল্পের রেডিয়েশন, সেহেতু সকলেই অনন্তর বিষয়ে ব্যস্ত হয়। এ জন্যে, সকলের যে কাজ করা উচিত মনে হয়, তা হাতেকলমে করার জন্যই যেহেতু পার্থ জন্মেছে, সেহেতু সকলেই ওকে খোঁচা মারে, এমন কি স্বয়ং পৃথাও বলেন, 'বাবরিতে ত্যাল না দিয়া বুরার বেবস্থা দেখ্ না! বিমলের দরোয়ানী তো করবি রাতে'। ফলে পার্থ মনে-মনে কষ্ট পায়, নিজেকে অবিবেকী মনে হয় তার এবং সে এক দুপুরে ৮-বি বাস চেপে 'কণ্ট্রোলার অফ ভেগ্রান্সি' লেখা আপিসে চলে যায়, গিয়ে দেখে দরজাটি বন্ধ। গেটের সামনে ইকুয়েলি ভেগ্রাণ্ট এক মুসলমান বুড়ি সস্নেহে দুর্গন্ধ হেসে বলে, 'বুদবার বন্ধ থাকে, জান নি ?' উলটোনো ডাস্টবিন থেকে ন্যাকড়া-কাগজ-দেশলাইয়ের খোল-পাঁউরুটির শুকনো পিঠ—কপির গোড়া ইত্যাদি দরকারী জিনিসপত্র বাছতে বাছতে সে বলে, 'বাড়িতে বুড়ো-বুড়ি আছে বুজি ? কাল এসো।' এমনভাবে বলে, যেন বুধবারে বন্ধ দপ্তরের রক্ষয়িত্রী সে এবং তার ছেঁড়া কালি-পড়া শরীরে ও গলিতদন্ত মুখে,

কুষ্ঠজনিত বসা নাকে, একটি লক্ষ্মীমন্ত সচ্ছল রমণীর স্নেহ থাকে, যেন তার সবই আছে, দেশ ও রাষ্ট্র তাকে সবই দিয়েছে যেন। পার্থ চলে যায় ও 'চলা মুরারি হীরো বননে' দেখে চলে আসে।

পরদিন গিয়ে সে স্বয়ং কণ্ট্রোলার অবধি পৌছে যায় বিমলের যোগাড় করে দেওয়া একটি বলশালী চিঠির প্রভাবে এবং একজন সৎ অফিসারকে দেখে, যিনি চেয়ারে বসার আগেই যেন জেনেছেন ভেগ্রান্‌সি ও অন্য বহু জিনিস, যেমন প্রেম-উচ্চাশা-বদমাশি—ক্লেপটোম্যানিয়া—সমকামিতা—চিত্রতারকাহবারইচ্ছা—সাহিত্য-বাতিক, ইত্যাদির মতো এক বাস্তব সত্য, যা কণ্ট্রোল-সাধ্য নয়। যা ইন্‌কণ্ট্রোলেব্‌ল, তা কণ্ট্রোল করতে বলা মানে তাঁকে আতান্তরে ফেলা, এ সত্যটি তাঁর মুখে-চোখে লেখা থাকে। মানুষের বুড়ো হওয়া ও ভেগ্রাণ্ট হওয়া থামানো সম্ভব নয়, তা জেনেও এ-হেন দপ্তর খুলে সরকার, দপ্তর খোলার পার্পাসকে প্রি-ডিফিট করছেন কি না, এ প্রশ্ন সম্ভবত তাঁর মনে হয়। বিবর্ণ আপিসের সকলই বিবর্ণ, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, আসবাবপত্রগুলিকেও যেন ছুটি দিলে ভেগ্রাণ্ট হয়ে বেরিয়ে পড়ে। পার্থর কথা তিনি অসীম সমবেদনায় শোনেন। যবকদের রক্ত গরম থাকে, তাদের ভবিষ্যৎ থাকে। তাদের দুঃখকষ্ট শুনে চলতে হলে তাঁর অবস্থা এমন হত না। বৃদ্ধদের—অবাঞ্ছিত নিঃসঙ্গ নিঃসম্বলে বৃদ্ধদের ভবিষ্যৎ থাকে না, অতীত থাকে। তাদের দুঃখ-কষ্ট শুনে চলতে চলতে তাঁর মধ্যে ধূসর সহিষ্ণুতা এসে গেছে। তিনি বললেন, 'দরখাস্ত করুন। ফর্ম আমাদের নেই। যা যা লাগবে, উনি বলে দেবেন।'

যিনি প্রয়োজনীয় তথ্যাদি কাগজে লিখে দেন, তিনি বলে দেন, 'একটু রেকমেণ্ড করিয়েও আনবেন।' কাগজটি নিয়ে পার্থ চলে আসে ও বলে, 'কবে আসব?'

'এখন কতদিন আসতে হবে। যেদিন পারবেন, সেদিনই আসবেন। একটা পয়েণ্ট বুঝে নিন। বয়স পঁয়ষট্টির ওপর হওয়া চাই, এবং কোনো ফিজিকাল হ্যাণ্ডি-ক্যাপ থাকলে ষাট বছর হলেও চলবে।'

এভাবেই পার্থ অনন্তর কেসে ফাঁসে এবং সে কোন বিপাকে পড়েছে কিছুই না বুঝে, 'এট্টা ভাল কাজ করতাছি' জ্ঞানে ৮-বি ধরে ঝুলে চলে আসে ও আসার কালে বেল-বট্‌স পরা জনৈক পাঞ্জাবিনীকে দেখে অশেষ চোখের সুখ পায়।

তার বিষয়ে কিছু একটা হচ্ছে, এতে অনন্তও অত্যন্ত আনন্দ পায়। হাত তুলে সে সকলকে ডেকে বলে, 'পার্থ আমার ব্যবস্থা করছে, জানলে? একশো আটটা মড়া পোড়ালে যত পুণ্যি হয় তার চেয়ে বেশি পুণ্যি জ্যান্ত মানুষের হিল্লে করলে। আনন্দে সে উধাও হয় এবং তার বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে পার্থ দেখে, বিমলের বাড়ির উঠোনে অনন্ত কোমরে হাত দিয়ে, 'ইয়ে দোস্তি

হম্ নহী' গাইছে ও নাচছে এবং বিমলের বৈদ্যনাথাভিলাষিণী জরতী জননী প্রচুর আমোদ পেয়ে হাসছেন।

'অনন্ত-কা, আবার ?'

একথা বলে পার্থ ঝাড় খায়। অনন্ত বলে, 'মা ভাত খাওয়ালে পেট ভরে, তাতে লাচ দেখাচ্ছি।'

বিমলের মা বলেন, 'তগো মত চক্ষু নাই। ছিনেমা দেখি না। বিমলের টি ভি চক্ষে দেখি না, অর লাচ দেইখা একটু হাসতাছি।'

'অনন্ত-কা, ফর্মা লিখতে হইব না ?'

'চল চল।'

দুজনে এসে হরিসভার দাওয়ায় বসে। বিমলের প্যাকেট থেকে অনন্ত স্বাধিকার-প্রমত্ততায় একটি চারমিনার তুলে নেয় ও সেটি জ্বালিয়ে বেশ টেনে নিয়ে বলে, 'বলে যাও, জবাব দিচ্ছি, লিখে যাও।'

'বয়স ?'

'ছেষট্টি।'

'তোমারে পাল-পোষ করতে পারে, এমুন কেও আছে ? বিয়া করছ ?'

'কেউ নেই বাপ। বিয়ে এট্টা দিইছিল মা, মাগী ন বছরে মরে যায়। আর সংসার করিনি।'

'ঠিকানা ?'

'কেন ? হরিসভার দাওয়া, বিক্রমগড় ?'

পার্থ সরল বিশ্বাসে সবই লেখে এবং কাগজটি নিয়ে আপিসে যেতে সংশ্লিষ্ট অফিসার বলেন, 'অ্যাঁ ? হরিসভার দাওয়া ? এটা কি একটা ঠিকানা হল ?'

'হ সাব, ওহনেই থাকে।'

আফিসার অশেষ করুণায় বোঝান, বাইশ বছর ধরে অনন্ত খাটুয়া, বিক্রমগড় হরিসভার দাওয়ায় বাস করেছে, এটা বাস্তব সত্য হতে পারে, কিন্তু সরকারী দপ্তরের পক্ষে এনাফ সত্য নয়। দাওয়া কাণ্ট বি অ্যান অ্যাড্রেস।'

'সার, পাকা ঠিকানা থাকলে হ্যায় পেনশান চাইব ক্যান্ ? অনাথ-কাঙ্গালের কি ঠিকানা থাকে ?'

'কি করে যে বোঝাই ! আরে, মেদিনীপুরের লোক, ও আপনাদের ওখানেই বা গেল কেন ? কেউ নেই ? তা কি হয় ?:দেখুন গে, কোথায় কি করে পালিয়ে আছে।'

'না সাব। সইত্য কথা কই ! স্বাধীনতার আগে খুব সাফার করছে, দুই দাদা

পুলিসের গুলিতে মরছে, হকলে জানে, রেকডে তাগো নামও আছে। খুবই সাঁচাই মানুষ, কুনদিন সরকারী সাহায্য চায় নাই, লয় নাই।'

'এখন ত আপনার কাঁধে চেপে নিচ্ছে।'

'অরে কিছু কইরা দিতেই অইব।'

'ইন্সপেক্টর যাবে আমাদের। সে কি দাওয়ায় দেখে চলে আসবে?'

'কি করব কয়েন?'

'ওর রেশন কার্ড আছে?'

'মনে হয় নাই।'

'জেনে নিন, জেনে একটা কার্ড করান। টেম্পোরারি কার্ড হলেও চলবে। ঠিকানা হিসেবে হরিসভার প্লট নম্বর দেবেন।'

কার্যকালে দেখা যায়, মৃত লোকের বা অজাত ব্যক্তির কার্ডে রেশন তোলা যত সোজা, জীবিত ব্যক্তির প্রয়োজনে কার্ড করা তত সোজা নয়। রেশন আপিসে দরখাস্তটিকে মোটে পাত্তা দেয় না কেউ। পার্থরও জেদ চাপে। বিমলের সহায়তায় সে, অনন্ত খাটুয়া রেশন কার্ড পাবার যোগ্য, কার্ডটি পেলে সে বার্ধক্য-ভাতা পায়, এই মর্মে সে ভয়াবহ রকম অপ্রতিরোধ্য সব সুপারিশপত্র যোগাড় করে। কাজটি সৎ কাজ বলে পাড়ার রাজনৈতিক ছেলেরাও তাকে সাহায্য করে। পার্থর ছুটোছুটি করে নড়া খসে যায়। অনন্ত মহানন্দে থাকে। ইদানীং, ভাতা পাবে বলে সে চূড়ান্ত রেক্লেস, মহোল্লাসমত্ত এক প্রতীকী হোবো হয়ে দাঁড়ায়। দুরন্ত দুপুরে সে টাটা-ফাটা রোদে না-স্নান, না-খাওয়া, বৃদ্ধ কোমর বেঁকিয়ে নৃত্যশীল, দশ পয়সা নিয়ে বিড়ি-ফোঁকা, 'বুড়োবুড়ির রসের খেলা'—গাওয়া এক অদ্ভুত বুড়ো হয়ে ঘুরে বেড়ায়। এক বৈশাখী দুপুরে, পথের কুকুরদের মেলায় সে একা নাচছে দেখে খেপে গিয়ে পার্থ বলে, 'তোমার লিগ্যা এত করতাছি, তা তুমি যা পাগলামি লাগাইছ, বেবস্থা করার আগেই মরবা। চল, ঘরে চল।'

'ওরা লাচ দেকবে বলল।'

'কুত্তার লগে কথা কইতাছি?'

'এই ন্যাংড়াটা আর ভুঁদিটা যে আমায় জড়িয়ে ঘুমোয় গো! ওরা হল আমার বয় ফ্রেন আর গাল্ ফ্রেন। ওদের বে' দোব এবার।'

'চল, চল।'

জোর করে ওকে পুকুরে নাওয়ায় পার্থ, দোকানে মুড়ি-বাতাসা খাওয়ায়। বলে, 'ঘুমাও গিয়া। আজকাল তো নেশাও কর না, এমুন হইতাছ ক্যান্?'

'সব্বদা নেশা, বুজলে বাবা। ন্যাংড়া ভুঁদির শোঁকাশুঁকি দেকি, কাগগুনো

ছানা নিয়ে স্নরে, কানী বুড়িটা দেকি কার কাছে লাইলন মেগে পরে রানী হয়ে বাজারে ভিখ মাঙতেছে, সব দেকে-দেকে নেশা লেগে যায়। এ যে কি মজা!'

'যাও, শোও গিয়া।'

'কঁ্যাথা-কানিতে শোব না আর, টাকা লিয়েই বিচনা কিনব।

'যাও।'

কিন্তু ঘরে ফিরেও পার্থ শুনতে পায়, একা-একা অনন্ত গাইছে।

কুকুরগুলো ডাকছে।

অনন্তর রেশনকার্ড পাবার যোগ্যতা প্রতিপন্নে, পার্থ চটি ফটফটিয়ে এমেলে, কাউন্সিলার, ডাক্তার, উকিল, কণ্ট্রাক্টর, কলেজ-অধ্যক্ষ, স্কুল-হেড মাস্টার, বরিশাল বোমা মামলা বিপ্লবী সকলের চিঠি যোগাড় করে একটা ফরমিডেবল ফাইল তৈরি করে ফেলে। অতঃপর নিজেকে খুবই বলশালী বোধ করে সে রেশন আপিসে যায়। অফিসার খুবই বিরক্ত হন ও বলেন, রেখে যান। ইনসপেক্টর যাবে।

এখন অনন্তর বার্ধক্যভাতার ব্যাপারটি ক্রমে পাড়ায় মজার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। সকলকেই অনন্ত হাত তুলে ডাকে, দশ পয়সা নেয় ও বলে টাকাটা পেলে একটা ভোজ লাগাতে হবে।

হ অনন্ত-কা, ভিয়ান কইরা।

করেগা ভিয়ান, উসমে কা হায়? দশ পয়সা ছাড় দেখি একটা সিগ্রেট খাই।

পার্থকেও সবাই বলে, কি রে কি অইল? অইবে অইবে বইলা ত পাচ মাস গেল। পার্থরও মুখ থাকে না। আবার সে রেশন অফিসে যায়, এবং সহসা একজন মুচকি হেসে বলেন, বুঝতেই তো পারছেন? ইনসপেক্টার যাবে এংকোয়ারি করবে, রিপোর্ট নেবে। এ কথা বলে তিনি প্রত্যাশী চোখে তাকিয়ে থাকেন ও পার্থর মুখে সে প্রত্যাশার সাড়া না দেখে বিরক্ত হন। পার্থ ঘটনাটি বিমলকে বলে। বিমল বলে, হালায় ঘুষ চায়। আমি যাইতাছি। তর কাম নয়। বিমল কি করে আসে তা জানা যায় না। কিন্তু সহসা বিনা এংকোয়ারিতে অনন্ত খাটুয়ার রেশন কার্ড ইস্যু হয়। সে কার্ডে ভ্যালিডিটি আনার জন্যে একবার রেশন তোলা হয় এবং পার্থ এবার বিজয়গর্বে চলে যায় ভেগ্রানসি-কণ্ট্রোল অফিসে। অফিসার বলেন, বা! রেশন কার্ডও বের করে ফেলেছেন? এবার আর কি? আমাদের ইনসপেক্টর যাবে।

ইনসপেক্টর আসবেন। বার্ধক্যভাতা হবে, সে আনন্দে অনন্ত মদ না খেয়ে মাতাল হয়। ও এতকাল পরে এই প্রথম বিমলের কাছ থেকে পাঁচ টাকা চেয়ে নেয়। বলে, 'কতকাল যেন নোংরা হয়ে আচি। বুজলে? এট্টা জামা আর কাপড় কিনব।'

'পাচ টাকায় ?'

'যাদবপুর ইস্টেশনের কাছে নসীব বসে পুরনো জামাধুতি বেচে যে !'

'লও, দিতাছি ।'

টাকা নিয়েও অনন্ত নড়ে না, এবং বিমলের উঠোনে দাঁড়িয়েই থাকে ।

'কিছু কইবা ?'

'হ্যাঁ বাবা ।'

'কও ।'

'পার্থ বড় ভাল ছেলে, বুঝলে ? ওকে এট্টা চাগরি করে দিও ।'

'হ্যায় কি আপনা হইতে করছে ? আমার মায় কইছে, তাতেই !'

'করে দিও ।'

সে টাকায় অনন্ত জামা ও ধুতি কেনে, চার টাকায় । জামা ও ধুতি পার্থদের বাড়ি রেখে দেয় । বলে, 'পেনশন নেবার সময় পরে যাব ।'

বাকি টাকাটি সে যেভাবে খরচ করে তা তার পক্ষেই সম্ভব। একটাকার পাঁউরুটি কিনে সে কুকুরদের ছিঁড়ে ছিঁড়ে দেয়, তারপর তাদের মাঝে নাচতে গিয়ে বেকায়দায় আছাড় খায় ও হিপ-জয়েণ্ট ভাঙে । ভেঙেছে, তা সে নিজেও বোঝে না এবং অশেষ যন্ত্রণা নীরবে সয়ে, ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে এসে হরিসভার দাওয়ায় শুয়ে পড়ে ।

ইন্‌স্‌পেক্টর তাকে সেখানেই শায়িত দেখেন, এংকোয়ারি করে চলে যান । পার্থ খেপে গিয়ে বলে, 'একবার উঠলা না ক্যান্ ?'

অনন্ত বলে, 'শালার কোমর বোধ হয় ভেঙেছে বাপ, উঠতে পারছিনি ।'

পার্থ ওকে তুলে ধরতে যেতেই অনন্ত চেঁচিয়ে ওঠে, ফলে পার্থ বোঝে জখম গুরুতর । আবার তাকেই লোকজন ডেকে অনন্তকে হাসপাতালে নিতে হয় এবং একস্-রে'র পর, কোমর প্লাস্টার করে ডাক্তার তাকে হাসপাতালের বারান্দায় শুইয়ে রাখার ব্যবস্থা করেন । হাসপাতাল দেখে অনন্ত খুবই ভয় পায় ও বলে, পার্থ 'হাস-পাতালে মোরে রেকে যেওনি বাপ । আমি সেথায় বেশ থাকব ।'

'আরে ! অহন এক মাস শুইয়া থাকবা । সেথা কেমন কইরা থাকবা ?'

'থাকলে মরে যাব বাপ ।'

'হঃ তুমি মরবা ?'

পার্থ ঠাট্টা করেই বেরিয়ে আসে । ডাক্তার বলেন, 'জয়েণ্ট ভেঙেছে, কিন্তু কাটা-কুটিগুলো যে সেপটিক হয়েছে । আগে আনেননি কেন ?'

'জানতাম না ।'

'ছ-সাত দিন আগেই তো পড়ে যায় । ডায়াবেটিস আছে না কি ?'

'জানি না। আপনারা দেখেন। বুড়ার লিগ্যা ব্যবস্থা করছি এট্টা।'

আবার চট করে হাসপাতালে যাওয়া হয় না। দিন দুয়েক যায় বন্ধুর বিয়ের হুল্লোড়ে। তারপর বিমলের কথায় একটা কাজের তদ্বিরে যায় আরো কদিন। তারপর বাড়ি ফিরতে মা বলেন, 'আসপাতালে যাইস একবার। বুধন কইল, হ্যার বুনরে দেখতে গিছিল, অনন্তরে দেখা দরকার।'

কয়েকদিন অনন্তর কথা ভুলে ছিল বলে পার্থর খুবই মনস্তাপ হয় এবং বিকেলেই সে হাসপাতালে যায়। গিয়ে সে খুবই ধাক্কা খায়। কেননা এখন জানা যায় অনন্ত প্রাচীন ডায়াবেটিক। জল ত্যাগ কালে বহুকাল ধরে সে যত চিনি ত্যাগ করেছে, তাতে ময়রার দোকান চলে। পড়ে যাবার সময় ওর কোমর-পাছা ও উরু কেটেকুটে যায়। তাতে পথের নোংরা লাগে। ফলে সে সব জায়গার ক্ষত শুকচ্ছে না। বিষিয়ে উঠেছে, অনন্তর জ্বরও হয়েছে খুব।

ডাক্তার বলেন, 'ম্যালনিউট্রিশন, শরীরে ডেবিলিটি। এ সব রোগী…'

পার্থ হঠাৎ তাঁর বক্তব্যের অনুকূল অংশ বোঝে ও ভয় পেয়ে বলে, 'কি, বাচব না?'

'দেখুন।'

অনন্তকে দেখে পার্থ খুবই বিচলিত হয়। অনন্তর জন্যে ও এত বিচলিত হবে তা আগে বোঝেনি। অনন্ত চিত হয়ে শুয়ে আছে, পা দুটি তুলে লোহার ফ্রেমে ঝোলানো। আদুল উরুতে বড় বড় ঘা এবং উরু দুটি অত্যন্ত ফোলা ও লালচে। নলে পেচ্ছাপ বেরিয়ে বোতলে জমছে। অনন্তর হাত দুটি ও পা দুটি এত শীর্ণ তা তো আগে চোখে পড়েনি! ঘোলাটে চোখের কোলে পিচুটি। অনন্ত কোমরে হাত রেখে নাচছে, অনন্ত ন্যাংড়া ও ভুঁদির বিয়ে দেবে। অনন্ত হাত তুলে ডাকছে ও দশ পয়সা নিচ্ছে ছবিগুলির উপর ওভার-ল্যাপ করল চাঁদের শিলুয়েটে অনন্তর হাত—ডাকছে-ডাকছে-ডাকছিল। বিছানাটা যেন বড্ড নোংরা, কম্বলটা ধুলোটে, পেচ্ছাপের বোতলে দুর্গন্ধ। পার্থ কাছে বসল। বলল,

'অনন্ত-কা?'

'পার্থ?'

'হ। কেমন আছ?'

'খুব খারাপ বাপ। শালারা, বুজলে, আমাকে দোকানের পাঁঠা পেয়েছে। টাঙিয়েছে দেখছ না? ঠ্যাং দুটোকে বলি, লাচবি রে, আবার লাচবি, তা বেটাদের চেহারা দেখ না, যেন মরে রয়েচেঃ।'

'এবার ভাল হইয়া যাইবা।'

'আরে যেতে তো হবেই। পেনশানটা নিতে হবে না ? পেনশানটা পেলে পরে…'

'পাইবা।'

'তুমি রয়েচ, না পেয়ে পারি ?'

'চোখে ক্যাতর সাফ করে না ?'

'করে সকালা।'

'প্রস্রাপে নল দিল ক্যান্ ?'

'তিনি যে হচ্চেন না মোটে, আটকে রয়েছেন। কি টাটানি, কি কষ্ট, কিন্তু কল বানিয়েচে দেখ, নল ঢোকাতেই বেরুচ্চেন। দেখ না, হাগামোতার কল করেচে, হেথা না এলে কে জানত ?'

'কেন ওষুধ দিচ্ছে।'

'কিসের ?'

'পেচ্ছাপটা লালচে !'

'মুত হয়ে দেহে ছিলেন, রক্ত হয়ে বেরুচ্ছেন।' অনন্তর গলাটি ঘুম-ঘুম।

'আইতে পারি নাই।'

'এই তো এয়েচ।' অনন্ত কি ভাবল, ভুরু কোঁচকাল, তারপর বলল, 'একটু সারলেই বাড়ি যাব।'

'হ।'

পার্থ উঠে এল। 'বাড়ি যাব' কথাটি তার অর্ধশিক্ষিত, অনুকম্পায়ী মনে বাজল, বিঁধল। বাড়ি ? বাড়ি যাবে অনন্ত-কা' ? কেয়ার অফ হরিসভার দাওয়া ? ফ্যামিলি মেম্বার ন্যাংড়া ও ভুঁদি ? কোথায় বাড়ি অনন্ত কার ? কোন্ গ্রামে ? কোথায় ? কেন, কলকাতা ? কেন, বিক্রমগড় ? কেন, হাসপাতাল ?

পরদিনই পার্থ ভেগ্রান্সি-কন্ট্রোল আপিসে গেল। বলল, 'হইছে ব্যবস্থা ?'

'কিসের ?'

'কিয়ের ব্যবস্থা ? ক্যায়, রঙ্গ করেন আপনারা ? অনন্ত খাটুয়ার পেনশানের ব্যবস্থা ? এই এতদিন ঘুরতাছি ? অহন কয়েন কিয়ের ?'

'আইডেন্টিফাই করিয়ে আনুন।'

'কিয়ের লিগ্যা ?'

'ও যে অনন্ত খাটুয়া তার প্রমাণ কি ?'

'এত দরখাস্ত এত ঘুরাঘুরি, রেশন-কার্ড, আপনাগো ইনিসপেক্টার দেইখ্যা আইল…'

'তাতে সরকারী দপ্তরে 'প্রমাণ' হয় না।'

'কিয়ে হয় ?'

'বি-ডি-ও কিংবা একজন ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট ওকে দেখে লিখে দেবেন, তবে আমরা অ্যাকসেপট করব। নইলে নয়।'

'কি কইলেন ? ও অনন্ত খাটুয়া, সবাই জানে ও অনন্ত, বি-ডি-ও লয় তো মেজিস্ট্রেট না কইলে সরকার মানব না ও অনন্ত ?'

'নিয়মে তাই বলছে।'

'হ্যায় তো আসপাতালে।'

'সারলে নিয়ে গিয়ে আইডেন্টিফাই করিয়ে আনুন। নিয়ম যা, তাই তো করতে হবে।'

বি-ডি-ও বা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট না বললে অনন্ত নিজেকে অনন্ত বলে সনাক্ত করাতে পারবে না, এ লজিকটি অফিসারের কাছে খুবই লজিকাল, কিন্তু পার্থ এতে অত্যন্ত বিভ্রান্ত হয়, কিছুই বুঝে পায় না। অনন্তকে কি বলবে ভেবে পায় না।

অনন্ত ওর মুখ দেখেই বোঝে, কোন একটা গোলমাল হয়েছে। বলে, 'কি, হল নি ?'

'তুমি উঠ, তহন হইব।'

'কি বলল ?'

পার্থ সবই বলে। অনন্ত পুরনো অনন্তর মতো, সব জলিফলি করে হাসতে যায়, কিন্তু সে হাসি চোখে দেখতে পারে না পার্থ, মুখ ফেরায়। অনন্ত বলে, অনেক, অনে—ক দূর থেকে বলে, 'আইন যত, ফাঁদ তত। জন্ম থেকে আমি অনন্ত খাটুয়া, একন যে অপিছার আমায় জন্মে চেনে না, তারা বললে তবে আমি অনন্ত হব ?'

পার্থ চুপ করে থাকে।

অনন্ত বলে, ক্ষীণ কণ্ঠে বলে, 'খেয়েদেয়ে ঘুমোও গে দেখি। আমি উঠি, তা বাদে আমি তুমি যেয়ে শালার অপিছারকে…'

আর করতে হয় না কিছুই পার্থকে। কেন না দিন তিনেক বাদে হিপজয়েন্ট ফ্র্যাকচার, ব্লাড ইউরিয়া+ম্যালনিউনট্রিশন +ডেবিলিটি+ডেসটিটিউশন, ইত্যাদি পঞ্চরোগে অনন্ত মারা যায়। মারা যায় রাতে। ফলে সকালে দেখা যায়, মৃত্যুকালে কারুকে ডাকবে বলে যে হাতটি ও তুলে ধরেছিল, তা শক্ত বরফ হয়ে উঁচিয়ে আছে।

ওই অবস্থাতেই ওকে খাটিয়ায় ওঠাতে হয়। মৃত্যুর সার্টিফিকেটে ওকে অনন্ত বলে মেনে নিতে ডাক্তারের আপত্তি হয় না, বিমল বলে, 'ক্যাওড়াতলায় অসুবিধা

হইব না। ল, ভাল কইরা দাহ কইরা আয়।' পার্থ বোঝে, জীবিত মানুষ স্ব-পরিচয়ে সনাক্ত হওয়াতেই যত অসুবিধা সরকারের। সেই একই সরকার, রেশন-কার্ড-এংকোয়ারি-ইন্সপেক্টার বি-ডি-ও ব্যতীতই মৃত অনন্তকে 'অনন্ত খাটুয়া হিন্দু মেল, বা 'এইচ এম' বলে মেনে নেয়। ব্যাপারটির জটিলতা পার্থকে আরো স্তম্ভিত করে।

তোলা আহ্বানরত হাতটিকে সোজা করে নামানো যায় না। নসীবের কাছে কেনা ধুতি ও জামা পরে, হরাইজন্টাল অনন্ত, পার্থদের কাঁধে চড়ে শহরের পশ্চিমে গঙ্গাভিলাষে যেতে থাকে। যেতে যেতে পার্থর হঠাৎ মনে পড়ে নিঃসম্বলে-নিরাত্মীয় হোমলেস-পথবাসী অনন্ত খাটুয়া রাজার মতো নবাগত পরিবারগুলিকে বলছে, 'আসুন, আসুন, এই পরিবার বুঝি ?' পার্থ বোঝে ওর চোখে জল পড়ছে। অনন্তর একটি হাত উঁচু হয়ে, শহরের লোককে ডাকতে ডাকতে চলে। ভীষণ মজা দেখতে ডাকে। জীবিত অবস্থায় অনন্ত বলে যে সরকার তাকে স্বীকার করেনি, সেই সরকারই মৃত তাকে অনন্ত বলে দাহ হতে দিচ্ছে। ভীষণ মজা, বেজায় রগড়। বুড়ো-বুড়ির রসের খেলা। অনন্তর পাথরের চোখটি চেয়ে থাকে ও লক্ষ্য করে, সবাই ওর গঙ্গাযাত্রা ফলো করছে কি না। ওর অন্য হাতটি বরফ হয়ে পার্থর তাপিত মুখে মাঝে মাঝে ঠোকা মারে। যেন সান্ত্বনা দেয়, 'তুমি তো সব করিছিলে বাপ, সব!'

পার্থ এখন মোমেণ্টাম বাড়ায়। এ সময়ে চলার গতি দ্রুত করলে তবেই পার্থ যেতে পারবে, নইলে কিছুতে এক পাও চলতে পারবে না। শবযাত্রীদের পা দৌড়য় বলে অনন্তও নাচতে নাচতে যায়।